শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।



চরিত-সুধা

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস দেব বাবাজী মহাশয়ের

জীবনচরিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

—:০:—

প্রকাশক

শ্রীরামদাস বাবাজী।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

শ্রীরাধারমণ বাগ।

চৈতন্যাব্দ ৪৫৮ মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ফ্যালকন্ প্রেস
২ নং, চার্চ্চ লেন, কলিকাতা
হইতে মুদ্রিত।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে



শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

জয় নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমোনমঃ।

নিবেদন।

পরমদয়াল শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের কৃপায় এবং সাধুব্যক্তিগণের অনুগ্রহে আজ আমরা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য **চরিত-সুধার** দ্বিতীয় খণ্ড ২য় সংস্করণ সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পবিত্র লীলা-কথার মধ্যে কোনরূপ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত ভাব সংশ্লিষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি যে যে স্থানে যাঁহাদের সহিত যে যে লীলা আচরণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থান হইতে সেই সমস্ত ঘটনা সংগ্রহ করণানন্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতঃ পুনরায় সেই সমস্ত লোকদিগকে দেখাইয়া তবে মুদ্রিত করিতে হইতেছে। এই কারণেই গ্রন্থপ্রকাশে একটু বিলম্ব হইতেছে। আমাদের সম্বলের মধ্যে একমাত্র মহৎকৃপা। সেই করুণাবলেই

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ শ্রীশ্রীগুরুদেবের জীবন-চরিত ২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সহৃদয় মহাত্মাগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, লেখকের ভাষার অসংলগ্নতা বা অশুদ্ধি সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আচরিত লীলা ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যামৃত আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে আমাদের বহুকষ্টে সংগৃহীত শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্যচরিতকাহিনী কাগজের অসুবিধায় মুদ্রিত হওয়া বহুসময়সাপেক্ষ জানিতে পারায় বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর-মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন। রাজকুমারের এইরূপ সহৃদয়তার পরিচয়ে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি সপরিকরে দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ দিন দিন ভক্তিরাজ্যের উন্নতিবিধান করুন। অলমিতি—

সন ১৩৫০ সাল,
২৮শে মাঘ।

বিনীত
প্রকাশক।

শ্রীগুরবে নমঃ।

বন্দনা।



শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং প্রেমানন্দময়ং বিভুম্।
অগত্যেকগতিং বন্দে মঙ্গলালয়বিগ্রহম্॥

জয় জয় গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
জীবনে মরণে গতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
জয় গণপতি, করিয়ে প্রণতি,
অভয় চরণতলে।
তোমার প্রসাদে, সকল বিপদে,
পার হব অবহেলে॥
দেবী বীণাপাণি, শ্বেতাব্জবাসিনী,
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী।
অবিদ্যানাশিনী, বিদ্যাপ্রদায়িনী,
সর্ব্বচিত্ত-বিমোহিনী॥
শঙ্কর শঙ্করী, ঈশ্বর ঈশ্বরী,
পরম মঙ্গলময়।
অবিদ্যা নাশিয়া, তত্ত্বজ্ঞান দিয়া,
কর দিব্যজ্ঞানোদয়॥
সহ সাঙ্গোপাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
দয়াময় অবতার।
সবার চরণে, কায়মনপ্রাণে,
কোটি কোটি নমস্কার॥

শ্যাম বনমালী, করেতে মুরলী,
চূড়ায় ময়ুরপাখা।
সর্ব্বরসধাম, জয় রাধাশ্যাম,
হৃদিমাঝে দাও দেখা॥
সরবস ধন, শ্রীরাধারমণ,
নীলাচলে লীলাকারী।
করুণার সিন্ধু, পতিতের বন্ধু,
বাসনাপূরণকারী॥
নবদ্বীপ দাদা! মাতোয়ারা সদা,
যে কথা শুনিয়া তুমি।
সে কথা বলিতে, সাধ হয় চিতে,
লিখিতে না জানি আমি॥
তব প্রাণধন, শ্রীরাধারমণ,
তোমা সবাকার সনে।
যে যে লীলাখেলা, সদা আচরিলা,
স্ফূর্ত্তি কর মোর প্রাণে॥
লাভ কি অলাভ, ভাব কি অভাব,
ইথে নাহি মোর দায়।
যথাযথ যাহা, লিখাইও তাহা,
এই নিবেদন পায়॥
দাদা শ্রীচৈতন্য, ভক্ত-অগ্রগণ্য,
ভাবে গড়া তনুখানি।
করি নিবেদন, কৃপা বিতরণ,
কর অভাজন জানি॥

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥



শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণদাস দেব।

চরিত-সুধা

দ্বিতীয় খণ্ড

—:০:—

কৃষ্ণনগর-গমন ও নগরকীর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যবিহারভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপে নিত্য নূতন লীলা—নিত্য নূতন ভক্ত-সমাগম—নিত্য নূতন আনন্দ। পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয় তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে থাকিয়া নূতন নূতন ভক্তগণসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে শ্রীধামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আনন্দসাগরে ভাসাইতে লাগিলেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী* আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দাদা! চলুন না, একবার কৃষ্ণনগর দেখিয়া আসি।" বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দসহকারে বলিলেন, "আচ্ছা ভাই! চল, কালই না হয় যাওয়া যাক্।" সঙ্গিগণেরও তাহাই মত হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সদলে বাহির হইলেন। গঙ্গা পার হইয়াই **"আবার বল হরিনাম আবার বল"**

* ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপে 'জয় নিতাই' বলিয়া বিখ্যাত। বহু পূর্ব্ব হইতেই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার ভ্রাতৃভাব। পূর্ব্বে ইনি সিলেট জিলাস্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন।

এই নাম ধরিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গিগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। বালকবৃদ্ধযুবা, স্ত্রীপুরুষ—এমন কি, ঘোর পাষণ্ড পর্য্যন্তও যে একবার ইঁহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতেছে, সেই-ই মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইঁহাদিগের প্রতি চহিয়া রহিতেছে।

ক্রমে বেলা আন্দাজ নয়টার সময় সকলে গোয়াড়ী উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় পুলিস্ ইন্স্পেক্টর বাবু হীরালাল সিংহ মহোদয় কোনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। অভিনব কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে তথায় আসিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কোথা হইতে আসা হইল? কোথায় বা যাওয়া হইবে?" দেবেন বাবু বলিলেন, "আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর দর্শনে আসিয়াছি।"

হীরালাল বাবু। আপনাদের কোথাও থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

দেবেন বাবু। না বাবা, আমরা ত কিছুই ঠিক করি নাই। তবে নিতাইচাঁদ যদি ঠিক করিয়া থাকেন, তিনিই জানেন।

হীরালাল বাবু। আমার একটী অনুরোধ—আপনারা আপাততঃ সহরের মধ্যে না গিয়া খ'ড়ে নদীর ধারে শ্রীকণ্ঠবাবুর বাগানবাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া আহারাদির পর সহরে গেলে ভাল হয়।

দেবেনবাবু হীরালালবাবুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দ্রুতবেগে কীর্ত্তনের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক সেই বাগানের দিকে কীর্ত্তন ফিরাইয়া দিলেন। আজ যেন দাদা, ভাইয়ের অনুগত হইয়াছেন। ভাই যেদিকে চালাইতেছেন, দাদা নাচিতে নাচিতে সেইদিকেই গমন করিতেছেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর বাগানবাড়ীতে পৌছিয়া কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি

করিলেন। এদিকে হীরালাল বাবু আন্দাজ বিশ পঁচিশজনের উপযোগী চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি ভোগের সামগ্রী আনাইয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে রান্না আরম্ভ হইল। হীরালাল বাবুর যেন ইঁহাদের আনন্দময় সঙ্গ ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু কি করেন? সরকারী কার্য্যের অনুরোধে একবারমাত্র ঘণ্টা-খানেকের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলেন। আবার ইঁহাদের আহারের পূর্ব্বেই আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। "নবদ্বীপ হইতে এক মহাপুরুষ সংকীর্ত্তন লইয়া আসিয়াছেন" এই কথা ক্রমে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে ভক্তরকমের দুই একটী বাবু আসিতে লাগিলেন। স্থানীয় সব্‌রেজিষ্ট্রার বাবু যোগেশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় একবার আসিয়া ইঁহাদিগকে দেখিয়া গেলেন। ইনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শাক্ত ব্রাহ্মণ। বৈরাগী বৈষ্ণবের প্রতি ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা নাই; তবে ইনি গুণের পক্ষপাতী। আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে বেলা আন্দাজ চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় সদলে কীর্ত্তন করিতে করিতে কলেজের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এদিকে কলেজেরও ছুটী হইল। কলেজের প্রফেসর অধর বাবু এবং কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ব্রজলাল বাবু আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন দেখিয়া অনেক কলেজের ছাত্রও সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন ধরিলেন :—

নিতাই গৌরাঙ্গ বল, জনম পেয়েছ ভাল,
কলিযুগে আর গতি নাই।
যে দিল এ শব্দজ্ঞান, কর তাঁর গুণগান,
এ বিদ্যা শিখ না কেন ভাই॥
চৌরাশী লক্ষ যোনি, কত না ভ্রমিলে তুমি,
ক্রিমি কীট নানা দেহ ধরি।

বহু সুকৃতির ফলে, ভারতে জনম নিলে,
নরদেহ অঙ্গীকার করি ॥
শত সন্ধি জর জর, পেয়ে এই কলেবর,
এত গর্ব্ব করিছ কি আশে।
ত্রয়াত্মিকা ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত,
কি জানি কখন কেবা নাশে ॥
যে দেহ আপন জ্ঞানে, যত্ন কর রাত্রিদিনে,
বসন ভূষণ কত বেশে।
পরমাত্মা ভগবান্, যবে হবে অন্তর্দ্ধান,
ভস্ম বিট্ ক্রিমি অবশেষে ॥
পায় পড়ি ছাড় ভ্রম, কিছু নাহি পরিশ্রম,
হরি হরি বল অবিরাম।
কহ লক্ষ কথা আন, তাহে না আলিস জ্ঞান,
কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম ॥
কর যুড়ি ভিক্ষা চাই, হরি হরি বল ভাই,
সুখে তোর যাবে পরিণাম।
না লাগিবে টাকা কড়ি, না ছাড়িবে ঘর বাড়ী,
মুখে মাত্র বল হরিনাম ॥

এইরূপ বহু বহু পদ পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য। হরিবোল ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত। সহরের 'কৃষ্ণনগর' নাম আজ সার্থক হইল। প্রকৃতই কৃষ্ণ যেন নামরূপে নগরে প্রকট হইলেন। দোকানী দোকান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবোল বলিয়া নাচিতেছে। অফিসার বাবু অফিসের পোষাকেই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। বোঝারি বোঝা, মাথায় করিয়াই গা দোলাইয়া দোলাইয়া

আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বাবাজী মহাশয় প্রেমগদগদকণ্ঠে কেবল বলিতেছেন, "আবার বল হরিনাম আবার বল। এই হরেকৃষ্ণনাম আবার বল। (মধুমাখা হরিনাম) (নাম নামী এক আত্মা) (নামের বর্ণে বর্ণে সুধা মাখা) (নাম লইতে প্রেম হবে) (ভাই তোদের পায়ে পড়ি) আবার বল।"

এক একবার হরিধ্বনি উঠিতেছে, আর ইঁহার দেহখানি পুলকাবলীতে বিভূষিত হইতেছে। ভাবে বিভোর হইয়া এক একবার যেন টলিয়া পড়িতেছেন, অমনি পাঁচ সাতজন ধরিয়া রাখিতেছে। সেই অবস্থায় আবার যখন কম্প হইতেছে, তখন সকলেই বাত্যাহত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। অশ্রুধারার বিরাম নাই। সঙ্গিগণ সকলেই আত্ম-হারা। খোলীর হাত ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সংজ্ঞা নাই। করতাল বাজাইতে বাজাইতে কাহারও বা হাতের চামড়া উঠিয়া গেল, খেয়াল নাই। কাহারও হাতের করতাল ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল, খোঁজ নাই; হাতে তালি দিয়াই বিভোরভাবে নৃত্য করিতেছে। অপর আগন্তুক সেই করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতেছে। সন্ধ্যাদেবীও যেন এইরূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কীর্ত্তনে বিমুগ্ধা হইয়া সদলবলে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিক্ হইতে কেহ বা হারিকেন, কেহ বা ল্যাণ্টার্ণ, কেহ বা ল্যাম্প ইত্যাদি নানারূপ আলো জ্বালাইয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভক্তগণের ক্লান্তি অবগত হইয়াই যেন রাত্রি প্রায় আটটার সময় বাসায় ফিরিলেন।

শ্রীকণ্ঠ বাবুর নির্জ্জন বাগানবাড়ী আজ জনতাপরিপূর্ণ। সকলেরই মুখে হরিবোল। লোকসকল দলে দলে হরিবোল বলিতে বলিতে আসিতেছে, আবার দলে দলে হরিবোল বলিতে বলিতে যাইতেছে।

কখনও যাহার মুখে হরিনাম শুনা যায় নাই, সেও যেন আজ কেমন একপ্রকার নেশার ঘোরে পড়িয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে, আর হাতে তালি দিয়া হরিবোল বলিতেছে। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় সকলের চৈতন্য হইল। তখন নিজ নিজ বাসার কথা মনে পড়িয়া গেল। অধর বাবু, যোগেশ বাবু প্রভৃতি অনেকেই বলিলেন, "কাল শনিবার; একটু সকালে কীর্ত্তন বাহির করিলে ভাল হয় না কি?" বাবাজী মহাশয় তাহাতেই অনুমোদন করিলে সকলেই পরমানন্দিতচিত্তে নিজ নিজ বাসায় প্রস্থান করিলেন। সে রাত্রে ইঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থাও হীরালাল বাবুই করিলেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই যোগেশ বাবু আসিয়া বিনীতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আহারাদির ব্যবস্থা কিরূপ?"

বাবাজী। বাবা! আমরা ভিখারী; আমাদের আবার ব্যবস্থা কি? প্রভু যখন যাহা দেন, তাহাই আহার করি।

যোগেশ বাবু। সে ত বাবা সকলেরই পক্ষে সমান। প্রভু না দিলে কি কেহ কিছু পাইতে পারে? তবে এক এক জনের এক একটা নিয়ম থাকে। যেমন 'আমি অমুকের হাতে বা ঐ জিনিষ খাইব না' ইত্যাদি। আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

বাবাজী। আপনাদের বিধবাদিগের যেরূপ আহার্য্য, আমাদেরও সেইরূপ। তবে তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ অনিবেদিত বস্তু আহার করিয়া থাকেন। আমাদের সেইটী হয় না।

যোগেশ বাবু। আচ্ছা, নারায়ণের প্রসাদ আপনাদের গ্রহণ করা হয় না কি?

বাবাজী। বাবা, নারায়ণই আমাদের দেবতা। নারায়ণের প্রসাদ না পায়, এমন পাষণ্ড কে আছে?

যোগেশ বাবু। আমার মা ও বিধবা ভগিনী আছেন। যদি অনুমতি করেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা রান্না করাইয়া নারায়ণের ভোগের যোগাড় করিয়া দিই। আজ আমার বাসায়ই আপনাদের আহারাদি হইবে।

বাবাজী। আচ্ছা, নিতাইয়ের ইচ্ছায় তাহাই হউক।

যোগেশ বাবু অতি হৃষ্টচিত্তে বাসায় গিয়া মাকে বলিলেন, "মা! নবদ্বীপ হইতে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তিনি আজ আমাদের বাসায় আহার করিবেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় বার চৌদ্দ জন সাধু আছেন। অতি পবিত্রভাবে নারায়ণের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। যোগেশ বাবুর ভগিনী বলিলেন, "আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন খুব দীর্ঘাকার একটী সাধু আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'দিদি! বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খেতে দাঁও।' আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেমন তাঁহাকে বসিতে আসন দিলাম, অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোনই চিন্তা নাই। আমরা অতি পবিত্রভাবেই নারায়ণের ভোগের যোগাড় করিতেছি।" যোগেশ বাবু যতদূর সম্ভব ভোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। নিতান্ত না গেলে নয়, তাই একবার অফিসে গেলেন। তাঁহার মন কিন্তু ঐ মহাপুরুষের কাছেই বাঁধা রহিল। অফিসের কাজ করিবেন কি; সর্ব্বদাই যেন ঐ মূর্ত্তিখানি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। বেলা অনুমান বারটার সময় যোগেশ বাবুর লোক ইঁহাদিগকে ডাকিতে আসিল। ইঁহারাও নাম করিতে করিতে ঐ লোকটীর সঙ্গে যোগেশ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ নাম করিয়া বাবাজী মহাশয় যোগেশ বাবুর ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খেতে দাও। মা কোথায়?" এই কথা শুনিয়া যোগেশ বাবুর ভগিনী অতিবিস্মিতভাবে মায়ের নিকট গিয়া বলিলেন, "মা! আমি কাল রাত্রে

যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল। অবিকল ইঁহারই ন্যায় একজন সাধু রাত্রে আমার নিকট ঠিক এই ভাবেই খাইতে চাহিয়াছিলেন। মা! ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন। তাহা না হইলে এরূপ হইতে পারে কি?" মা বলিলেন, "যোগেশও ত তাই বলিল। ইঁহার আকার প্রকার ভাবভঙ্গি দেখিয়াও ইঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে হইতেছে। দেখিবামাত্র যেন ভক্তির উদয় হয়।" এই বলিয়া ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতে বলিলেন। ক্ষণকালপরে ঠাকুরের ভোগের পর ইঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দিলেন। মা ও ভগিনী উভয়েই পরিবেশন করিতে লাগিলেম। মা বলিলেন, "বাবা, মনে কিছু সন্দেহ করিও না। আমি জলটুকু পর্য্যন্ত নারায়ণের ভোগ দিয়াছি। তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন কিছুই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে না।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "মা, ভগবৎ-অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিলে অপরাধ হয়। ভগবদপরাধীর কোন কালেও মঙ্গল নাই। সন্তানের যাহাতে অমঙ্গল হয়, মা কি কখনও তাহা করিতে পারেন?" এইরূপ নানা কথোপকথন করিতে করিতে সকলে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন।

এই সময় যোগেশ বাবু অফিস হইতে আসিয়া মা ও ভগিনীর নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বড়ই সুখী হইলেন। প্রসাদ পাওয়ার পর যোগেশ বাবু বলিলেন, "আজ আর সে বাগানবাড়ীতে না গিয়া এই স্থানেই থাকিলে ভাল হয় না কি? এখান হইতে নগরসংকীর্ত্তন বাহির করারও বিশেষ সুবিধা হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "যাহাতে আপনাদের সুবিধা হয়, তাহাই করুন। এ বিষয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসার কোনই প্রয়োজন নাই।" এই কথা শুনিয়া যোগেশ বাবু অতি হৃষ্টচিত্তে বৈঠকখানা ঘরে ইঁহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া

নিজে প্রসাদ পাইতে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় কীর্ত্তন বাহির হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিতে হইল না। বহু লোক আসিয়া যোগেশ বাবুর বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন :—

প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান।
প্রকট লীলায় করেন প্রভু নিজে নৃত্যগান ॥
অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।
কীর্ত্তনবিহারীরূপে সদা বর্ত্তমান ॥
(প্রভুর) দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের-কুমার ॥
গদাধরের বামে শ্রীবাস আর নরহরি।
চৌষট্টি মহান্ত দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করি ॥
সবাকার আগে নিতাই দুবাহু তুলিয়া।
হরেকৃষ্ণ হরিনাম যান বিলাইয়া ॥
মুখে আবার বল হরিনাম আবার বল।
(আমার প্রেমদাতা নিতাই বলে)
(নিতাই যারে দেখে তারে বলে)
(আমি বিনামূলে বিকাইব)
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম চণ্ডাল জনার ঘরে ঘরে গিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়ে ॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥

এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধুলাতে লোটায়॥
এ হেন দয়াল প্রভু যেবা না ভজিল।
মানব-জনম সেই হেলায় হারাইল॥
গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই রঙ্গিয়া।
হরি ব'লে চ'লে যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
অরুণ কমল জিনি নয়ন যুগল
গোরা গোরা গোরা বলি ঝুরে অবিরল॥
করুণাসাগর মোর প্রভু নিত্যানন্দ।
ভজ ভজ ভজ ভাই পাইবে আনন্দ॥
সুখে বা দুঃখেতে কিংবা যথা তথা থাক।
দিনান্তে নিশান্তে কিবা নিতাই ব'লে ডাক॥
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই।
নিতাই গৌরাঙ্গ বিনে আর গতি নাই॥

ইত্যাদি নানারূপ পদকীর্ত্তন হইতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য। কে যে কোথায় পড়িতেছে—কে যে কাহাকে ধরিতেছে, ঠিক্ নাই। কেহ কেহ ভূমে গড়াগড়ি দিতেছে। কেহ কেহ বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কেহ কেহ বা প্রেমোন্মত্ত-ভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগণ যেন বাবাজী মহাশয়কে ঘেরিয়া ফেলিল। পুলকাশ্রুকম্পের বিরাম নাই। সেই সুমধুর নৃত্যভঙ্গি, সেই অবিরতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন এবং ভাবভূষণে বিভূষিত সেই বিশাল দেহখানি যে একবার দর্শন করিতেছে, সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছে। কৃষ্ণনগর আজ যেন নদীয়া নগর হইল। বালকবৃদ্ধ' পুরুষনারী, আপামর সাধারণ সকলেরই মুখে

'নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই' এই বুলি। যোগেশ বাবু, অধরবাবু, রামগোপাল বাবু, অম্বিকা বাবু, অশ্বিনী বাবু, হরিহর বাবু প্রভৃতি সকলেই খালিগায় খালিপায় ধূলিধূসরিত অঙ্গে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় একেবারে আত্মবিস্মৃত। কি হিন্দু, কি যবন, যাহাকেই সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাকেই আলিঙ্গনপূর্ব্বক 'জয় নিতাই' বলিয়া যেন নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া দিতেছেন। সেও যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ "নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই" বলিয়া নাচিতেছে।

এইরূপে রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় সকলে যোগেশ বাবুর বাসায় ফিরিয়া কীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন। যোগেশ বাবুর মাতৃদেবী ও ভগিনী ইতিপূর্ব্বেই নানাবিধ দ্রব্য নারায়ণের ভোগ দিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে পরমানন্দে প্রসাদ পাইয়া নাম করিতে করিতে বাসায় গমন করিলেন।

শ্রীকণ্ঠ বাবুর বাগানবাড়ীতে কীর্ত্তন ও তত্ত্ব-আলোচনা।

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান শ্রীকণ্ঠবাবুর বাগানবাড়ীতেই রহিল। একদিন কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবদ্বীপ দাস এই দুইজনে বাগানবাটীস্থ একটী ছোট ঘরে বসিয়া হাতে তালি দিয়া "নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই। নিতাই গৌরাঙ্গ বিনে আর গতি নাই॥" এই পদটী গান করিতেছেন। ক্রমে দুই একজন করিয়া প্রায় আট দশজন লোক তথায় আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। কীর্ত্তনটী যখন বেশ জমাট বাঁধিল, তখন যে বড় হলটীতে বাবাজী মহাশয় বহুলোক সঙ্গে

বসিয়াছিলেন, সকলে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাবাজী মহাশয় ও অন্যান্য সকলেই শশব্যস্তে উঠিয়া ঐ নামে যোগ দিলেন। ক্রমে খোল করতাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় পদ ধরিলেন :—

নিতাই মোদের জীবনধন নিতাই মোদের জাতি।
নিতাই বিহনে মোদের আর নাহি গতি ॥
সংসার সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়ে নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বৈমুখীর মুখ কভু না হেরিব ॥
কাঁধের পৈতা যেমন না ছাড়ে ব্রাহ্মণ।
তেমতি নিতাই মোদের সরবস ধন ॥
গঙ্গা যাঁর পদজল হরশিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়ে দুখ পেয়ে মরে ॥
তাই বলি ভজ ভাই গৌরাঙ্গ নিতাই।
কলিভব এড়াইতে আর গতি নাই ॥

সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা। কালিদাস বাবু এবং বাবাজী মহাশয় গলা ধরাধরি করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। অধর বাবুর গুরুদেব* একপাশে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন আর চোখের জলে তাঁহার মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কম্পিত-কলেবরে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কার সাধ্য যে

* ইনি একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। গুরুগিরিই ইঁহার পেশা। ইনি কৌলিকভাবে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

তাঁহাকে স্থির করে? সেই গৈরিক বসনধারী, রুদ্রাক্ষমালা-বিভূষিত, সিন্দূর-তিলক-শোভিত, অনতিদীর্ঘ এবং স্থূলকায় নৈষ্ঠিক শাক্ত ব্রাহ্মণের সেই আর্ত্তি, সেই ভাবমাখান উচ্চকণ্ঠে রোদন এবং সেই রজে গড়াগড়ি দেখিয়া আগন্তুক লোকসকল একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মাতামাতি কীর্ত্তন। কে কাহাকে স্থির করে? কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন শেষ হইল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণের কান্না আর থামে না। বাবাজী মহাশয়ের ইঙ্গিতে কালীবাবু উঁহার মস্তকটী কোলের উপরে রাখিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আমি ঘোর অপরাধী। নিতাই-গৌর-ভজা দলের উপর আমার প্রীতি ত দূরের কথা; বরং অশ্রদ্ধাই ছিল। আজ আপনাদের দুইজনের নৃত্যকালে আমি একটী অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিলাম। ঠিক যেন নিতাই গৌর দুই ভাই ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। দর্শনমাত্র আমার এত কঠিন হৃদয়ও দ্রব হইয়া গেল— চক্ষু ঝলসাইয়া গেল; আর তাকাইতে না পরিয়া চক্ষু বুজিলাম। ক্ষণকাল পরে চোখ মেলিয়া দেখি, সেই অপরূপ রূপ আর নাই। এ কি হইল? আপনারা আমায় কৃপা করুন।" এই বলিয়া আবার ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। কালীবাবু নানারূপ সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বসাইলেন। তখন বাবাজী মহাশয় ব্রাহ্মণকে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আপনি মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্র। তাই অবতারের সার নিতাই গৌরাঙ্গ দেবের দর্শন লাভ করিয়াছেন। নাম নামী অভিন্ন। নামরূপে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।

ব্রাহ্মণ। বাবা! নাম ত অনেক দিনই শুনিয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই আমার প্রাণ গলাইতে পারে নাই। আপনাকে দেখা অবধি আমার মনপ্রাণ যেন কি এক অভিনব ভাবে বিভাবিত হইয়াছে। আমি

এতদিন যাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছি, আজ অবনত মস্তকে তাঁহাদের পদধূলি লইতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাকে কি নামের প্রভাব বলিব? না আপনার শক্তি বলিব?

বাবাজী মহাশয়। আজ্ঞে, নাম সর্ব্বশক্তিমান্। নামের অসাধ্য কিছুই নাই। এমন কি, ভগবান্ নিজেও যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন না, তাঁহার নাম তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রমাণ দেখুন—ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সাগর বন্ধন করিয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন; কিন্তু হনুমান সেই রামচন্দ্রের নাম লইয়া একলম্ফে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। দ্বারকায় সত্যভামা দেবী উমাব্রতোপলক্ষে দেবর্ষি নারদকে কৃষ্ণের সমতুল্য সুবর্ণ প্রদান করিবার মানসে তুলাদণ্ডের এক পার্শ্বে কৃষ্ণকে বসাইয়া অপর পার্শ্বে বহু বহু সুবর্ণ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সমান না হওয়ায় নারদকে প্রতিশ্রুত বস্তু দিতে না পারিয়া বড়ই বিপন্না হইয়া পড়িলেন। তখন অগত্যা রুক্মিণীদেবীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তুলাদণ্ড হইতে যাবতীয় সুবর্ণ নামাইয়া যেমন সেইস্থানে একটী নামাঙ্কিত তুলসীপত্র রাখিলেন, অমনি উহা কৃষ্ণ অপেক্ষা ভারী হইল। তাই বলি বাবা, নামের অপার মহিমা। নাম বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থকেও নাচাইতে পারেন। মনুষ্যাদি জঙ্গম দেহের ত কথাই নাই।

এইভাবে নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন আগন্তুক দুঃখী কাঙ্গালী প্রভৃতি যাহারা উপস্থিত হইল, তাহাদিগকেও মহাপ্রসাদ দেওয়া হইল। এইরূপভাবে প্রায় দেড়মাস কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ চারি পাঁচশত লোক প্রসাদ পাইতে লাগিল। কোথা হইতে কিভাবে প্রত্যহ এত লোকের আহারীয় সংগ্রহ হইতেছে, তাহা একমাত্র প্রভুই জানেন। বাবাজী মহাশয় যতদিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন,

ততদিন পরদিনের জন্য কোনও জিনিষ সংগ্রহ করিতে দিতেন না। এমন কি, যে হাঁড়িতে রান্না হইত, ভোগের পরে তাহাও ফেলিয়া দিতেন।

এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে ক্রমে বহু লোক বাবাজী মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ভাগ্যবান্ শ্রীকণ্ঠ বাবুর নির্জ্জন উদ্যান আজ আনন্দকানন হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা, এমন কি, ঘোর পাষণ্ড পর্য্যন্ত বাবাজী মহাশয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মহাজনগণ প্রতিষ্ঠাকে বড় ভয় করিয়া থাকেন। তাই বোধ হয়, বাবাজী মহাশয়ের আর কৃষ্ণনগরে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

একদিন প্রাতঃকালে চিন্তিতমনে বসিয়া আছেন, এই সময়ে দেবেন বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! আজ এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না ভাই! বিশেষ কিছুই নয়, তবে অনেক দিন হইল কৃষ্ণনগর আসিয়াছি, তাই ভাবিতেছিলাম।" এই সময়ে যোগেশ বাবু আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে কাল রবিবার। অনেকেরই ইচ্ছা যে, আপনার মুখে কয়েকটি তত্ত্বমীমাংসা শুনিয়া হৃদয়ের সন্দেহ দূর করেন। যদি অনুমতি হয় তবে সকলকে বলিয়া দেওয়া যাউক।" অধর বাবু বলিলেন, "দেখুন, বহু গোলযোগ হইলে বড়ই অসুবিধা হয়। যাহাতে বাজে লোক না আসে, তাহাই করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাই! আমি ত পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমাদের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই করিতে পার। আমার মতামত লইবার কোনই প্রয়োজন নাই।" তখন যোগেশ বাবু হৃষ্টচিত্তে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদিগকে পরদিন প্রভাতে তথায় আসিতে বলিয়া দিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ নানা কথাবার্ত্তার পর সকলে নিজ নিজ বাসায়

প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

রবিবার প্রাতঃকালে যোগেশ বাবু, অধর বাবু প্রভৃতি আট দশজন আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট নানারূপ তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যোগেশ বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, ভগবৎ-স্বরূপ কি এবং অপরাপর স্বরূপের সহিত তাহার সম্বন্ধই বা কি ?"

বাবাজী মহাশয়। ভগবৎ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। এই ভগবান্ যে কে, এই বিষয় লইয়া বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুবিধ বিচারের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে :—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ব্রহ্মসংহিতায় :—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অন্যত্র :—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামিপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ইত্যাদি

এই কৃষ্ণই আবার স্থান, ক্রিয়া ও সঙ্গাদি বিভেদে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম এই ত্রিবিধ ভাবে বিরাজ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীধাম

দ্বারকায় পূর্ণরূপে, মথুরায় পূর্ণতররূপে এবং শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতমরূপে লীলা করিয়া থাকেন। অতএব সম্প্রতি বৃন্দাবনবিহারী পূর্ণ পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিষয়ই বলিতেছি :—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥

সৎ অর্থ সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তা, চিৎ অর্থ সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান এবং আনন্দ অর্থ হ্লাদিনী অর্থাৎ আহ্লাদকরী বৃত্তি বিশেষ। এই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকেই ভগবান্ বলা যায়। ইঁহার রূপ নবকৈশোর নটবর গোপবেশ বেণুকর নবজলধর শ্যামকান্তি পীতাম্বরধারী অখিল রসামৃতমূর্ত্তি। অন্যান্য দেবদেবীগণের সহিত ইঁহার অংশাংশী সম্বন্ধ ; অর্থাৎ এই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কেহ কেহ চিদ্‌বিভূতি, কেহ কেহ অংশ, কেহ কেহ কলা বিলাসাদি স্বরূপ।

যোগেশ। মায়ার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কি ?

বাবাজী। মায়া কৃষ্ণদাসী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপরা কার্য্যকারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলবতী শক্তিবিশেষ।

যোগেশ। জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ ?

বাবাজী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস।

যোগেশ। জীব তাঁহার দাস, মায়াও তাঁহার দাসী। তবে মায়া জীবকে বন্ধন করিয়া এত কষ্ট দেয় কেন ? এবং জীবের উপর তাহার অধিকারই বা কি ?

বাবাজী। আচ্ছা, তুমি একজন সবরেজিষ্ট্রার—গভর্ণমেণ্টের চাকর। এই হীরালাল বাবু পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টার। ইনিও একজন গভর্ণমেণ্টের চাকর। যদি তুমি রাজনীতির বিরুদ্ধে কোন বে-আইনি কাজ কর, তবে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া হীরালাল বাবু তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন কি? বোধ হয় কখনই না। এইরূপ মায়া ও জীব উভয়েই ভগবদ্দাস। জীব যখন ভগবদাজ্ঞার বিরুদ্ধে বে-আইনি কাজ করে, তখনই মায়া তাহার হাতে গলে বাঁধিয়া নানারূপ শাস্তি দিয়া থাকে।

যোগেশ। জীব এমন কি গুরুতর কার্য্য করে যে, তাহার জন্য মায়া তাহাকে এত কষ্ট দেয়?

বাবাজী। জীব যে কি গুরুতর কার্য্য করে, তাহা আর কি বলিব? সে মত্তুতা বশতঃ প্রভুকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া নিজেই প্রভু হইয়া বসে। ভাবিয়া দেখ, প্রাকৃত রাজ্যের রাজার প্রতি যদি কেহ অবজ্ঞাসূচক ভাষাও প্রয়োগ করে, তবে তাহার কত শাস্তি হয়। কার্য্যতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিলে ত কথাই নাই। আর এ কি না—জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতাকে একেবারে উচ্ছেদ! তাই শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন:

জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী গলায় বাঁধিল॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

যোগেশ। এরূপ দাসত্ব সংসারত্যাগী সাধুদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সংসারী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্বাভিমান না করিলে চলিবে কেন? যখন সকলেই প্রভুর দাস, তখন আমার চাকর কোন অনিষ্ট করিলে আমি তাহাকে শাস্তি দিই কিরূপে? আবার শাস্তি না দিলেও ত কাজ চলিতে পারে না।

বাবাজী। আচ্ছা, তুমি যে কাছারীতে কাজ কর, সে স্থানে আরদালী, চাপরাশি, চাকর প্রভৃতি যাহারা আছে, তাহারা যদি কোনও অন্যায়াচরণ করে, তবে তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও না কি? এবং তাহারা তোমাকে প্রভু বলিয়া মানে না কি?

যোগেশ। হ্যাঁ, তা মানে বৈ কি। অন্যায় কাজ করিলে শাস্তিও দিতে হয়।

বাবাজী। তবেই ভাবিয়া দেখ, সরকারী কাছারীতে তোমারও যেমন অধিকার, চাপরাশীরও তেমনি অধিকার। তুমি প্রভু হইয়া চাপরাশিকে শাস্তি দেও। সে স্থানে যেমন মনে করিতে হইবে, 'সরকারী আইনানুযায়ী কার্য্য না করিলে আমি দায়ী হইব', তেমনি এই ভগবৎ-সংসারে বাস করিয়াও যদি ভগবানের আদিষ্ট কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমি দোষী হইব না কি? মোট কথা অভিমানই অনিষ্টের মূল। তিনি আমায় যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি প্রাণ-পণে তাহাই করিব। যদি কোন বিষয় আমি বুঝিতে না পারি, তবে প্রাণে প্রাণে অন্তর্যামী প্রভুকে জানাইলে নিশ্চয়ই তিনি বুঝাইয়া দিবেন। এইরূপে সংসার করিলে মানব যতই সংসারে লিপ্ত হউক না কেন, মায়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে রাখিতে হইবে যে, আমি তাঁহার নিযুক্ত ভৃত্য, তাঁহার আদিষ্ট পন্থাকে অতিক্রম করিলেই গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে।

অম্বিকা বাবু। আজ্ঞে, আমার একটী প্রশ্ন আছে। যদি অনুমতি করেন, তবে বলি।

বাবাজী। দেখুন, আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে আপনারা সঙ্কুচিত হইবেন না; কারণ আমি কোনও পণ্ডিত বা মহাপুরুষ নহি। প্রভু আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া যাহা স্ফূর্ত্তি করাইয়া দিবেন, আমি তাহাই

আপনাদিগকে বলিব। তাহাতে যদি আপনাদের মনে তৃপ্তি হয়, তবে আমি ভগবৎ কৌশল দেখিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিব।

অম্বিকা বাবু আমি একটী বৈষ্ণবের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, জগতে একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি। আমি কিছুই বুঝিলাম না। ভগবান্ই ত পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাবাজী। আচ্ছা, আপনারা ত পণ্ডিত! প্রকৃতি এবং পুরুষ শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ কি হইতে পারে?

অম্বিকা বাবু। প্র উপপদে কৃ ধাতু ক্তি প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব প্রকৃতি শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যকারিণী শক্তিবিশেষ। আর পুর্ উপপদে বস্ ধাতু ক প্রত্যয় করিয়া পুরুষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব পুরুষ শব্দে যিনি পুরে বাস বা শয়ন করেন, তাঁহাকে বুঝায়। পুর্ শব্দের আবার দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অনেক অর্থ আছে।

বাবাজী। বেশ! এখন বুঝুন, যিনি দেহ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে বাস করিতেছেন বা শয়ন করিয়া আছেন, অর্থাৎ যিনি নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ সাক্ষিস্বরূপ, পুরুষ শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়। আর প্রকৃতি শব্দে প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যকারিণী শক্তিবিশেষ অর্থাৎ যিনি ক্ষণকালও কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহাকেই বুঝায়। পুরুষ শব্দবাচ্য পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গম, কীটপতঙ্গ, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বদেহে সমভাবে বর্ত্তমান আছেন। এই তত্ত্বে অংশাংশিরূপে পুরুষ শব্দে যাবতীয় প্রাণীকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন :—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥

এই অর্থেই বেদান্ত শাস্ত্রে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়াছেন। আর যদ্দ্বারা দৃশ্যাদৃশ্য চেতন-অচেতন জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতি শব্দে ভগবানের সেই প্রধানা শক্তিবিশেষকে বুঝায়। এই জন্যই আমরা প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত জীব। আমাদের মধ্যে যিনি পুরুষ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, পুরুষ যেমন নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ ভাবে অবস্থান করেন এবং কোনও প্রকার সুখদুঃখের ভোক্তা নহেন, তিনি ক্ষণার্দ্ধকালও সেইরূপে থাকিতে পারেন কি? বোধ হয় কিছুতেই না। আমাদের হাত পা বাঁধা থাকিলেও আমরা মনে মনে অনেক দেশভ্রমণ করিয়া থাকি। তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মা শঙ্কর হইতে কীট কীটাণু পর্য্যন্তকেও প্রকৃতি বলিয়াছেন এবং পুরুষ শব্দে একমাত্র ভগবান্‌কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

আর যদি বলেন, প্রাকৃতিক জগতে পুরুষ ও প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার কোথা হইতে আসিল? এই ব্যবহারিক কথার কোনই মূল নাই; কারণ যদি অনাদিকাল হইতে স্ত্রীশব্দবাচ্য ব্যক্তি পুরুষ এবং পুরুষ শব্দবাচ্য ব্যক্তি স্ত্রীশব্দে ব্যবহৃত হইত, তবে তাহাই সংস্কারবদ্ধ হইয়া যাইত। ভাষা কেবল ব্যবহার চলিবার জন্য। দেখুন, আমাদের দেশে

পিতাকে বাবা ও পিতামহকে ঠাকুরদাদা বলা হয়। আবার বৃন্দাবনে পিতাকে দাদা এবং পিতামহকে বাবা বলিয়া থাকে। উড়িষ্যায় মাকে বৌ বলে; বাংলাদেশে পুত্রবধুকে বৌ বলে। উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণগণ পিতাকে ননা বলেন; অপর জাতিরা জ্যেষ্ঠ ভাইকে ননা বলে। ব্যবহারিক জগতে এই পার্থক্যের কোনই মূল নাই। তাই বলি, পুরুষ অর্থ বিষয় এবং প্রকৃতি অর্থ আশ্রয়। এই আশ্রয়ী এবং আশ্রিত হেতুই ব্যবহারিক জগতে প্রকৃতি ও পুরুষ শব্দের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। যেমন আপনি এক ক্ষুদ্র সংসারের কর্ত্তা। দশজন আপনার আশ্রিত। আপনি তাহাদের আশ্রয়দাতা। তাহাদের নিকট আপনি পুরুষ। আবার আপনার পিতা বা জমিদার আপনার আশ্রয়দাতা। আপনি তাহাদের নিকট প্রকৃতি এবং তাঁহারা আপনার নিকট পুরুষ। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন পিতার পিতা, তাঁর পিতা, তাঁর পিতা, তাঁর পিতা ইত্যাদিরূপে একমাত্র ভগবানই পরম পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, সেইরূপ পুরুষের পুরুষ, তার পুরুষ, তার পুরুষ ইত্যাদিরূপে একমাত্র আদিপুরুষ গোবিন্দই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শুনিয়া যোগেশ বাবু প্রভৃতি সকলেই অতিশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আজ আপনার কৃপায় আমাদের বহুদিনের সন্দেহ দূরীভূত হইল। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। আপনার কষ্ট হইবে; অতএব স্নানাদি করুন।" বলিয়া সকলে নিজ নিজ বাসায় প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

নগর কীর্ত্তন ও হরির লুঠ।

অপরাহ্নে যোগেশ বাবু, অধর বাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের অনুরোধে বাবাজী মহাশয় নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন।

ইনি কৃষ্ণনগর আসিবার পূর্ব্বে এইরূপ ভাবে নগরকীর্ত্তন অতি কমই হইত। সুতরাং যখনই খোল করতাল বাজিয়া উঠিত, তখনই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করিত। আজও তাহাই হইল। সকলেই প্রেমোন্মত্ত—সকলেই সমস্বরে বলিতেছে, "আবার বল হরিনাম আবার বল"। কি আশ্চর্য্য! প্রায় প্রত্যহই এই নাম বাহির হইতেছে; কিন্তু সকলেই নিত্য নূতনভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "আহা মরি! আজিকার আনন্দের ন্যায় আনন্দ আর কোনও দিন হয় নাই। আজিকার নামের সুরটা যেন নূতন নূতন বোধ হইতেছে। কি মধুর নৃত্যভঙ্গি! কি মধুর ভাবতরঙ্গ! কি মধুর অভিনব আঁখর স্ফূর্ত্তি! শুনিলে মনপ্রাণ যেন কোন অপ্রাকৃত রাজ্যে চলিয়া যায়। সবই যেন নূতন।" যে যে রাস্তা বা গলি দিয়া কীর্ত্তনপ্রবাহ ছুটিয়া যাইতেছে, সেই সেই পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা, স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষীর হৃদয়ক্ষেত্র বিধৌত হইয়া সুনির্ম্মল ভাব ধারণ করিতেছে। সংকীর্ত্তনের নেতা বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি মতলব খেলিতেছে—আজ যে ইনি ইঁহার প্রাণারাম নিতাইগৌরকে লইয়া কি খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে?

ক্রমে কীর্ত্তন সহরের এক প্রান্তে উপস্থিত হইল। শান্তিপুর-নিবাসী ভুবনমোহন মিত্র নামক জনৈক ভক্ত* মনে মনে ভাবিতেছেন এবং সঙ্গী লোকদিগকে বলিতেছেন, "এই কীর্ত্তন সম্প্রদায়টী যদি আমার বাড়ী আসে এবং আমার বাসনানুযায়িভাবে কার্য্য হয়, তবে জানিব ইনি একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" বলিতে না বলিতে সংকীর্ত্তনের

* ইনি কৃষ্ণনগর নিজ বাসাবাটীতে থাকিয়া তত্রত্য রেজিষ্ট্রী অফিসে কেরাণীগিরি কার্য্য করিতেন।

দল দ্রুতবেগে সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ভুবনবাবু কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তনসম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় তাহাকে কোল দিলেন এবং অতি প্রসন্নভাবে নাচিতে নাচিতে উঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভুবন বাবুর বাড়ীর মধ্যে ছোট একটী তুলসীমঞ্চ ঘেরিয়া নাম হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। এক একবার উন্মত্তবৎ সংকীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিতেছেন, আর এক একবার "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল। কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই। সে স্থান লোকে লোকারণ্য। অনেক লোক বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছে।

হঠাৎ একটী লোক উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সংকীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। লোকটীর ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে কীর্ত্তন সম্প্রদায় উক্ত লোকটীকে বেষ্টন করিয়া নাম করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিন্তু একপার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে সংকীর্ত্তন-প্রবাহ যতই প্রবল বেগ ধারণ করিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তির 'মা মা' ধ্বনিও যেন ততই প্রবল হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঐ লোকটী বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া উঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল যে, ঐ ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী সজোরে চুষিতেছে এবং তাহার মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া ঠিক স্তনদুগ্ধের ন্যায় দুগ্ধধারা বহিয়া পড়িতেছে। জানি না, দাতার ইচ্ছা কি ভোক্তার ইচ্ছা। সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির অঙ্গ পুলকিত এবং উহার মুখখানি দেখিলে

বোধ হইতেছে যেন সে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে। বাবাজী মহাশয়ের চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ও অর্দ্ধমুদ্রিত। সকলে দেখিয়া অবাক্। বহু সন্তর্পণে ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য হইলে সে উঠিয়াই বলিতে লাগিল, "অহো! আজ আমি ধন্য হইলাম। বহু যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া যে বস্তু লাভ করা যায় না, এই মহাপুরুষের কৃপায় আজ আমি সেই বস্তু লাভ করিলাম। বাল্যকালে মাতৃস্তনদুগ্ধ পান করিয়াছি; কিন্তু তাহার আস্বাদ অনুভব করিতে পারি নাই। আজ সেই অমৃত পরিতৃপ্তভাবে প্রাণ ভরিয়া পান করিলাম। আহা মরি কি করুণা। কি অলৌকিকী শক্তি!" উপস্থিত জনমণ্ডলী প্রত্যক্ষ দুগ্ধধারা দেখিয়া এবং ঐ ব্যক্তির কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। ভুবনবাবুর মানসিক ইচ্ছা যে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে একটু বিশ্রাম করেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভাব যে, তিনি নিজে কিছু বলিবেন না। মহাপুরুষ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। অন্তর্য্যামী বাবাজী মহাশয়ও তাহাই করিলেন।

কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া গৌরহরিবোল দিতেছেন, এই সময় ভুবনবাবু একটী শালপাতার ঠোঙ্গায় সওয়া পাঁচ আনার বাতাসা আনিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! হরির লুঠ দিতে হইবে।"

বাবাজী। ছড়াইয়া দাও বাবা!

ভুবন। না বাবা! আমার মনের বাসনা—আপনি হাতে করিয়া দিবেন।

তখন বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া ভক্তটীর হাত হইতে পাতার ঠোঙ্গাটী হাতে লইয়া গান ধরিলেন।

আয়রে তোরা লুটবি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধার রে, নিতাই চাঁদ তাঁর অঙ্গ আধা রে,
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটী চাঁদ, এসে উদয় হ'ল নদীয়ায় ॥
পরম দয়াল গৌরাঙ্গ নিতাই, এমন দয়াল আর ত দেখি নাই,
(জীবের) দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, হরি ব'লে ধূলাতে লুটায় ॥
(নিতাই) মাথায় লয়ে প্রেমের গাগরি, ডেকে বলে বল গৌরহরি,
(আবার) গোরা গোরা ব'লে ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে, যতই ঢালে তত বেড়ে যায় ॥

সকলেই গানের তালে তালে মধুর নৃত্য করিতেছেন। বাবাজী মহাশয়ের বামহাতে বাতাসাপূর্ণ শালপাতার ঠোঙ্গাটী। দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর এক একবার "গৌর হরিবোল" বলিয়া বাতাসা ছড়াইয়া দিতেছেন। সকলেই প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছে, আর হরির লুঠের বাতাসা কুড়াইতেছে। বাবাজী মহাশয় চারিদিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাতাসা ছড়াইতেছেন। যাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিল, তাহারা কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরির লুঠের প্রসাদ লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইতেছে দেখিয়া করুণাময় বাবাজী মহাশয় সদর দরজার কাছে আসিয়া রাস্তায় বাতাসা ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

সকলেই পরিতৃপ্ত—সকলেই পরমানন্দিত। লুঠ শব্দটী যেন মূর্ত্তিমান্ হইল। লঘুগুরু ভেদ নাই। কেহ বা কাহারও হাত হইতে কাড়িয়া লইতেছে; কেহ বা ভূমিতে না পড়িতেই লুফিয়া ধরিতেছে। বালকগণ ভূমে গড়াগড়ি দিয়া বাতাসা কুড়াইতেছে। কেহ কেহ বা কাপড়ের আঁচল পাতিয়া বাতাসা ধরিতেছে। আবার কেহ কেহ বা উদারতা প্রকাশ করিয়া অপরকে বিতরণ করিতেছে। কেহ বা অন্যের মুখে তুলিয়া দিতেছে। আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু কোন দিকেই খেয়াল নাই। অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে কেবল

বাতাসাই ছড়াইতেছেন। সকলেই দেখিয়া অবাক্! এইরূপে প্রায় একঘণ্টাকাল বাতাসা ছড়ান হইল; কিন্তু শালপাতার ঠোঙ্গাটী পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ ই রহিয়াছে দেখিয়া অনেকে এই বিষয় লইয়া পরস্পর সমালোচনা করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় প্রতিষ্ঠার ভয়েই যেন একেবারে শাল-পাতার ঠোঙ্গাটী হাত হইতে ঊর্দ্ধদিকে ফেলিয়া দিলেন। ভুবন বাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম—আমার কুল পবিত্র হইল। আমি আশা করি নাই যে, আমা হেন পাষণ্ডের কুটীরে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইবে। আপনি করুণাময়; আপনার দয়ায় এ নরাধম আজ নবজীবন লাভ করিল।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সবই পরম দয়াল নিতাইচাঁদের খেলা; আমরা পুতুলমাত্র।" এই বলিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। লোকে লোকারণ্য। নগরবাসী লোক আপন ইচ্ছায় আলো হাতে লইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। যাইবার সময় সংকীর্ত্তন যে রাস্তা দিয়া গিয়াছিল, আসিবার কালে সে রাস্তায় না গিয়া নূতন রাস্তা ধরিয়া যাইতে লাগিল ইহারা সকলেই নূতন। কোন্ পথে যাইতে হইবে, তাহা ইঁহাদের মধ্যে কেহই জানেন না; কাহারও নিকট জিজ্ঞাসাও নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাবাজী মহাশয় ঠিক্ সুপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে আগে আগে যাইতেছেন এবং সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এইরূপ ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আসিয়া বাসায় পৌঁছিলেন এবং কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। ক্রমে সকলে নিজ নিজ বাসায় গমন করিলে ইঁহারা যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

কৃষ্ণনগরে পদচিহ্ন।

একদিন অপরাহ্ণে যোগেশ বাবু নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দাদা! মায়ের ইচ্ছা যে আগামী কল্য আমার বাসায় আপনাদের সকলের প্রসাদ পাওয়া হয় এবং সন্ধ্যার পর একটু কীর্ত্তন করা হয়।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বেশ তাহাই হইবে; আমার কোনই আপত্তি নাই।" শুনিয়া যোগেশ বাবু আনন্দিত মনে বাসায় আসিয়া মাকে সমস্ত কথা বলিলেন।

পরদিন বেলা আন্দাজ এগারটার সময় বাবাজী মহাশয় স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক সগণে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে যোগেশ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং যোগেশ বাবুর বাৎসল্যময়ী মায়ের অনুরোধে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। যোগেশ বাবুর ভগিনী বলিলেন, "দাদা! আপনাকে সকলেই মহাপুরুষ বলে। কৈ আমাদিগকে ত কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইলেন না।"

বাবাজী। দিদি! আমি সামান্য মানুষ; আমি কি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে পারি? যদি তোমার কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে পরম দয়াল লীলাময় নিতাই গৌরাঙ্গকে জানাও। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক দেখাইতে পারেন।

যোগেশ বাবুর মা বলিলেন, "বাবা, তুমি মহাপুরুষই হও, আর দেবতাই হও, তোমার প্রতি আমার কি যে একটা স্নেহ জন্মিয়াছে! আমি আমার যোগশকে যেমন ভাবে দেখি, তোমাকেও সেইরূপ মনে করি।"

বাবাজী। মা! এই ভাবটী বড়ই মধুর। আমি প্রার্থনা করি, আমার প্রতি আপনার ঐ বাৎসল্য ভাবটীই যেন চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে।

ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে অতি আনন্দসহকারে প্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গোকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় আসিয়া দণ্ডবৎ প্রনামপূর্ব্বক অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "স্থির হও— নাম কর বাবা! কলিযুগে নাম ভিন্ন আর গতি নাই। নামের অপার মহিমা। নামের আভাসে মুক্তি হয়।" একস্থানে বলিয়াছেন—

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

গোকুল বাবু বলিলেন "আজ্ঞে, এই নামের কোনরূপ তারতম্য আছে কি না?"

বাবাজী। বাবা! একজন লোকের যদি দশটা নাম থাকে, সেই দশটা নামের মধ্যে যে নাম ধরিয়া ডাক না কেন, সেই লোক্ই উত্তর দিবে। এইরূপ ভগবানেরও হরি, রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, গোবিন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতি অনন্ত নাম। রুচি অনুসারে যাহার যে নাম ইচ্ছা, সেই নাম ধরিয়া ডাকিলেই তিনি কৃপা করিবেন। তবে রসনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে নামের তারতম্য আছে।

গোকুল। সে কিরূপ?

বাবাজী। ব্রজরসের উপাসক ব্যক্তি দ্বারকানাথ, রুক্মিণীবল্লভ, যাদবেন্দ্র চূড়ামণি, বৈকুণ্ঠনায়ক প্রভৃতি নামে শান্তি লাভ করিতে পারেন না। আবার ব্রজের মধ্যে এক এক রসের পাত্র এক এক নাম ভাল বাসেন। যেমন রাখালগণ ভাইকানাই, ভাই গোপাল, রাখালরাজা প্রভৃতি নামে সুখ পায়। আবার গোপীগণ গোপীনাথ, গোপীবল্লভ, ব্রজেন্দ্রনন্দন, বনমালী, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি নাম ভিন্ন অন্য নাম ভালবাসে

না। তন্মধ্যে আবার শ্রীমতী রাধিকার গণে যে সমস্ত গোপী, তাঁহারা রাধারমণ, রাধাবল্লভ, রাধাকান্ত, রাসবিহারী, রাধাবিনোদ, রাধামাধব, রাধানাথ, মদনমোহন প্রভৃতি নামে আকৃষ্ট। শত সহস্র বিপদাপন্ন হইলেও তাঁহারা এই সকল নাম ভিন্ন অন্য নাম করিতে পারেন না। নামের রুচি অনুসারে রসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নামান্তর বা রসান্তরের প্রতি বিদ্বেষভাব রহিত হওয়া চাই। যার যে ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম। নিন্দাশূন্য নম্রভাবে নাম ও রসৈকনিষ্ঠ হইয়া উপাসনা করা উচিত।

গোকুল। দেখা যায় অনেক বৈষ্ণব কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি নাম করেন না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

বাবাজী। এইটিই যে বৈষ্ণবের পরিচয়, তাহা নহে। যিনি কৃষ্ণ উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার সর্ব্বাগ্রে শিব এবং শক্তির উপাসনা করা চাই। গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত করিয়া কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন। মহাদেব শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর নাম ধারণপূর্ব্বক বাস করিতেছেন। ইঁহাদের করুণা না হইলে কিছুতেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা ব্রজে বাস হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সবার নিকট মেগে লবে ইষ্ট ভক্তিবর॥ *

'তৎপর' অর্থ—কৃষ্ণকামনা ভিন্ন অন্য কামনার বশীভূত হইয়া তত্তৎ-কামনাফলদ দেবদেবীগণকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরী বোধে সেবা করা। এ ত গেল শাস্ত্রের কথা; যুক্তিতেও দেখ, মাতাপিতা নানারূপ চেষ্টা দ্বারা

* যদিও ইষ্টভক্তিবর স্থানে কৃষ্ণভক্তিবর পাঠ রহিয়াছে; কিন্তু বাবাজী মহাশয় সার্ব্বজনীনতা ভাব রক্ষার জন্য ইষ্টভক্তির পাঠই ব্যবহার করিতেন।

কন্যাকে লালন পালন করিয়া যখন উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করেন, তখন সে কি মাতাপিতাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে? না তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়? শিব এবং শক্তি আমাদের পিতামাতা। আমরা তাঁহাদের কৃপায় কৃষ্ণ পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে হারাইতেই বা কতক্ষণ?

এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনে সন্ধ্যা হইল। এদিকে যোগেশ বাবু তাঁহার বৈঠকখানা হইতে যাবতীয় চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি বাহির করিয়া গঙ্গাজল ধূপধূনাদি দ্বারা গৃহটী সুধূপিত করিলেন।

ক্রমে দুই চারিজন করিয়া লোকজন আসিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সগণে খোল করতাল লইয়া সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আরতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আরতি কীর্ত্তনান্তে পদকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন :—

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
মণ্ডলী বন্ধন ছাঁদে নৃত্য আরম্ভিল॥
সুমধুর গান করে মুরারি মুকুন্দ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে পরম আনন্দ॥
নাটুয়া ঠমকে নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চারিদিকে নাচে যত প্রিয় সহচর॥
দক্ষিণে নিতাই নাচে বামে গদাধর।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর॥
গদাধরের বামে নাচে শ্রীবাস নরহরি।
চৌষট্টি মহান্তগণ নাচে ঘুরি ঘুরি॥
রামাই নন্দাই নাচে দ্বাদশ গোপাল।
সবেই বিভোর ভাবে নাহিক সম্ভাল॥

শ্রীবাস মন্দির ভেল মহারাসস্থলী।
ভকতমণ্ডলী ভেল গোপিকামণ্ডলী ॥
সবেই গায়েন হরে কৃষ্ণ হরে রাম।
ভুবনমঙ্গল গোরা নাচয়ে সুঠাম ॥

সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া 'ভুবন মঙ্গল নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই পদ গাহিতে লাগিলেন। নামের অপূর্ব্ব এক রোল উঠিল। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী যেন নামের স্রোতে গা ঢালিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। আর 'ভুবন মঙ্গল নাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় ভাবে বিহ্বল হইয়া গদগদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

নিতাই গৌরাঙ্গ নাচে যেন রাধাশ্যাম।
সবেই গায়েন হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥
এহেন গৌরাঙ্গ পেতে যদি থাকে আশ।
একান্ত ভাবেতে হও নিত্যানন্দ দাস ॥
মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দদাস।
সেই সে দেখিবে গোরার স্বরূপ প্রকাশ ॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
একলা নিত্যানন্দ হৈতে পাইবে জগতে ॥
নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম ধন।
রাসবিলাসে পাবে শ্রীরাধারমণ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম তরী আরোহণে।
সংসার-সাগর পার চল বৃন্দাবনে ॥
নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
ভাবে মাতোয়ারা সব সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥

ঐ যে আমার নিতাই নাচে ভাবেতে বিভোর।
আচণ্ডাল যারে পায় ধ'রে দেয় কোল॥

বলিতে বলিতে একেবারে সজ্ঞাহীন। দুইটী নয়ন হইতে যেন শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল। পুলকভরে সর্ব্বাঙ্গ শিমুলবৃক্ষের ন্যায় হইল। ক্ষণকাল পরে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ভক্তমণ্ডলী চারিদিকে বেড়িয়া নাম করিতেছেন, আর একদেহে ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য প্রভৃতি দর্শনে পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। যখন স্তম্ভিত হইতেছেন, তখন দেখিয়া মনে হইতেছে যে দেহে যেন প্রাণ নাই। ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে রোদন, ক্ষণে কম্প, ক্ষণে পুলক প্রভৃতি দর্শনে পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, "মনুষ্যদেহে এরূপ অদ্ভুত ভাববিকার হয়, ইহা আমরা কখন শুনিও নাই, দেখা ত দূরের কথা।" কেহ কেহ বলিতেছেন, "কেহ সংকীর্ত্তনে পড়িয়া গেলে আমার হাসি পাইত এবং মনে হইত যে, এ সকল ভাণমাত্র। কিন্তু আজ ইঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম"। ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়কে ঘেরিয়া বহুক্ষণ নাম করিবার পর কিঞ্চিৎ অর্দ্ধ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া হঠাৎ গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভজ নিতাই গৌর পাবে রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" সকলেই সমস্বরে "ভজ নিতাই গৌর পাবে রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম গাহিতে লাগিলেন। রাত্রি যখন প্রায় দশটা সাড়ে দশটা, তখন আর কাহারও দেহস্মৃতি নাই। একদল বলিতেছেন, "ভজ নিতাই গৌর পাবে রাধেশ্যাম।" অপরদল বলিতেছেন "জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" উভয় দলেই যেন পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য প্রাণপণে নাম কীর্ত্তন করিতেছেন এবং প্রেমবিহ্বলভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন।

বাবাজী মহাশয় একটী দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে পুলকাশ্রু-সিক্ত কলেবরে দণ্ডায়মান হইয়া ঈষৎ হসিতবদনে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক যেন কি দেখিয়া ভাবভরে দুলিতেছেন। গৃহাভ্য-ন্তরস্থ ভক্তগণ একএকবার যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব, প্রাণমন-মাতান সুঘ্রাণ পাইয়া উহার উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও মানববুদ্ধির অগোচর, অপ্রাকৃত সৌরভের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পরস্পর নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। নামের প্রবাহ সমান ভাবেই চলিতেছে। নানারূপ অলৌকিক ঘটনাদর্শনে বাবুভায়াগণেরও যেন একটু বাহ্যানুসন্ধানের প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়িল। রাত্রি প্রায় বারটার সময় অন্তর্য্যামী প্রভু ভক্তগণের শ্রম জানিয়াই যেন বহির্বিস্তৃত নিজশক্তিসমূহ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল বটে; কিন্তু তখনও বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। জনৈক ভক্ত বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিতে গিয়া দেখে যে, অশ্রু এবং ঘর্ম্মজল একত্র মিলিত হইয়া ইঁহার পদ-প্রান্ত হইতে ভূমিতলে পতিত হইতেছে। দুই তিন জন ভক্ত পাখার বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ বাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এদিকে যেস্থানে বাবাজী মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন, সেস্থানে অপর একজন ভক্ত দণ্ডবৎ করিতে গিয়া দেখে যে, শানের উপর ঠিক দুইখানি পায়ের অনুরূপ চিহ্ন পড়িয়া আছে এবং ঐ চিহ্নের মধ্যে অল্প অল্প ঘর্ম্মজল সঞ্চিত রহিয়াছে। তখন সে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ঐ চিহ্নটী শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলিল; কিন্তু সে দাগ কিছুতেই উঠিল না; বরং তাহার উজ্জলতা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে এই ঘটনাটি লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতে লাগিল। যোগেশ বাবু এক একবার ঘরের মধ্যে গিয়া বাবুদের সঙ্গে যোগ দিতেছেন। আর এক একবার বাহিরে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিতেছেন। যেন কত কি বলিবেন মনে করিতেছেন; কিন্তু বলিতে না পারিয়া হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই বিলীন হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ অম্বিকাবাবু গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আপনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই স্থানে মেজের উপর ঠিক আপনার পায়ের অনুরূপ দুইটী চিহ্ন পড়িয়া আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?" বাবাজী মহাশয় প্রতিষ্ঠার ভয়ে ঘটনাটি অপ্রকাশিত রাখিবার মানসে নানারূপ প্রতারণাবাক্যে অম্বিকা বাবুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই শিক্ষিত লোক; কোনরূপ স্তোভ বাক্যে বিশ্বাস করেন না। তাই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদন করা ঘটিল না। স্বপ্রকাশ বস্তু নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

সে রাত্রে যোগেশবাবু বিশেষ ভাবে ভোগরাগের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রসাদ পাওয়ার ব্যাপারটাও বেশ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল। ভক্তগণ পদচিহ্নের কথা লইয়া পরস্পর সমালোচনা করিতে করিতে নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। ইঁহারাও সে রাত্রি তথায়ই বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে যোগেশবাবুর বৈঠকখানায় বহু-লোক-সমাগম হইতে লাগিল। কি কালপ্রভাব! প্রত্যক্ষ দেখিয়াও লোকে বিশ্বাস করিতে চায় না। কেহ কেহ বলিতেছে, "নবদ্বীপ হইতে একটী বাবাজী আসিয়াছেন, তিনি এক জন মহাপুরুষ। দেখ দেখি বিলাতী মাটীর মেজের উপর পায়ের দাগ পড়া! একি সামান্য

মানুষে সম্ভবে? আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যোগেশ বাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া মাত্রই মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। আবার ঐ মহাপুরুষের মূর্ত্তিখানি দেখিলে ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তিরও চিত্তবৃত্তি দ্রবীভূত হইয়া যায়।" কেহ কেহ বা বলিতেছে, "হাঁ, লোকটী মন্দ নয়। তবে ইঁহার দ্বারা সাধারণের উপকারের পরিবর্ত্তে, আমার বিশ্বাস, অপকারই হইবার সম্ভাবনা। কারণ কলেজের ছেলেরা পড়াশুনা বন্ধ করিয়া যেরূপ মাতিয়াছে, তাহাতে গতিক বড় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। নবীন বাবুর পুত্র গোকুলবাবু বোধ হয় ঘরে থাকে কি না সন্দেহ।" অপর কেহ কেহ বা বলিতেছে, "হ্যাঁ হে. ওঁর একটা ছেলে-ধরা গুণ আছে। ওটী ছেলে ধরা বাবাজী!" এইরূপ নানাকথার আলোচনা হইতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকালে উঠিয়াই খোলকরতাল যোগে "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর। জয় শচীনন্দন, জগজ্জীব-তারণ, কলি কলুষ নাশন অবতার॥" এই পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ যাইবার মানসে স্নান করিবার ছলে খ'ড়ে নদীর দিকে চলিলেন। একে প্রভাত কাল; সকলেরই মন নির্ম্মল, তাহাতে আবার সুমধুর কণ্ঠে মধুময় নামকীর্ত্তন জনসমূহকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে বহু লোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিল। সংকীর্ত্তনটীও বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিল। কাজেই সেদিন আর বাবাজী মহাশয়ের নবদ্বীপ যাওয়া হইল না। নিতাইচাঁদের বোধ হয় আরও কিছু খেলা বাকী আছে। যোগেশ বাবু প্রভৃতি অনেক অনেক অফিসারগণ সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছেন। কিন্তু অফিসের কথা কাহারও মনে নাই।

এ অবস্থাটীকে আমরা কাহার মোহিনী শক্তি বলিব? নামের, না

নামকীর্ত্তনকারী মহাপুরুষের ? যদি বলি নামের, তবে নাম ত অনেক দিনই হইয়া থাকে ; কিন্তু এরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ত প্রায়ই দেখা যায় না। কেহ যেন মনে না করেন, ইহাতে আমি নামের শক্তির খর্ব্বতা করিতেছি। নাম সর্ব্বশক্তিমান্ একথা সুসত্য ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, কাচের গুণে আলোকের উজ্জ্বলতার ন্যায় আধারের গুণেই আধেয়ের শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

অনেকেই হয় ত এই পদচিহ্ন সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা করিবেন। এমন কি, অনেকে হয় ত বিশ্বাস করিতে না পারিয়া ঘটনাটী কল্পিত বলিয়াই মনে করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ইঁহার অলৌকিকী শক্তি দর্শন বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত এই ঘটনাটীকে অতি যৎসামান্য বলিয়াই গণনা করিবেন। বহু কালের কথা নয়, তেইশ চব্বিশ বৎসর মাত্র হইয়াছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষকারী অনেক লোক এখনও রহিয়াছেন। বার বৎসর কাল এই চিহ্নটী স্পষ্টই ছিল। আমাদের দুরাদৃষ্ট বশতঃই হউক বা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হউক অথবা নানারূপ অনাচার বশঃতই হউক, মহাপুরুষের অপ্রকটের দুই তিন বৎসর পরে চিহ্নটী ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। বাড়ীটী কৃষ্ণনগর ছুতার পাড়ার মধ্যে। বাড়ীখানির মালিক নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নিজে না থাকিয়া বাড়ীখানি সাধারণকে ভাড়া দিতেন।

যোগেশ বাবু বদলী হইয়া যাওয়ার পর সেই বাড়ীতে নানাজাতীয় লোক ভাড়াটীয়া ছিল। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাকৃত চিন্ময় জিনিষের মর্য্যাদা রক্ষা করা সুকঠিন সুতরাং স্থানটীর উপর নানারূপ অনাচার হওয়ায় চিহ্নটী ক্রমেই অন্তর্হিত হইল। বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে চিহ্নিত স্থানটীর উপর দিয়া লোকের চলাচল বন্ধ

রাখিবার জন্য স্থানটী কোনরূপ আবরণে আবৃত করিয়া দিতে অথবা চিহ্নটী তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় অগত্যা কেহ কেহ রং দ্বারা কাপড়ের উপর চিহ্নটী তুলিয়া লইয়াছেন।

বাবাজী মহাশয় যোগেশ বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের অফিস আছে না? বেলা যে অনেক হইল।" যোগেশ বাবু বলিলেন "আপনি জানেন।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে বাসায় আসিয়া স্নানাদি করিলেন।

যোগেশ বাবু যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলেন। নাম মাত্র অফিসে যান। কি বলিতে কি বলিয়া শেষে অপ্রস্তুতভাবে কেরাণী-দিগকে বলেন, "বাবা, তোমরা আমার কোন কথা ধরিও না।" শয়নে স্বপনে কেবল "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" নামটী যেন কণ্ঠহার হইল। প্রায় দেড় মাস হইল, কৃষ্ণনগরে কেবল বাবাজী মহাশয়ের সুমধুর কীর্ত্তন, সুললিত পদাবলী, অপরূপ নৃত্যভঙ্গি, অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ, সুমিষ্ট ব্যবহার এবং মধুমাখা কথা লইয়াই সমালোচনা চলিতেছে। যেখানে দুইজন একত্র হইতেছে, সেই স্থানেই ইঁহাদের কথা। আবার আজ এক নূতন সমালোচনা উঠিল, পাকামেজের উপর পায়ের দাগ পড়িয়াছে। ক্রমে বহু লোক যোগেশ বাবুর বৈঠকখানায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। দেবেন বাবু বলিলেন, "দাদা যথার্থই যোগেশ বাবুর বৈঠকখানায় পদচিহ্ন পড়িয়াছে।" বাবাজী মহাশয়, বলিলেন, "দেখ ভাই, উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান কেন? নিতাই কি খেলা খেলিতেছেন, তিনিই

জানেন। সে বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্যকরা অনুচিত।” ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। এদিকে জনৈক ভক্ত ভোগের দ্রব্যাদি আনিয়া দিলে সকলের উদ্যোগে অতি শীঘ্রই রন্ধনাদি শেষ হইল। ভোগের পর প্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

দিগ্‌নগর যাত্রা।

অপরাহ্নে বাবাজী মহাশয় দেবেন বাবুকে বলিলেন, “দেখ ভায়া! কৃষ্ণনগরে অনেক দিন হইল। আর এখানে থাকা উচিত নয়।” দেবেন বাবু বলিলেন, “এখানকার লোকের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, বলা কহা করিয়া শীঘ্র এখান হইতে যাওয়া সুকঠিন হইবে। চলুন, এই স্থান হইতে আজ দিগ্‌নগর যাওয়া যাক্।” বাবাজী মহাশয় দেবেন বাবুর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক তখনই “ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥” এই নাম ধরিয়া বাহির হইলেন। যোগেশ বাবু প্রভৃতি অনেকেই অফিসের ছুটির পর বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখেন যে ‘ইনি কীর্ত্তন লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। প্রথমে সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, বোধ হয় বাবাজী মহাশয় নগরকীর্ত্তন করিতেই বাহির হইয়াছেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কীর্ত্তনের গতি ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখী হইতে লাগিল, তখন অনেকেই নিরাশ প্রাণে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। যোগেশ বাবু প্রভৃতি কয়েক জন অনেক দূর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় নানারূপ প্রবোধবাক্যে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া দেবেন বাবুর উপদিষ্ট পথ ধরিয়া দিগ্‌নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাপুরুষের চিত্ত কুসুম হইতেও কোমল এবং বজ্র হইতেও কঠিন। কৃষ্ণনগরবাসী

নরনারীগণ মনে মনে আশা করিয়াছিল যে, অন্ততঃ আরও কিছু দিন এই অননুভূতপূর্ব্ব চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করিবেন। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইল না। কৃষ্ণনগর আজ নিরানন্দময়। যাঁহারা পরমানন্দিত হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি দুঃখিতমনে নিজ নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয় সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর দিগ্‌নগর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া সাতগাছিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গোস্বামী মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাটীর বাহিরে আসিয়া দেবেন বাবু ও বাবাজী মহাশয়কে দর্শনমাত্র হৃষ্টচিত্তে বিশেষ আগ্রহ সহকারে ইঁহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে গ্রামবাসী অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। রাধিকা চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটী যেন আনন্দ-ভবন হইল। তিনি যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই ইঁহাদের প্রাণ মাতান সংকীর্ত্তনের কথা বর্ণনা করিয়া এবং বাবাজী মহাশয়ের নানারূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় কীর্ত্তন-সমাপ্তি হইল। সকলেই বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাধিকা চক্রবর্ত্তী বাবাজী মহাশয়কে আহারাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। দেবেন দাদা যাহা করেন, তাহাই হইবে।" তখন দেবেন বাবু রাধিকা চক্রবর্ত্তীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন, এই সময়ে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমি রান্না করিয়া নিতাইয়ের ভোগ দিতে ইচ্ছা করি।" শুনিয়া রাধিকা চক্রবর্ত্তী অতি হৃষ্টচিত্তে ভোগের যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন।

এদিকে কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া পরস্পর নানারূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, মুসলমানেরা আমাদের বহুদিনের পুরাতন বট-গাছটীর এক পাশের সমস্ত ডালপালা কাটিয়া ফেলিয়াছে। বহুকাল হইতে ঐ গাছটীকে আমরা সকলেই দেবতুল্য ভক্তি সহকারে প্রণাম বন্দনা করিয়া থাকি। আমরা নিষেধ করিলে উহারা বলিল যে, "সব জায়গাই হিন্দুদের দেবতা। কৈ ঠাকুর, একটা দেবতা দেখাইতে পার?" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "মহাশয়! কি হয়েছে?" একজন বলিলেন, "আমাদের এই দিগ্‌নগরের সরকারী রাস্তার এক পাশে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটীকে আমরা জন্মাবধি ঐ রকমই দেখিতেছি। মুসলমানেরা গোঁয়ারা বাহির করিবার সময় উহার ডালপালা কাটিয়া ফেলিয়াছে।

বাবাজী। এখানে উহাদের মৌলবী কেহ আছে কি?

ভদ্রলোক। না মহাশয়, এখানে কোন মৌলবী নাই। তবে খোসচাঁদ কাজি নামে একজন ফকির আছে। কিন্তু সে লোকটা বড় দুষ্ট। আর হারাধন মণ্ডল নামক একজন প্রধান মুসলমান আছে। উহাদের মধ্যে সেই লোকটা একটু ভদ্র এবং সকলেই তাহার বাধ্য।

বাবাজী। আপনারা মঙ্গলময় প্রভুকে জানান, তিনিই ইহার প্রতিবিধান করিবেন। চারি যুগেই ত এইরূপ হইয়া আসিতেছে, আবার সমাধানও তিনিই করিতেছেন।

এইরূপভাবে নানা কথোপকথনে অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ইঁহারাও প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

সংকীর্ত্তনে কল্পতরুর নৃত্য।

বাবাজী মহাশয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সগণে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামে বাহির হইলেন। নূতন ধরণের নামকীর্ত্তন শুনিয়া ক্রমে গ্রামবাসী বহুলোক আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য নাই। চরণে চরণ রাখিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে নাচিতে নাচিতে একেবারে পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৃক্ষরাজের ছিন্ন শাখাসকল দর্শন করিয়া দুঃখিত মনে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে বৃক্ষটী পরিক্রমা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বরাবর মুসলমান পাড়ার দিকে চলিলেন। গ্রামবাসীগণ কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "ইঁহারা কীর্ত্তন লইয়া মুসলমান পাড়ার দিকে চলিলেন; না জানি কি হয়।" কেহ কেহ বলিতেছে, "ইনিই না হয় অপরিচিত, কিন্তু দেবেন চক্রবর্ত্তী ত জানেন যে, মুসলমান পাড়ার মধ্যে কীর্ত্তন লইয়া গেলে অপমানিত হইতে হইবে।" একজন বলিল, "চল, আমরা উঁহাদিগকে ও পাড়ার মধ্যে যাইতে নিষেধ করি।" শুনিয়া অপর একজন বলিল, "আচ্ছা, কি হয় দেখাই যাক্ না কেন!" কে কাহার কথা শুনে? বাবাজী মহাশয় যেন কতকালের পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় কীর্ত্তন করিতে করিতে একেবারে হারাধন মণ্ডলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। হারাধন ঘরের মধ্যে ছিল; হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে বহু লোকসমাগম দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে যেমন বাহিরে আসিল, অমনি কীর্ত্তনমণ্ডলী শিক্ষিত সৈন্যমণ্ডলীর ন্যায় তাহাকে ঘেরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই—সকলেই প্রেমে

উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় হারাধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বল্ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

হারাধন। বল্ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

বাবাজী। বল্ বেটা হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

হারাধন। বল্ বেটা হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

বাবাজী। বল্ বেটা নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

হারাধন। বল্ বেটা নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

এইরূপে প্রায় পনের মিনিট সময় ইনিও যে সুরে যে শব্দ ব্যবহার করেন, হারাধনও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঠিক সেই সুরে সেই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে, আর তাহার আনাভিলম্বিত শ্মশ্রু বহিয়া দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। উহার দক্ষিণ হস্তে নানাবর্ণের স্ফটিক নির্ম্মিত জপমালা এবং পায়ে খড়ম। সেই অবস্থায়ই দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে হারাধনকে কোল দিবামাত্র সে একেবারে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কীর্ত্তন মণ্ডলী হারাধনকে ঘিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় হারাধনের মস্তক কোলে তুলিয়া কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। তখন সে কম্পিতকলেবরে এক একবার ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল; আবার ধূলি ধূসরিত গাত্রে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হারাধনের পরিজনবর্গ এইসব দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। উপস্থিত গ্রামবাসী লোকসকল এক একবার হরিবোল দিতেছে আর সতৃষ্ণ নয়নে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। ক্রমে হারাধনের পায়ের খড়ম ছুটিয়া গেল—হাতের মালা পড়িয়া গেল; খেয়াল নাই। সে একদৃষ্টে বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে লাগিল

এবং উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষের দিকে চলিলেন। সঙ্গিগণও নাম করিতে করিতে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল। হারাধন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আত্মহারাভাবে ইঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল। হারাধন আজ হাড়াইধনের কৃপায় যেন বহুকালের হারান ধন পাইয়া আপনা হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে কুলমর্য্যাদা, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি তাহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিল। গাছতলায় উপস্থিত হইয়াই সকলে নাম করিতে করিতে বৃক্ষরাজকে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত বৃক্ষরাজের যে যে শাখার নিম্নদেশে কীর্ত্তন হইতে লাগিল, সেই সেই শাখাপল্লবাদি কীর্ত্তনের তালে তালে দুলিতে লাগিল এবং বিন্দু বিন্দু জলকণা ঝরিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে কোনও পক্ষী প্রভৃতির পক্ষাঘাতেই বৃক্ষের শাখা নড়িতেছে; কিন্তু সে ভ্রম বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। কারণ ইঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে যে যে শাখার নিম্ন প্রদেশে যাইতেছেন, সেই সেই শাখারই ঐরূপ অবস্থা। কি হিন্দু, কি মুসলমান, যেই সেস্থানে উপস্থিত হইতেছে, সেই এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া অপরকে দেখাইতেছে! ঘোর পাষণ্ডও এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বাবাজী মহাশয়ের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল।

ক্রমে হিন্দুমুসলমান, বালকবৃদ্ধ, পুরুষনারী সকলেই "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম করিতে করিতে বৃক্ষরাজকে পরিক্রমা করিতে লাগিল। বৃক্ষটী যেন আজ কল্প-বৃক্ষ হইলেন। উহার প্রতি পত্রে পত্রে যেন আনন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তরুবর যেন আজ মূর্ত্তিমান সাধুরূপ ধারণ করিলেন। নামকীর্ত্তন

শ্রবণে উঁহার অশ্রু, কম্প ও নৃত্য যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কোথা হইতে একটী মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া বটবৃক্ষ নাচিতেছে।" এই কথা যতই রাষ্ট্র হইতে লাগিল, ততই গ্রাম হইতে লোক সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মহা হুলস্থূল ব্যাপার! কেহ কেহ স্নানে যাইতে যাইতে কাপড় গামছা হাতে করিয়াই কেহ কেহ বা স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই, কেহ কেহ বা কলসী কাঁখে করিয়াই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কেহ কেহ বা কার্য্যানুরোধে আসিতে না পারিয়া নিজ দুরাদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। গ্রামবাসী বহুলোক উৎকণ্ঠিতভাবে গাছতলার দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইতেছে, তাহাকেই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "হ্যাঁগা! যথার্থই কি গাছ নাচিতেছে? এখনও কি কীর্ত্তন হইতেছে? হারাধন কি করিতেছে? সেখানে অন্য কোন মুসলমান আছে কি?" সেও প্রফুল্লচিত্তে যথাযথ ঘটনা বর্ণন করিতেছে। তখন গাছ নাচিতেছে শুনিয়া সকলে অতি দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল। বিরাট ব্যাপার! গাছতলায় যেন বাজার বসিল। এমনি অপূর্ব্ব নামের রোল উঠিল যে, গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলেই যেন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকর্ষিত হইতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য। গাছতলায় তিলার্দ্ধ স্থান নাই। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনমণ্ডলী হইতে বৃক্ষের মূলদেশস্থিত একটী সন্ধিস্থলে যাইয়া দাঁড়াইলেন। স্থানটী এরূপ মনোরম যে, উহাকে জীব-শক্তির অতীত ভগবন্নির্ম্মিত একটী গোফা বা শ্রীমন্দির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আন্দাজ চারিহাত পরিমিত উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃক্ষটীর দুইটি শাখা পূর্ব্ব দিগাভিমুখে গিয়াছে। মূলদেশ হইতে প্রায় আড়াই হাত দূরে ঐ দুইটী শাখা হইতে বড় বড় দুইটী শিকড় নামিয়া মৃত্তিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক সমভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাবাজী মহাশয় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যেমন ঐস্থানে দাঁড়াইলেন, অমনি হরি-ধ্বনি, উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়াগণ আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ধরিলেন। বৃক্ষরাজও যেন অতি হর্ষভরে অধিক পরিমাণে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সতৃষ্ণনয়নে একবার সেই বৃক্ষরাজকে আর একবার মূলদেশে দণ্ডায়মান মহাপুরুষকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইতেছে। কেহ বলিতেছে, বৃক্ষটী যেন মূর্ত্তিমান্ সাধুরূপে দুইটী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক এই মহাপুরুষকে কোলে লইয়া প্রেমানন্দে আত্মহারা ভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন।" এইরূপে বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় সদলবলে নাম করিতে করিতে গমনোদ্যত হইলে হারাধন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! আমার গতি কি হইবে? আমি আর ঘরে থাকিব না। কৃপা করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে রাখিতে হইবে। নতুবা আমার আর উপায় নাই।"

বাবাজী। দেখ বাবা! পরম দয়াল নিতাইচাঁদ তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। যদি তুমি এই বৃক্ষরাজের প্রতি আর কোনও অত্যাচার না কর, তবে তোমার আর ভয় নাই। আজ হইতে এই বৃক্ষটীর নাম **'কল্পতরু'** রহিল। ইঁহার নিকট ভক্তিপূর্ব্বক যে যাহা চাহিবে, ইঁহার কৃপা হইলে সে অনায়াসে তাহা পাইতে পারিবে। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও ইঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবে না।

হারাধন। আমি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি—আমি কেন, আমার বংশাবলী যে কেহ এই কল্পতরুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবে, তাহারই বংশ থাকিবে না।

বাবাজী। আমি তোমার কথায় বড়ই সুখী হইলাম। করুণাময় নিতাইচাঁদ তোমায় কৃপা করুন। আমি তোমাকে নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলি না। তবে কখনও কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না। কোনও

ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ বা হিংসা করিবে না। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ দিবে না এবং গোবধ করিবে না। যদি কখনও কাহারও কোন বিপদ হয়, তবে এই কল্পতরুমূলে দুগ্ধ গঙ্গাজল এবং ঘৃত-প্রদীপ দিলে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যাও, ঘরে থাক। আমি যতদিন এই গ্রামে থাকিব, ততদিন এই স্থানে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে।

এই বলিয়া হারাধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে অন্ততঃ দুইটী পুরুষ বা স্ত্রীলোক একত্রিত হইতেছে, সেই স্থানেই গাছ নাচার বিষয়ে সমালোচনা হইতে লাগিল। কেহ বলিতেছে, "বাবাজী কোন ভৌতিক মন্ত্র জানে, তাই ভূতে আসিয়া গাছ নাড়িতেছিল।" কেহ বলিতেছে, "তা নয় ভাই! ঐ গাছে অনেক বানর থাকে। উহারা কীর্ত্তনের শব্দ শুনিবামাত্র লাফ দিয়া চলিয়া যাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়িয়াছে।" আবার কেহ কেহ বলিতেছে "বোধ হয় ওদের মধ্যে কোন একজন গাছের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। সে ঐ কীর্ত্তি করে।" শুনিয়া অপর একজন বলিল, "এ নিতান্ত অসম্ভব কথা। আমরা এতলোক উপস্থিত ছিলাম। তাহা হইলে আমাদের কাহারও কি চোঁখে কিছু পড়িত না?" অপর একজন সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, আরে ও কথা ছেড়ে দাও। নাম করিলেই যদি গাছ নাচিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। লোকের মত লোক সেখানে কয়জন ছিল? আমার সাক্ষাতে দেখাতে পারে, তবে বুঝি; নতুবা ও সব বুজরুকি আমরা মানি না।" ইত্যাদি নানাপ্রকার সমালোচনা হইতে লাগিল। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

ক্রমে এই সব কথা বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ইঁহার চিরকালের স্বভাব এই যে, যদি কেহ ইঁহাকে শত সহস্র নিন্দা বা

গালাগালিও করে, তাহাতে ইনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হন না। কিন্তু সাধু, শাস্ত্র, গুরু, বৈষ্ণব, নাম বা শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির কিঞ্চিন্মাত্রে নিন্দা করিলেও ইনি যে কোন প্রকারেই হউক, নিন্দুক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আজ নামশক্তির অপলাপের কথাটা প্রাণে বড়ই বাজিল ; তাই উপস্থিত জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন, নাম সর্ব্বশক্তিমান্ ; সামান্য গাছ পাথর নাচান নামের পক্ষে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এ বিষয়ে কাহারও যদি সন্দেহ হয়, তবে কীর্ত্তনের সঙ্গে গেলেই তাঁহার সংশয় দূর হইবে।"

পরদিবস প্রাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সগণে যেমন নাম ধরিলেন, অমনি নামের ধ্বনি শুনিয়া অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সংকীর্ত্তনের দল ক্রমে নগর ভ্রমণপূর্ব্বক বেলা অনুমান সাড়ে নয়টার সময় যেমন কল্পতরুতলে উপস্থিত হইল, অমনি সংকীর্ত্তনের উপরিস্থিত শাখা পল্লবাদি পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনের তালে তালে নাচিতে লাগিল। সমালোচক ব্যক্তিগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও গাছ নাচিবার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন মহাশয়! কেহ যদি এই গাছের উপর চড়িয়া পরীক্ষা করিতে চায়, তবে তাহাতে কোন আপত্তি আছে কি?"

বাবাজী। আপত্তির কোনই কারণ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ না উঠিলেই ভাল হয়।

তখন দশ বার বৎসরের দুইটী ব্রাহ্মণবালককে গাছের উপর তুলিয়া দিয়া উহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল "গাছে কোন পক্ষী বানর বা অন্য কোন জন্তু আছে কিনা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখ।" বালক দুইটী তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল ;

কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, একমাত্র নামের শক্তি ব্যতীত কিছুতেই এরূপ হইতে পারে না। একজন বলিলেন, "নাম ত কত লোকেই করিয়া থাকে; কিন্তু কৈ এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ত আমরা কখনও দেখি নাই! আমার বিশ্বাস, ইহা নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের শক্তি। আরও দেখ, আমরা নাম করিয়া মুসলমানপাড়ার নিকট দিয়া পর্য্যন্ত যাইতে ভয় করি; কিন্তু হারাধন মণ্ডলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখলে ত! ঐ দেখ, আজও আবার সে দুটী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া নাম করিতে করিতে আসিতেছে।" দর্শকগণ সেই বৃক্ষরাজের নৃত্য, মহাপুরুষের প্রেমোন্মত্তভাব এবং হারাধন মণ্ডলের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তনের পর বেলা অনুমান বারটার সময় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন লইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং গ্রামবাসী সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপভাবে সাতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ কল্পতরুর তলে নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল এবং তরুবরও পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একদিন রাধিকা চক্রবর্ত্তী বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, অনেক অনেক বটবৃক্ষই ত আছে এবং তাহার তলে কীর্ত্তনও হইয়া থাকে; কিন্তু কৈ এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কথা ত আমরা আর কখনও শুনি নাই। এই গাছটীর বিশেষত্ব জানিবার জন্য আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে।"

বাবাজী। একটী মহাপুরুষ কোনও কারণে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন হইতে এইস্থানে বাস করিতেছেন। তিনি নামকীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমানন্দে ঐরূপ নৃত্য করিয়া থাকেন। যে উঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিবে, অচিরাৎ তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হইবে। এমন কি, কেহ

বিপদে পড়িয়া উঁহার মূলে ভক্তিপূর্ব্বক দুধ এবং গঙ্গাজল দিলে সে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবে।

রাধিকা। আচ্ছা, বৃক্ষের জ্ঞান বা দর্শন শ্রবণাদি শক্তি আছে কি?

বাবাজী। হ্যাঁ, আছে বৈকি। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের জ্ঞানচৈতন্য বা দর্শনশ্রবণাদি শক্তি না থাকিলে উহারা কিরূপে মৃত্তিকাদির রস আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়? আবার রসাভাবে মরিয়াই বা যায় কেন? শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বৃক্ষঃ পশ্যতি স্বাদয়তি চ।" আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ—কোনও একটী বৃক্ষ হইতে দশ পনের হাত দূরে যদি একটী লতা রোপিত হয়, তবে তাহার গতি বৃক্ষাভিমুখীই হইয়া থাকে। চেষ্টা করিয়াও উহার গতি অন্যদিকে ফিরাইতে পারা যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই উহাদের জীবনীশক্তি আছে। এই সকল অনুভব করিয়াই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ দন্তকাষ্ঠ, তুলসিপত্র, বিল্বশাখা, বিল্বপত্র গ্রহণকালে সেই সেই বৃক্ষের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার মন্ত্রাদি উপদেশ করিয়াছেন এবং নিষ্প্রয়োজনে কোন বৃক্ষের শাখাপল্লবাদি ছেদন করা পাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার যাহারা জঙ্গমদেহে ভগবৎ-নিয়মের ব্যতিক্রম বা ভগবজ্জনগণের মর্য্যাদালঙ্ঘনাদি-জনিত অপরাধে অপরাধী হইয়া স্থাবরদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহারা পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার বশতঃ সময়ে তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—নলকুবর ও মণিগ্রীব দুই ভাই নারদের অভিশাপে অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে এবং রাজা রন্তিদেব গুরু বশিষ্ঠ দেবের কোপে শাল-বৃক্ষরূপে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন।

রাধিকা। কি কি কারণে জঙ্গমদেহ পুনরায় স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, শুনিবার জন্য আমার বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বাবাজী। অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে আমি কয়েকটী মাত্র

বলিতেছি—ভগবৎশাস্ত্র, শ্রীগুরুদেব, ব্রাহ্মণ, সাধু, বৈষ্ণব, শ্রীমূর্ত্তি, নাম, মহাপ্রসাদ, নির্ম্মাল্য, চরণামৃত, চরণতুলসী, অতিথি এবং আরত্রিকাদি উপস্থিত দেখিয়া অভ্যুত্থান, অভিবন্দন, প্রণাম, অভ্যর্থনা ও অনুগমন না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে বৃক্ষত্ব, উপবেশন করিয়া থাকিলে পাষাণত্ব এবং শয়ন করিয়া থাকিলে অজাগরত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আমরা অজ্ঞজীব ; কে কোন্ দেহ হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিব না বলিয়া অবিচারে সকলকেই ভক্তির চোখে দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

শুনিয়া রাধিকা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। এইরূপভাবে পনের ষোল দিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দে ও নানারূপ উপদেশামৃত সিঞ্চনে গ্রামবাসী আপামর সাধারণের হৃদয় পরিপ্লুত করিতে লাগিল।

শান্তিপুরগমন ও বাবলায় সংকীর্ত্তন।

একদিন প্রভাত সময়ে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সদলে প্রভাতী সুরে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম ধরিয়া গমনোদ্যত হইলে গ্রামবাসী বহুলোক আসিয়া আরও কয়েকদিন দিগ্নগরে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইনি বিনয়বাক্যে সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ-পূর্ব্বক শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে বেলা অনুমান নয়টার সময় শান্তিপুরের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আরাধনাস্থল '**বাবলা**' নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র অদ্বৈত প্রভুর উপাসনার কথা যেমন স্মৃতিপথে উদয় হইল, অমনি বাবাজী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হঠাৎ ইঁহার এইরূপ অবস্থাদর্শনে সঙ্গিগণ

সকলেই নিতান্ত ব্যাকুলভাবে ইঁহাকে ঘিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক নামের আঁখর দিতে লাগিলেন :—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। (ভজ জীব অবিরাম) (গদাই শ্রীবাস প্রাণারাম) (শ্রীঅদ্বৈত গুণধাম) (গৌর আনা ঠাকুর আমার) বলিতে বলিতে একলম্ফে দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিলেন :—

জয় জয় অদ্ভুত, সো পঁহু অদ্বৈত,
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পঁহু মনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে,
আইলা নাগররাজ।
তাঁহার পীরিতে, আইলা তুরিতে,
উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি॥

(সীতানাথের জয় দেও ভাই) (পরম দয়াল পতিতপাবন) (নিতাইগৌর-আনা ঠাকুর) ইত্যাদি।

উপস্থিত জনসমূহ ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। অশ্রু কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন বাবাজী মহাশয়ের দেহ অধিকার করিল। এক একবার নামের ধ্বনিতে এবং প্রেমহুঙ্কারে বোধ হইতে লাগিল, আবার বুঝি শান্তিপুর-পুরন্দর অদ্বৈতচন্দ্র প্রকট হইলেন—আবার বুঝি জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া সীতানাথের প্রাণ কাঁদিল—আবার বুঝি সেই সুখময় দিন উপস্থিত হইল—আবার বুঝি সীতানাথের আকর্ষণে নিতাইগৌর সর্ব্বনয়নগোচর হইলেন। কারণ প্রেমময়ের শুভাগমন ব্যতীত এত প্রেম কোথা হইতে আসিবে? বালকবৃদ্ধ পুরুষনারী সকলেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আনন্দময় নিতাইগৌরের কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন জীবের এরূপ আনন্দলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এইরূপভাবে বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া প্রেম-পুলকিত অঙ্গে রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। একটী জটাধারী সাধু সে স্থানের সেবাইত ছিলেন। তিনিই ইঁহাদের সেদিনকার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইঁহারা যথাসময়ে প্রসাদাদি পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

—:০:—

সুন্দরানন্দ দাসের সহিত মিলন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জটাজুটধারী, বিভূতিভূষিত, গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘকায়, গৈরিকবসনধারী একটী সন্ন্যাসী আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্ লোক বাঙ্গালী হ্যায়?"

বাবাজী। হ্যা মহারাজ! আমরা বাঙ্গালী।

সাধু। আপ্ হিন্দী ভাষা নেহি সমুঝ্তে হ্যায়?

বাবাজী। আজ্ঞে না, আমি বাঙ্গালা ছাড়া আর কোন ভাষাই জানি না।

তখন সাধু বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন,—

সাধু। আপনারা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ?

বাবাজী। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মতাবলম্বী।

সাধু। চৈতন্যদেব ত গৈরিকবসনধারী, শিখাসূত্র-মালা-তিলকাদি চিহ্নরহিত, ভারতী-সম্প্রদায়ভুক্ত দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া আপনারা মালা, তিলক, শিখা এবং শুভ্র বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কেন ?

বাবাজী। তিনি পূর্ণপূর্ণতম। তাঁহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের ধর্ম্ম ; আচরণের অনুকরণ করা অনুচিত। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ।" মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, "আমি যাহা করি, তাহা করিও না ; যাহা বলি, তাহাই আচরণ কর।" যদি কেহ ঈশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতে পারেন, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু, আগে পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, প্রভৃতি অসুর বধ, কালীয়-দমন, এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তবে রাসবিহারী হইতে হইবে। যদি কেহ মহাপ্রভুর অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগে জগাই-মাধাই, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির উদ্ধার, কাজিদলন, মহাপ্রকাশ, ষড়্ভুজ দর্শনাদি আচরণ করিয়া পরে মালা-তিলক-শিখা-সূত্রত্যাগ, গৈরিকবসন ধারণ করিলেও বরং শোভা পাইতে পারে। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" অন্ততঃ মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যটী

পালন করিয়াও যদি কেহ তাঁহার অনুকরণ করেন, তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। অতএব আমরা যখন জগাই-মাধাই উদ্ধার বা তৃণাদপি প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ নহি, তখন তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামী শুভ্রবস্ত্র, মালা-তিলক ও শিখা ধারণ, মস্তকমুণ্ডন, সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানকে অর্পণপূর্ব্বক গ্রহণ, অনিবেদিত বস্তু, স্ত্রীসঙ্গ, তৎসঙ্গীসঙ্গ, আমিষ ও পরচর্চ্চাদি বর্জ্জন প্রভৃতি যাহা বিধান করিয়াছেন, মহাপ্রভুর মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণের সেই বিধানমতে চলাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সাধু। আচ্ছা, কলিযুগে যখন একমাত্র কল্কি অবতার ভিন্ন অন্য কোন অবতারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ নাই, তখন চৈতন্যদেবকে আপনারা অবতার বলেন কিরূপে? আবার "গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ।" এই প্রমাণেও চৈতন্যদেবকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়াই পাওয়া যায়। আপনারা তাঁহাকে ভক্তি করুন, আপত্তি নাই; কিন্তু ভগবান্ বলিবার দরকার কি?

বাবাজী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অবতার মধ্যে গণনীয় নহেন, একথা আমরাও স্বীকার করি। তিনি স্বেচ্ছাময়, লীলাবিগ্রহ, পূর্ণপূর্ণতম; অতএব অবতারী। যখন লীলা করিবার অভিলাষ জন্মে, তখনই স্বয়ং ভগবান্ লীলার উপযোগী নিজ নিত্যপরিকরগণ সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন:—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য অবতারবিষয়ক; কারণ অসুরসংহার, ধর্ম্মসংস্থাপন

এবং অধর্ম্মবিনাশাদি কার্য্যের জন্য স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হইবার কোনই আবশ্যকতা নাই। যেহেতু তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন ঃ—

যুগ প্রবর্ত্তন হয় অংশকলা হইতে।
আমা বিনু কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

অতএব বুঝা যাইতেছে, স্বয়ং রূপের আবির্ভাবের প্রতি কোন শাস্ত্র-প্রমাণ কারণ হইতে পারে না। স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ভগবান্ কলিহত অধর্ম্মপরায়ণ আপামর সাধারণ জীবগণকে নিজ প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করিবার মানসে বিশুদ্ধ আশ্রয়জাতীয় ভাবকান্তি অঙ্গিকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই শাস্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কলিতে প্রছন্ন অবতার বলিয়াছেন।

সাধু। আচ্ছা, গৌরাঙ্গদেব যে পূর্ণপূর্ণতম ভগবান্, ইহার প্রমাণ কি?

বাবাজী। প্রথম প্রমাণ—স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেম-বিতরণ করিবার অধিকার নাই। শাস্ত্রে বলিয়াছেন ঃ—

সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলময় বহু বহু অবতার থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যকেহ লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমবিতরণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয় প্রমাণ—অবিচারে বিতরণ; অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদির অগোচর, সাধনদ্বারা দুষ্প্রাপ্য অমূল্য নিধি ব্রজপ্রেমধন পাপী তাপী ঘোর অপরাধী জীবগণের পাপ তাপ ও অপরাধের বিচার না করিয়া আচণ্ডাল বালকবৃদ্ধ পুরুষনারী এমন কি, ম্লেচ্ছ যবনাদিকে পর্য্যন্ত অযাচিতভাবে বিতরণ করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না যেমন প্রাকৃত রাজ্যের কোন রাজা বা রাজপরিবারের কেহ কারাগার দর্শনে গিয়া কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের শাস্তিভোগের কালাকাল বিচার না করিয়া সকলকেই

মুক্তি প্রদান করিতে পারেন; অন্য কোন কর্ম্মচারীর এরূপ কার্য্য করিবার সামর্থ নাই, সেইরূপ স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত কোন অবতারাদি ভগবন্নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কাহাকেও ব্রজপ্রেম বিতরণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণপূর্ণতম ভগবান্।

সাধু। আচ্ছা, এ সব ত যুক্তির কথা। এ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্র-প্রমাণ আছে কি?

বাবাজী। আছে বৈ কি। এরূপ ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্রাদি নাই, যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তা প্রতিপন্ন না হইয়াছে। আমি আপনাকে কত বলিব? তবে কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি:—

বিশ্বসারতন্ত্রে উত্তরখণ্ডে একাদশ পটলে:—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি॥
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে:—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুম্।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

অনন্তসংহিতায়:—

বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা।
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে॥
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ম্।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা॥
ললিতাদ্যাশ্চ যাঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা।

নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা॥
য এব রাধিকা কৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।
যচ্চ বৃন্দাবনং দেবী নবদ্বীপঞ্চ তৎশুভম্॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তথৈব রাধিকা কৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি॥
মচ্ছূলপাতনির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

এইরূপ বহু বহু শাস্ত্র-প্রমাণাদি দ্বারা বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ণপূর্ণতমত্ব প্রতিপন্ন করিলে সাধু অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমি ধন্য হইলাম। আমার বহুদিনের সন্দেহ দূর হইল যদি আপনার কষ্ট না হয়, তবে আর দুই একটি মনের সন্দেহ জানাইতে ইচ্ছা করি।"

বাবাজী। ভাই! তোমার প্রশ্নে আমি পরমানন্দ লাভ করিতেছি তুমি নিঃসঙ্কোচে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার।

সাধু। আচ্ছা, শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয় জগতের জীবগণকেও সেই হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন। তবে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিতাই গৌরের নাম কীর্ত্তন করেন কেন? ইহাতে কি তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘন জনিত অপরাধ হইবে না?

বাবাজী। অতি সুন্দর কথা। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের আদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

অর্থাৎ—

উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহি আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হইয়া হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হইয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

আমরা কলিহত জীব; আমাদের পক্ষে ঐরূপভাবে মহাপ্রভুর আদেশ পালনপূর্ব্বক হরিনাম করা নিতান্ত অসম্ভব। তাহাতে আবার অপরাধ থাকিতে হরিনামের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। আমরা মায়ামুগ্ধ পাপাচ্ছন্ন দুর্ব্বল জীব। আমাদের পক্ষে নিরপরাধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে
সেই কৃষ্ণনাম জীব লয় বহুবার।
তথাপি না হয় প্রেম পুলকাশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
নিতাইগৌরাঙ্গে নাহি সে সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥

প্রেমই জীবের একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু। যখন একবার নিতাই গৌরাঙ্গের নাম লইলে অবিচারে প্রেমধন লাভ হয়, তখন নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক তৃণাদপি প্রভৃতি সাধন করতঃ বহু প্রয়াসসাধ্য হরিনাম সংকীর্ত্তন অপেক্ষা আমার মতে নিতাই গৌরাঙ্গ নাম কীর্ত্তন করাই কলির জীবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আরও দেখুন, কেহ যদি আমাদিগকে যৎসামান্য অর্থাদিও দান করে, তবে আমরা চিরজীবন তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকি। এমন কি, সংবাদপত্রাদিতে নানারূপ প্রশংসাবাক্য দ্বারা জনসাধারণের নিকট দাতার নামকীর্ত্তন করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি চির-অনর্পিত, শিবব্রহ্মাদির অগোচর, সাধনাদির দুষ্প্রাপ্য, শ্রীমতী রাধিকার নিজসম্পত্তি অমূল্য নিধি প্রেমধন অবিচারে জনসাধারণকে বিতরণ করিবার মানসে শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গিকার করতঃ অযাচিতভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিরূপভাবে কতদূর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমার মতে জীবের যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, তবে দিবানিশি নিতাই গৌরাঙ্গের নাম করাই উচিত।

সাধু। আচ্ছা, গৌরাঙ্গ নামই না হয় করিলেন; নিতাইএর নাম করিবার দরকার কি?

বাবাজী। এইটী হইতেছে বিষয়-আশ্রয়-তত্ত্ব। যেমন—"কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র," সেইরূপ—"গৌরাঙ্গ পাইতে যদি থাকে অভিলাষ। একান্ত ভাবেতে হও নিত্যানন্দ দাস॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজমুখে বলিয়াছেন;—

জনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যে লয় নিতাইএর নাম।
আমি বিকাই তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥

মুখেও যেজন বলে মুই নিত্যানন্দ দাস।
নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ প্রকাশ ॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥

তবেই বুঝা গেল, শ্রীগৌরাঙ্গকে পাইতে হইলে নিতাইএর চরণাশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন।

সাধু। বেশ কথা। তবে নিতাইএর নাম বা তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেই যখন গৌরাঙ্গ পাওয়া যায়, তখন আবার গৌরাঙ্গের নাম করবার আবশ্যকতা কি ?

বাবাজী। নিতাইএর চরণাশ্রয় করিতে হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গ নাম করা চাই। তিনিই নিজ মুখে বলিয়াছেন ;—

"দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ বলে একবার।
সে জন আমার হয় আমি হই তার॥"

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ ॥" ইত্যাদি।

সুতরাং নিতাইগৌরাঙ্গ পাইতে হইলে, গৌরাঙ্গনিতাই নাম করা দরকার। তাই মহাপ্রভুর মতাবলম্বিগণ সর্ব্বাগ্রে নিতাইগৌরাঙ্গের নাম করিয়া থাকেন।

এইরূপভাবে বহুক্ষণ সাধুর সহিত নানাপ্রকার তত্ত্ব-আলোচনা হইতে লাগিল। তথায় শান্তিপুরনিবাসী প্রভুসন্তান এবং অন্যান্য ভক্তগণ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বাবাজী মহাশয়ের মুখে অতি সরলভাষায় নিতাইগৌরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। সাধুটী অতি

ব্যাকুলভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমি এত কাল অভিমানে মত্ত হইয়া কপট বেশে লোক ভাঁড়াইয়াছি। আজ আপনার কৃপায় আমার নবজীবন লাভ হইল—বৃথা গর্ব্ব চূর্ণ হইল—জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল—চিত্তের সকল সংশয় দূরে গেল। এতদিনে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের ঘরের ঠাকুর পরমদয়াল প্রেমদাতা নিতাইগৌরকে ভুলিয়া মনুষ্যজীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি। আর না, এইবার আপনি আমাকে কৃপা করুন। আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। যে উপায়ে আমার চিত্ত স্থির হইয়া নিতাইগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আসক্ত হইতে পারে, আপনি তাহার বিধান করুন।"

বাবাজী মহাশয় প্রেমার্দ্রহৃদয়ে সাধুকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভাব-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! ধন্য কলিযুগ। চিন্তা কি? প্রভু আমার অদোষ-দরশী। তিনি পাপী তাপী অপরাধী বাছেন না। ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাক। শান্তিময় শান্তিবিধান করিবেন।"

এইরূপভাবে নানা কথোপকথন হইতেছিল, এই সময়ে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে সকলেই ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া আরতি কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। সাধুটী সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন। ইঁহার নাম সুন্দরানন্দ। ইনি বাঙ্গালী। পূর্ব্বোক্ত সেবাইত। বাবাজী মহাশয় রাত্রে প্রসাদ পাইবার জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও ইঁহারা শেষ বেলায় প্রসাদ পাওয়ার দরুণ সে রাত্রিতে আর কিছু আহার করিলেন না। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে সেস্থান হইতে রওনা হইলেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সুন্দরানন্দ মুণ্ডিতমস্তকে আর্দ্রবসনে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"গুরুদেব! এইবার কৃপা করিয়া মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক আমার উদ্ধার সাধনকরুন। এতদিন আমি সাধু সাজিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু কাহারও নিকট দীক্ষিত হই নাই এবং দীক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করি নাই। আজ আপনার কৃপায় আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল। বুঝিতে পারিলাম যে, অদীক্ষিত জীবন পশুজীবন তুল্য। অতএব আপনি কৃপা করিয়া দীক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক আমার পশুত্ব মোচন করুন।" বাবাজী মহাশয় সাধুর অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া দৃঢ়ালিঙ্গনপূর্ব্বক উহার কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলেন। সঙ্গিগণ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শন।

কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় সদলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গুপ্তিপাড়ার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ঘাটের মাঝি দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে বলিল, "প্রভো! যদি ওপার যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে অধমের নৌকায় আসুন।"

বাবাজী। বাবা! আমাদের ত পয়সা নাই।

মাঝি। আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্ব্বাদ আছে ত? অধমের প্রতি একটু কৃপা থাকলেই কত পয়সা মিলিবে।

তখন সকলেই আনন্দিতমনে তাহার নৌকায় চড়িলেন। গুপ্তি-পাড়ার ঘাটে পৌঁছিয়া মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, আপনারা কি বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ী যাইবেন?"

বাবাজী। হ্যাঁ বাবা! বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শনের জন্য মনে বড়ই অভিলাষ জন্মিয়াছে।

মাঝি। বৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ী নৌকায় যাইতেই সুবিধা। চলুন, আমি লইয়া যাইতেছি।

বাবাজী। বাবা! তোমার কষ্ট হইবে। থাক্, আমরা হাঁটিয়াই যাইতেছি।

মাঝি। আজ্ঞে, চিরদিনই ত পয়সার জন্য খাটিলাম! আজ না হয় একটু পরমার্থের জন্যই খাটি।

এই বলিয়া মাঝি বৃন্দাবনচন্দ্রের খালের মধ্যে নৌকা নিয়া ইঁহাদিগকে একেবারে ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিল। বাবাজী মহাশয় সগণে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র দর্শনে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভাবগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন ;—

শ্রীরাধারমণ, রমণী মনোমোহন,
বৃন্দাবন বনদেবা।
অভিনব রাস, রসিকবর নাগর,
নাগরীগণ কৃতসেবা॥
ব্রজপতি দম্পতী, হৃদয় আনন্দন
নন্দন নবঘন-শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,
রামানুজ গুণধাম॥
শ্রীদাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর,
চন্দ্রক চারু অবতংস।
গোবর্দ্ধনধর, ধরণী সুধাকর,
মুখরিত মোহন বংশ॥

কালীয় দমন, গমন জিতি কুঞ্জর,
কুঞ্জ-রচিত-রতিরঙ্গ।
গোবিন্দ দাস, হৃদয় মণিমন্দিরে,
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥

মধুর মধুর, রূপ মনোহর,
নাগরী নাগররাজ।
মধুর মধুর. বদন সুন্দর,
মধুর মধুর সাজ॥
নব নটবর, শ্যামল সুন্দর,
নটিনী রঙ্গিণী রাধা।
নব জলধরে, জনু সৌদামিনী,
নয়নে নয়নে বাঁধা॥
সুরঙ্গ অধরে, মোহন মুরলী,
রাধে রাধে বলি বাজে।
রাইর অধরে, মৃদু মৃদু হাসি,
কিবা সুমধুর মাঝে॥
শ্যাম-গলে দোলে, বনফুল হার,
রাই-গলে গজমতি।
আধ বরণ, কষিত কাঞ্চন,
আধ নীলমণি জ্যোতি॥
শ্যাম-শিরে শোভে, ময়ূর মুকুট,
রাই-শিরে দোলে বেণী।
রসের হিল্লোলে, সুমধুর দোলে,
শিখি-কোরে জনু ফণী॥

শ্যাম-কটিতটে, সুপীত বসন,
রাই নীলাম্বরী সাজে।
রাতুল চরণে, সোনার নূপুর,
রুনুর ঝুনুর বাজে॥
শ্যাম-করে শোহে, কনক বলয়া,
রাই করে নীলচুড়ী।
ভ্রমরা ভ্রমরী, গায় শুকসারী,
নাচে ময়ুরা ময়ুরী॥
ললিতা বিশাখা, চিত্রা ইন্দুরেখা,
চম্পকলতিকা ধনী।
সুদেবী শ্রীরূপ, মঞ্জরী অনুপ,
সেবয়ে সময় জানি॥
রঙ্গদেবী আর, তুঙ্গবিদ্যাসার,
শ্রীরতি সঙ্গিনী সনে।
সেবে মনোরঙ্গে, ললিত ত্রিভঙ্গে,
পরম আনন্দ মনে॥

সঙ্গিগণ সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোকুল বাবু অনুরাগের বলে ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসমা স্ত্রী প্রভৃতি অকাতরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিতাইগতপ্রাণ হইয়া সেই হইতে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। উঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ উঁহাকে গৃহে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা কিছু দিনের জন্য বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এদিকে বৃন্দাবনচন্দ্রের পূজারী প্রসাদী মালা আনিয়া বাবাজী

মহাশয়ের গলায় দিবামাত্র কীর্ত্তনানন্দের স্রোত এতই প্রবল বেগ ধারণ করিল যে, একবার আসিয়া যে নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সেই স্রোতে ভাসিয়া গিয়া প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। উপস্থিত সেবাইতগণ আনন্দে মাতোয়ারা। কিছুকাল পরে কীর্ত্তন সমাপ্তি হইলে সকলে রঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া উপবেশন করিলেন। সেবাইতগণ ইঁহাদিগকে বৃন্দাবনচন্দ্রের মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য অনুরোধ করিলে ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদি শেষ করিয়া প্রেমানন্দভরে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। বেলা আন্দাজ চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় সাতগাছিয়া যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেও বহুলোকের অনুরোধে অন্ততঃ একরাত্র গুপ্তিপাড়ায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে নানাভাবের লোক আসিয়া অনেক প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একটী ভক্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, মায়ামোহাচ্ছন্ন দুঃখময় সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভগবান্‌কে পাওয়া যাইতে পারে ?"

বাবাজী। বাবা ! সংসারটী কেবল দুঃখময় নহে ; সুখদুঃখ দুইয়েরই আবাসস্থান। ব্যবহারদোষে সময়ে সুখও দুঃখরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

ভক্ত। আজ্ঞে, সংসারী লোক যাহাকে সুখ বলে, উহা ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর। উহাকে সুখ না বলিয়া দুঃখ বলিলেও হয়। প্রকৃতপক্ষে সংসার দুঃখেরই আকর।

বাবাজী। বাবা! সংসার-আশ্রম শিক্ষার ক্ষেত্র। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই ত্রিবিধ আশ্রমের পালন ও পোষণহেতু শাস্ত্রকারগণ সংসার আশ্রমকে সকল আশ্রমের পিতৃমাতৃস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুমোদিত পন্থানুসারে সংসার করিতে পারিলে সংসার হইতে যত সহজে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যান্য আশ্রম হইতে সেরূপ হয় না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, মীরাবাই, কর্‌মাবাই প্রভৃতি কেহই ত সংসারত্যাগী

ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ প্রায় সকলেই সংসারী। তাঁহারা কি প্রভুকে প্রাপ্ত হন নাই? ব্রজগোপীগণ যেরূপ সংসারাশ্রমে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, শুকনারদাদি এমন কে আছেন, যিনি সেইরূপ সংসারী হইবার অভিলাষ না করেন? তাই বলি, সংসারাশ্রমই যে ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায়, তাহা নহে। নিজ নিজ আচরণই ভগবৎ-প্রাপ্তির বাধক বা সাধক।

ভক্ত। আজ্ঞে, সংসারাশ্রমের বিধিবোধিত পন্থা কি?

বাবাজী। মাতৃপিতৃসেবা, অতিথিসৎকার, পরোপকার, সত্যপ্রতি-পালন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ইষ্টনিষ্ঠা, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-সেবা, নির্হেতুক দান, যথালাভে সন্তোষ, বিষয়ে অনাসক্তি, সুখে দুঃখে ভগবৎকৃপা অনুভব, ভগবদ্দাসদাসীজ্ঞানে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন প্রভৃতিকেই শাস্ত্রকারগণ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারী ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। তন্মধ্যে একভাগ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবার জন্য, দুইভাগ সংসারের যাবতীয় ব্যয়নির্ব্বাহ ও সঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং অবশিষ্টাংশ নিজের জন্য রাখিতে হইবে। কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, এই নিজাংশই সঞ্চয়ের নিমিত্ত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উহা কেবল তীর্থপর্য্যটন, পরোপকার বা নির্হেতুক দান প্রভৃতি নিজ পরমার্থের জন্য ব্যয় করা উচিত। কেবল অর্থ ই যে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, এমন নহে; ব্যবহারিক জগতের প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ জানিতে হইবে। অষ্ট প্রহর দিবারাত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দুইভাগ অর্থাৎ চারিপ্রহর সাংসারিক কার্য্যে, দুইপ্রহর সৎসঙ্গ, পরোপকার প্রভৃতিতে এবং অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ বাকী দুইপ্রহর নিজ পরমার্থ সাধনের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই ভগবন্নিয়মের ব্যতিক্রম

হেতু অপরাধ হয় ; কাজেই তাপ জন্মিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, আমাদের কি বিষম ভ্রম! আমরা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সংসারের নিমিত্ত অকাতরে খাটিতেছি ; বিন্দুমাত্রও অবকাশ বা ক্লান্তিবোধ নাই। তৎপর রাত্রের প্রথমার্দ্ধ, যাহা কিনা পরোপকারাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ঐ সময়টা আমরা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও খেলাধূলা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদে কাটাইয়া থাকি। একজনের গৃহদাহ হইয়া যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি গো মনুষ্যাদি পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেলেও এমন সময় নাই যে, তথায় যাইয়া কিঞ্চিৎ সাহায্য করি। কেহ অনুরোধ করিলেও হয়ত আমরা বিরক্তি সহকারে বলিয়া থাকি, "আমি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি ; এখন আমার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই।" কিন্তু ঐ সময়ে যদি কোন বন্ধু আসিয়া বলে, "চল ভাই! একটু বেড়াইয়া আসি" তবে অমনি ছড়িখানি হাতে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া থাকি। তদনন্তর রাত্রের শেষার্দ্ধ যাহা কিনা নিরুপদ্রবভাবে নিজ পরমার্থসাধনের জন্য ভগবৎকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, উহা আমরা চুরী, ডাকাতি, লাম্পট্য, ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি দ্বারা অপব্যয় করিতেছি। অন্য কোন সুযোগ না ঘটিলে অন্ততঃ নিদ্রাদ্বারা ঐ সময়টী কাটাইয়া দিতেছি। কারণ ঐটি আমাদের নিজস্ব ; উহার জন্য আপত্তি করিবার কেহ নাই। কি আশ্চর্য্য! বার ঘণ্টাকাল স্ত্রীপুত্রাদির জন্য অবিশ্রান্তভাবে খাটিলাম ; কিন্তু বিশ্রামের নিমিত্ত দশ মিনিট সময়ও তাহাদের নিকট পাইলাম না বা চাহিলাম না। কেহ একটু ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলে সময় নাই বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছি। এমন কি নিজের সন্ধ্যাহ্নিকের সময়টুকু পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট ভিক্ষা পাইলাম না। কিন্তু মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যসাধন বা পরমার্থের জন্য পরম কারুণিক ভগবানের চরণারবিন্দ চিন্তা করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়টী অযথা ব্যয় করিতে

বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আত্মসুখের জন্য পরের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিতেছি! নিজদেহপুষ্টির জন্য অপরের প্রাণ বিনাশ করিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। পুরুষদেহের অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় পররমণীর সতীত্বরত্ন অকাতরে লুণ্ঠন করিতে বা স্ত্রীদেহের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি-কামনায় যে কোনও উপায়ে হউক, নিষ্কিঞ্চন পরমযোগী মহাপুরুষের পরমার্থ-সম্পত্তি অপহরণ করিতে কুণ্ঠিতা হইতেছি না। এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সংসার দুঃখময় ভিন্ন সুখময় কিরূপে হইবে? বাবা! সুখ দুঃখ দুইটী বস্তু গৃহী উদাসী, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন, স্ত্রী-পুরুষ বা বালক-বৃদ্ধ বাছে না। সকলের উপরই উহার সমান অধিকার। সুখ দুঃখ মানসিক বৃত্তি। গৃহি বা উদাসী, যে আশ্রমীই হউন না কেন, আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিলেই সুখ তাহার করতলগত। চিরদরিদ্র সুদামা বিপ্র, বিদুর, খোলাবেচা শ্রীধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির সুখশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বই হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই! আর রাবণ, দুর্য্যোধন, কংস, শিশুপাল প্রভৃতির সুখ ক্ষণস্থায়ী। ফল কথা—"আমি ভগবানের নাচের পুতুল—ক্রীতদাস। তাঁহার আজ্ঞাপালনের জন্য সংসারে আসিয়াছি, আজ্ঞাপালন করিয়া যাইব। ফলাফলের ভাগী তিনি।" এইরূপ মনে করিয়া অনাসক্তভাবে সংসার করিতে পারিলে সুখ বই দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ভাবের অনাসক্ত সংসারী ব্যক্তি "প্রাতঃকালে" ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব* শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর দীনবন্ধো।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।"

আবার শয়নের সময় নিজকৃত কর্ম্মের ফলাফল ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন—

*"শ্রীকান্তবিষ্ণোভবদাজ্ঞয়ৈব"—পাঠান্তর।

যানি কানি চ কর্ম্মাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি বৈ।
তানি তান্যেব সর্ব্বাণি তুভ্যমেব সমর্পয়ে ॥
ত্বদাস্মীতি তু বিজ্ঞায় মৎকৃতং যৎ শুভাশুভম্।
গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর ॥

অর্থাৎ হে প্রভো! আমি প্রাতঃকাল হইতে তোমার সন্তোষের নিমিত্ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলাম। আমার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত যে সকল ভালমন্দ কর্ম্ম, সে সকলই তোমাকে অর্পণ করিলাম। আমি যখন তোমার, তখন মৎকৃত কর্ম্মের ফলাফলের ভোক্তাও তুমি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

তখন ভক্তটী বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমরা নিতান্ত আত্মসুখ-পরায়ণ, মায়ামুগ্ধ কলির জীব। সাধন করিয়া এইরূপ অনাসক্ত ভাব প্রাপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। একমাত্র আপনাদের ন্যায় মহতের কৃপা ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। অতএব এই অধম দাসকে কৃপা করুন, যেন কোনও জন্মে এইরূপ অনাসক্তভাবে সংসার করিতে পারি।" বাবাজী মহাশয় কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তটীকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে বৃন্দাবনচন্দ্রের আরতি আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ খোল করতাল যোগে আরতি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহু লোকসমাগম হইতে লাগিল। ক্রমে রূপাভিসার ও মিলন কীর্ত্তনান্তে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর! উপস্থিত ভক্তগণ যেন এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব আনন্দ-রসে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সেখানেই বিশ্রাম করিলেন।

সাতগাছিয়ায় শারদীয়া দুর্গাপূজা।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে বাবাজী মহাশয় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিয়া সদলে সাতগাছিয়া অভিমুখে রওনা হইলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামীপ্রভু সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সেই অভিনব কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে এবং মনোমুগ্ধকর সুমধুর নৃত্যদর্শনে আনন্দে বিভোর হইল। ক্রমে ইঁহারা সাতগাছিয়া শ্রীমদনগোপাল জিউর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে প্রেমানন্দে বিভোরভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমদনগোপাল জিউর সেবাইতগণ বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শ্রীমদনগোপাল জিউ অনেক সরিকের ঠাকুর। সেদিন শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী গোস্বামীপ্রভুর সেবার পালা। নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। আজ শ্রীমদনগোপাল জিউর বাড়ীতে অভিনব আনন্দ-উৎসব। একদিকে কীর্ত্তনানন্দ, অপর দিকে ভোগরাগের বিরাট অয়োজন। গ্রামবাসী সকলেই যেন আনন্দে মাতোয়ারা। তরীতরকারী, শাকসব্‌জি বা ফলমূল যে যাহা পাইতেছে, শ্রীমদন গোপাল জিউর বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী অনেক ভদ্রলোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীপাদ বিপিনবিহারী গোস্বামীপ্রভু আসিয়া বলিলেন, "বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। শ্রীমদনগোপাল জিউর ভোগরাগও হইয়া গিয়াছে। চলুন, এখন স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ

করা যাউক।” শুনিয়া বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ পরমানন্দে স্নানাদি করতঃ মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। ইনি যে কয়েকদিন সাতগাছিয়া গ্রামে ছিলেন, প্রত্যহই এইরূপ মহামহোৎসব ব্যাপার চলিতে লাগিল। গ্রামবাসী লোকের উৎসাহ যেন ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী গোস্বামীপ্রভু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, “আজ্ঞে, আপনি এখানে আসার দরুণ শ্রীমদনগোপাল জিউ নানাবিধ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিতেছেন। অতএব আর কিছুদিন এখানে থাকিয়া আমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সুখবর্দ্ধন করুন।”

বাবাজী। দেখ কুঞ্জ! সুখময় ভগবান্ই একমাত্র জীবের সুখদাতা। তিনি জীবের সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। জীব তাঁহাকে না ভজিলেও তিনি সর্ব্বদা জীবকে ভজিয়া থাকেন। আর অনন্যভাবে ভজিলে তাহার ত কথাই নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া। তারে ভিক্ষা দেই মুক্তি মাথায় বহিয়া॥” হায়! আমরা ত তাঁহাকে ভজি না, তবু তাঁহার এত দয়া! ভজিলে না জানি কিই বা হইত? নিতাইচাঁদ যে কত দয়াল একমুখে বলিয়া শেষ হয় না। ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যালাপ হইতে লাগিল। শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী গোস্বামীপ্রভু বলিলেন, “বাবা! বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে। শ্রীমদনগোপাল জিউর ভোগও লাগিয়াছে। এইবার স্নানাদি করুন।” শুনিয়া সকলেই গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে তিলক আহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

আজ শারদীয়া দুর্গাপূজার অধিবাস। গ্রামবাসী আপামর সাধারণ লোকসকল এক অভিনব আনন্দে মাতোয়ারা। সাতগাছিয়া গ্রামের একটী প্রচলিত প্রথা এই যে, ব্রাহ্মণেতর জাতির বাড়ীতে পূজোপলক্ষে বলি হয় না। বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে কুঞ্জবিহারী গোস্বামীকে

বলিলেন, "দেখ কুঞ্জ। কাল আমাদিগকে মা যোগমায়া দেবীর পূজা দর্শন করাইতে হইবে।" কুঞ্জবিহারী গোস্বামী বিনীতভাবে বলিলেন, "যে আজ্ঞে, তবে সকালে স্নানাদি করিয়া বাহির হইলেই ভাল হয়। কারণ ফিরিয়া আসিতে অনেক দেরী হইবে।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইলে মদনগোপাল জিউর সন্ধ্যা-আরতির উদ্যোগ হইতে লাগিল। আজ মদনগোপাল জিউর বাড়ী বহুজনতা-পরিপূর্ণ। আরতি-অন্তে বাবাজী মহাশয় সদলবলে আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন শেষ করতঃ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলের অনুরোধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগন সহ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। ইঁহার একটী স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, কোনও স্থানে যাইতে হইলেই নাম ধরিয়া যাওয়া চাই। স্নানান্তে গঙ্গার ঘাট হইতেই যোগমায়া দেবীর দর্শন মানসে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। গৌরী শঙ্কর সীতা রাম।" এই নাম ধরিয়া একটী বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় সপরিকরে মা দশভুজার দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে প্রেম-গদ-গদকণ্ঠে গান ধরিলেন —

যোগমায়া যোগেশ্বরী জগৎপালিকা।
জগবাসী জীব তব বালকবালিকা॥
ভকতিদায়িনী মাগো ভবানী শঙ্করী।
সন্তানে ভকতি দেগো করুণা বিতরি॥
বিশুদ্ধ ভকতি প্রেম জীবে বুঝাইতে।
যোগমায়া রূপে অবতীর্ণা অবনীতে॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলা করিবারে।
পৌর্ণমাসীরূপে থাকি বরজ নগরে॥
গোপীসহ গোপীনাথে পরকীয় ভাবে।
লীলা করাইলে তুমি আপন প্রভাবে॥
কাত্যায়নীরূপে পূজি তোমার চরণ।
গোপীগণ পাইলেন শ্রীনন্দনন্দন॥
তব কৃপা বিনে হেন কাহার শকতি।
লভিতে পারয়ে ব্রজের বিশুদ্ধা ভকতি॥
তাই কর যুড়ি মাগো করি এ প্রার্থনা।
কৃষ্ণভক্তি বিনা যেন না করি কামনা॥
গোপীকার আনুগত্যে গোপীদেহ পেয়ে।
ভজিব রাধিকানাথে ব্রজে জনমিয়ে॥
অনঙ্গানন্দদাকুঞ্জে ললিতার যূথে।
শ্রীরাধারমণ সেবি রাধিকা সহিতে॥
এই সে প্রার্থনা মাগো তোমার চরণে।
পূর্ণ কর পৌর্ণমাসী নিজ দয়াগুণে॥

এইরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন, আর অশ্রুধারায় ইঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে কম্প, ক্ষণে ক্ষণে পুলক, ক্ষণে ক্ষণে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব প্রাণমাতান কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে সেই প্রেমবিহ্বলভাবে নৃত্য করিতেছে। ছোটবড়, লঘুগুরু ভেদ নাই। জাতি, কুল ও বিদ্যাভিমানী অনেক ব্রাহ্মণগণ চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কীর্ত্তনস্থলে গড়াগড়ি দিতেছেন।

বহুক্ষণ এইরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়া বাবাজী মহাশয় "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি যোগমায়ে নমোঽস্তুতে॥" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অন্যত্র চলিলেন। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক বাড়ীতে যোগমায়ার দর্শন, প্রণামবন্দনা, কীর্ত্তন ও স্তবস্তুতি করিয়া বেলা আন্দাজ বারটার সময় শ্রীমদনগোপাল জিউর বাড়ীতে আসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। যথাসময়ে পূর্ব্ববৎ আরতি কীর্ত্তনাদিতে সে রাত্রি পরমানন্দে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মায়ের দর্শনে বাহির হইলেন।

আজ মহাষ্টমী। ব্রাহ্মণপাড়ায় মহাধূমধাম। বলির উপর বলি—রক্তারক্তি ব্যাপার। শুনিয়া বাবাজী মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। "উঃ কি ভীষণ ব্যাপার। কি নিষ্ঠুরতা!" বলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা নিতাই! কতদিনে ইহাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে? হায় হায়! মায়ের সম্মুখে এত অত্যাচার! এত নৃশংসতা!! মা যে কিরূপে এই হত্যাকাণ্ড সহ্য করেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিংসাবৃত্তির প্রবর্ত্তকগণ একবার ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কি ভয়ানক হিংসাবৃত্তি—কি ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড বংশপরম্পরায় প্রচলিত করিয়া আসিতেছেন!

তখন গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয়! সম্প্রতি আপনার অবস্থা দর্শনে আমার মনে হইতেছে যে, এই হিংসাটা বোধ হয় গুরুতর পাপের কার্য্য; কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে রীতির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন সেই রীতি পালন না করিলে অন্ততঃ লৌকিক জগতেও নিন্দনীয় হইতে হয়। আবার বেদতন্ত্রাদিতে বৈধী

হিংসার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। যথা,—"অশ্বমেধেন যজেত।" "বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত।" তন্ত্রে বলিয়াছেন, "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" ইত্যাদি। অন্যত্র বলিয়াছেন, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি, শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে আমাকে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। বাবা! বেদের দুইটী বিভাগ। একটী কর্ম্মকাণ্ড, অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড আবার প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গভেদে দুই প্রকার। "অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি প্রমাণ প্রবৃত্তিমার্গের, আর "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ, মা হিংসী সর্ব্বাভূতানি, অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ সর্ব্ববৈরত্যাগঃ" ইত্যাদি প্রমাণ নিবৃত্তিমার্গের। প্রবৃত্তিমার্গ সকাম ও স্বর্গাদিভোগসাধক। নির্দ্দিষ্ট কাল ভোগাবসানে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি। নিবৃত্তিমার্গ নিষ্কাম, মুক্তি ও ভক্তিপথের সাধক এবং অখণ্ড, অব্যয়, অবিনশ্বর সুখপ্রদ। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" (মহতোভয়াৎ কালভয়াৎ ইতি যাবৎ) শক্তি উপাসনাটী তন্ত্রোক্ত এবং আচারগত। আচার ত্রিবিধ। যথা পশ্বাচার, দিব্যাচার এবং বীরাচার।

পশ্বাচার যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥

দিব্যাচার যথা—

দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী॥

বীরাচার যথা—

বীরসাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ।
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর।

আমরা কলিহত জীব; স্বভাবতঃই দ্বেষহিংসা এবং পাপপ্রবৃত্তিরত। তাহাতে আবার যদি হিংসাকার্য্যে শাস্ত্রের অবলম্বন পাই, তবে আমাদের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। তাই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বীরাচার সম্বন্ধে পার্ব্বতী বলিয়াছেন,—

কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
লোভাৎ তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ॥
পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্দস্যবো বহবো ভুবি।
ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ পাপা যোনিবিচারণম্॥
অতিপানাদিদোষেণ রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ।
শক্তিহীনা বুদ্ধিহীনা ভূত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ॥
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ॥
কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ স্বজনৈরপি।
কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ॥
অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ।
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো।
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে॥

কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা।
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপ্তং পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে ॥
যুগধর্ম্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ ॥

তবেই ভাবিয়া দেখুন, প্রবৃত্তিমার্গোক্ত কৌলাচারমতে মহামায়ার উপাসনা করিতে গিয়া যদি পাপপ্রবৃত্তিই প্রবল হইল, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের অবনতি বই উন্নতিসাধন হইল কৈ? তাই ঐ তন্ত্রেরই উপসংহারে শঙ্করদেব বলিয়াছেন—

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥
যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেধাসক্তচেতসঃ।
প্রাপ্নুয়াস্তামুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥

তাই আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "যদি মনুষ্যজীবনের উন্নতিসাধন করিতে চাও, যদি পাপপথ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সৎপথে অগ্রসর করাইতে চাও, যদি দুর্জ্জয় কলির কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ভক্তিপথের পথিক হইতে চাও, তবে একমাত্র নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কর। সুতরাং মহামায়াকে পশ্বাচারে পূজা করাই ত আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।" শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "অতস্তাং কালিকাং ভদ্রাং পশুভাবেন পূজয়েৎ।"

গিরীশ। আজ্ঞে, এই যে প্রবৃত্তিমার্গের কথা আপনি বলিলেন, উহা হইতেই ত নিবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ ভোগাদির দ্বারাই জীবগণের ইন্দ্রিয়বৃত্তির হ্রাসতা আসিবে—বাসনানিবৃত্তি হইবে—লালসা বিনষ্ট হইবে এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে তাহারা পরম শান্তিময় নিবৃত্তিপথের পথিক হইবে।

বাবাজী। বাবা! কোটি কোটি যুগ উপভোগ করিলেও বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যাহা বিধান ছিল, তাহাতে ঋষিগণ বৃদ্ধ ও জরাতুর গো, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতি বধ করিয়া যগান্তে আবার তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করতঃ নবযৌবনসম্পন্ন করিয়া দিতেন। কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ সে সমস্ত পারিবেন না বলিয়া শাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন :—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অন্যান্য যুগে কেবল যজ্ঞার্থে পশুচ্ছেদ করা হইত। এখন সে যজ্ঞের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়যজ্ঞ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য নিরীহ পশুগণের জীবনবিনাশ করা হয়। কি বীভৎস ব্যাপার বলুন দেখি!

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃ খলঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, মা জগদম্বার সম্মুখে তাঁহার এই নিরীহ অবোধ সন্তানদিগকে এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে বধ করা হয় কেন? তিনি কি কেবল মানবেরই মাতা বা মানবেরই পালয়িত্রী? মানবই কি অশেষ

দোষে দোষী হইয়াও তাঁহার ক্ষমার পাত্র ? একমাত্র মানবের জন্যই কি তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণা ? হায় হায়! আমাদের কি ভয়ানক স্বার্থপরতা দেখুন দেখি! একজনের সন্তানাদি হয় না। সে মাকে মানস করিতেছে, "মা জগদম্বে! যদি আমার সন্তান হয়, তোমাকে উদয়াস্ত বলি প্রদান করিব।" কেহ বা একশত আটটী মহিষবলি, কেহ বা লক্ষ ছাগবলি মানস করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন না যে, জগদম্বা কেবল মানুষেরই মা নহেন। তিনি জগবাসী প্রাণিমাত্রেরই মা। আমি অতি নৃশংসভাবে যাহাদের প্রাণবধ করিতেছি, তাহারাও জগদম্বার সন্তান। একদিন আবার আমাকে এই কর্ম্মফলে ঐরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়া উহারই হাতে জীবন দিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন ;—

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্যখাদন্তি তে চ তান্॥

দেবীপুরাণেও কথিত আছে—সুরথ রাজা মা জগদম্বার পূজায় লক্ষ বলি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে দেখিলেন যে লক্ষ খড়্গাধারী পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া অতি বিকটভাবে উহার দিকে চাহিয়া আছে। তখন রাজা কম্পিতকলেবরে ভয়বিহ্বলভাবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেনই বা আমার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ?" পুরুষগণ বলিল, "আমাদের কথা তোমার মনে হইতেছে না কি? তুমি রাজ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নির্দ্দয়ভাবে মায়ের সম্মুখে যে লক্ষবলি দিয়াছিলে, আমরা সেই লক্ষপ্রাণী। তোমাকে লক্ষজন্ম পশুদেহ ধারণ করিতে হইবে। আমরা অগ্রপশ্চাৎক্রমে সেইরূপভাবে তোমাকে বধ করিব।" শুনিয়া সুরথ রাজার চোখে জল আসিল। তিনি কম্পিত কলেবরে শুষ্ককণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"হা প্রভো! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যাহা করিয়াছি, আমার সে অপরাধ

ক্ষমা করুন। আর যেন জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও এরূপ পাপাচরণ না করি।" এইরূপে বহু বহু স্তব করার পর ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন যে, তুমি অনেক দান পুণ্য এবং পরোপকার প্রভৃতি করিয়াছ, সেই সুকৃতির ফলে তোমাকে আর লক্ষজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। একজন্মেই এই লক্ষপ্রাণী একসময়ে তোমার উপর এই লক্ষ খড়্গাঘাত করিবে। উঃ কি ভয়ানক কষ্টপ্রদ মৃত্যু! এই সকল শাস্ত্রাদি দেখিয়া শুনিয়াও কি প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয় না?

গিরীশ। মা যে আদ্যাশক্তি ত্রিজগদধিষ্ঠাত্রী, ত্রিজগন্মাতা ও জীব মাত্রেরই পালয়িত্রী, একথা কে না স্বীকার করিবে? তবে মা মহিষাসুর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সম্মুখে ঐ সমস্ত রূপবিশিষ্ট প্রাণীকে বধ করিলে তাঁহার সন্তোষ হইয়া থাকে।

বাবাজী। তা বেশ! এ যুক্তি মন্দ নহে। মা যখন মহিষরূপধারী কোন অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তখন মহিষরূপধারী যাবতীয় প্রাণীকে বিনাশ করিলেই তাঁহার সন্তোষ হইবে। ইহাতে বুঝা গেল, যে যে রূপধারী অসুরদিগকে বিনাশ করা হইয়াছে, সেই সেই রূপবিশিষ্ট প্রাণীকে বধ করিলেই মা সুখী হইবেন। মা ত শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ প্রভৃতি মানবদেহধারী অসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন; তবে ঠিক এই পশুবলির ন্যায় নরবলি দেওয়া হয় না কেন? আবার অন্যান্য অবতারে অঘ, বক, ধেনুক, বৃষ বৎস, সম্বর প্রভৃতি অসুর বিনাশ করিয়াছেন। তত্তৎ রূপবিশিষ্ট প্রাণীদিগকেই বা বাদ দেওয়া হয় কেন? এ কি অবিচার! একের পাপে অন্যের শাস্তি! কোন যুগে মহিষাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই জাতির নিরপরাধা জীবগণকে বিনাশ করিতে হইবে? এই যুক্তি অনুসারে রাক্ষসবংশ ধ্বংসকারী রামচন্দ্রের বিভীষণকে এবং হিরণ্যকশিপু-বিনাশী নৃসিংহদেবের প্রহ্লাদকে

বধ করা উচিত ছিল। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনারা এই বলিশব্দে বধ করা অর্থ কোথায় পাইলেন? অভিধানে পাওয়া যায়—"বলিঃ পূজোপহারঃ স্যাৎ।" যেমন ধর্ম্ম, সূর্য্য, অথবা শিবের নামে বৃষগণকে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ উপহার-স্বরূপ মেষ মহিষ প্রভৃতি মাকে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিলেই হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে চমস যোগেন্দ্র বলিয়াছেন;

যদ্ ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥

মোট কথা—যতই শাস্ত্র যুক্তি দেখান হউক না কেন, হিংসাজনিত যে অপরাধ, তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া বিষয়কার্য্যাদি করিতে হয়, উপাসনাদি তদপেক্ষা শতগুণ বিচারপূর্ব্বক করিতে হইবে।

গিরিশ বাবু এবং অন্যান্য সকলে বাবাজী মহাশয়ের মুখে এইরূপ সদুপদেশপূর্ণ নানা কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন। যাঁহাদের বাড়ীতে বলি হইত না, আজ তাঁহাদের মনের দুঃখ ঘুচিয়া গেল এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, বলি না দেওয়াই শ্রেয়ঃ পন্থাঃ। বাবাজী মহাশয় ক্রমে অন্যান্য কয়েক বাড়ীতে মায়ের দর্শন করিয়া সদলবলে শ্রীমদনগোপাল জিউর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইলেন। সেদিনও ইঁহারা পূর্ব্ববৎ কীর্ত্তনানন্দে শ্রীমদনগোপাল জিউর বাড়ীতেই রাত্রিযাপন করিলেন।

কাল্‌নায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌর দর্শন।

বাবাজী মহাশয় পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সাতগাছিয়ানিবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কাল্‌না অভিমুখে রওনা হইলেন। সাতগাছিয়া নিবাসী বহু লোক অনেক দূর পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। কাহারই মানসিক ইচ্ছা নয় যে, এরূপ আনন্দময় মধুর সঙ্গ ছাড়িয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু কি করিবেন? না আসিলে নয়, তাই অগত্যা মনটীকে ইঁহাদের সঙ্গে রাখিয়া শুধু দেহযষ্টিখানি লইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি কাল্‌না গ্রাম স্পর্শ করিতে না করিতেই গ্রামবাসী লোকসকল উধাও হইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। যত লোক সাতগাছিয়ায় ফিরিয়া গেল, প্রায় তাহার দ্বিগুণতর লোক আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিল। আনন্দের অবধি নাই। ইঁহারা কোথায় যাইতেছেন, কাহার বাড়ীতে উঠিবেন, কিছুই ঠিক নাই। বাবাজী মহাশয় চরণের উপর চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। এরূপ অপরূপ নৃত্যভঙ্গি আর কোথাও দেখা যায় না। অতিশয় উন্নতাবনত পার্ব্বত্যভূমি বা কর্ষিত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ও ইঁহার চরণের দুই তিনটী অঙ্গুলি ভিন্ন অন্যাংশ ভূমিস্পৃষ্ট হইত না। নৃত্যকালীন এত দ্রুতবেগে গমন করিতেন যে, সঙ্গিগণ বেগে ছুটিয়া অতি কষ্টে ইঁহার অনুসরণ করিতেন। সে নৃত্যভঙ্গি ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন। সহর বা গ্রাম কোন স্থানে ইঁনি কাহাকেও পথের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন না বা কোন পরিচিত লোক সঙ্গে নিতেন না। এটী ইঁহার চিরন্তন স্বভাব কীর্ত্তন ধরিয়া নাচিতে নাচিতে অতি সুপরিচিত

ব্যক্তির ন্যায় ঠিক গন্তব্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "এস্থান কি আপনার পরিচিত?" তদুত্তরে ইনি বলিতেন, "হ্যাঁরে আমি না চিনিলে কি হইবে? নিতাইচাঁদ ত চিনেন। নাম নামী অভিন্ন। নামরূপে নিতাইচাঁদ চলিয়াছেন। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আমার নিতাইর রাজত্ব। নিতাইচাঁদের অপরিচিত স্থান কি কোথাও আছে? গ্রামে, সহরে, পর্ব্বতে, কান্তারে যাহার যথায় যাইতে ইচ্ছা, একমাত্র নামের আশ্রয় ধরিয়া গমন করিলে নাম ঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেনই দিবেন। যদি নাম অবলম্বনে প্রাকৃতরাজ্যেই গমনাগমন করিতে পারা না যায়, তবে নাম যে অপ্রাকৃত, নিত্যচিন্ময় ধামে পৌঁছাইয়া দিবেন, তাহার বিশ্বাস কি? ভ্রম ছাড়। একমাত্র নাম হইতে ইহ পরজগতে না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই।"

নাম করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় আন্দাজ সাত আট বৎসরের একটী বালক হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "আপনারা কীর্ত্তন লইয়া আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদিগকে মহাপ্রভুর বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।"

অকস্মাৎ আগত বালকটীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রায় অনেকেই একটু বিস্মিত হইলেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই বালকটীর ধূলিধূসরিত অঙ্গের ভঙ্গি এবং হাসিমাখা আধ আধ কথায় সব ভুলিয়া গেলেন। সকলেই অতি আনন্দভরে বালকের প্রদর্শিত পথেই নাচিতে নাচিতে চলিলেন। মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই বালকটী "ঐ যে মহাপ্রভুর বাড়ী দেখা যাইতেছে" বলিয়া কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিল ইত্যবসরে আরও কয়েকটী বালক আসিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে নাচিতে লাগিল। বালকে বালক মিশিয়া গেল। নিতাইচাঁদের খেলা নিতাইচাঁদই বুঝিলেন, আর তাঁহার অন্তরঙ্গ কেহ কেহ বুঝিলেন।

মহাপ্রভুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া ইঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য এবং কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা প্রায় এগারটা বাজিল। একজন গোস্বামীপ্রভু আসিয়া বলিলেন, "আপনারা স্নানাহ্নিক করিয়া এইখানেই মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুণ।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর কৃপা অনুভব করায় বাবাজী মহাশয়ের আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। তখন সকলে গঙ্গাস্নানাদি সমাপন করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

নাম ব্রহ্মের বাড়ীতে নিয়মসেবা

অপরাহ্ণ চারিটা সাড়ে-চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় সগণে দর্শনে বাহির হইলেন। নানাস্থান দর্শন করিয়া নামব্রহ্ম * দর্শন করিতে যাইবামাত্র ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া ইঁহাকে ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বোধনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও সগণে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক নামব্রহ্ম দর্শন করিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সমাধী দর্শন করিবামাত্র ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই আর্ত্তি—সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় কান্না এবং সেই আব্দার শুনিয়া আগন্তুক দর্শকবৃন্দ অবাক্ হইয়া গেল। তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে কে মনে করিবে বা বুঝিবে যে, সিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ দর্শন বা কথোপকথন হইতেছে না। কিঞ্চিৎ পরে বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় ইঁহাকে বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া নানাবিধ ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। ইনি কিরূপে বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়ের

* সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের স্থাপিত সেবা।

ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেন, ইহা জানিবার জন্য বোধ হয় অনেকেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে।

শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় এবং শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়* এই তিনটী মহাপুরুষ একই সময়ে তিনটী ভাব অবলম্বন করিয়া ভজন করিতে করিতে ভাবসিদ্ধ হন। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় পরম বিধিনিষ্ঠ ছিলেন। দেহান্তকাল পর্য্যন্ত একটী দিনের জন্যও আহ্নিক, পূজা ব্রত ও নিয়মনিষ্ঠার কোনও-রূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আবার শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় ঠিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সর্ব্বদা ভাবে বিভোর থাকিতেন। বিধির গন্ধও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 'শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার পতি, তিনি তাঁহার পত্নী' এই ভাবটী অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকিত। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—"ভজন চ'ল সারা আমার সাধন হ'ল সারা। নদের চাঁদের কান্তা আমি কান্ত আমার গোরা।" সময়ে সময়ে ভাবাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের বামে গিয়া দাঁড়াইতেন। অপর কেহ নিজেকে গৌরদাসী বা গৌরাঙ্গদেবকে প্রাণবল্লভ বলিলে অমনি প্রণয়রোষভরে গৌরাঙ্গদেবকে নানারূপ ভৎসনা করিতেন এবং গৌর-দাসীর উপর বিশেষ তর্জ্জন ভৎসন করিতেন। শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহাশয় একমাত্র নামনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সদাসর্ব্বদা মালা জপ করিতেন। এমন কি, তাঁহার দক্ষিণহস্তের অনামিকা অঙ্গুলিটী মালার ঘর্ষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। তিনি পরম বৈষ্ণবসেবী এবং বৈষ্ণবা-ধরামৃতনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সদর দরজায় একটী চৌবাচ্চা ছিল, উহাতেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পত্রাদি ফেলা হইত। শৃগাল কুকুরাদিও সেই

* ইনি বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষা পরমগুরু ছিলেন।

চৌবাচ্চা হইতে প্রসাদাদি খাইত। তিনি সকালবেলা উঠিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে ঐ চৌবাচ্চা হইতে কিঞ্চিৎ অধরামৃত গ্রহণ না করিয়া কোন কাজই করিতেন না।

এই তিনটী মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে উপাসনানিষ্ঠ হইলেও পরস্পর এক-আত্মা ছিলেন। একের মনোভাব অপরে অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইতেন। তাঁহাদের পরস্পর এতই সৌহার্দ্দ ছিল যে, একের জন্য অপরে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একের ভাব বা ভজন লইয়া অপরের সমালোচনা বা বাদানুবাদ ছিল না। ইহাকেই বলে অপ্রাকৃত ভাব। এই মহাপুরুষ তিনটীর পরস্পর ভ্রাতৃভাব ছিল। পরস্পর পরস্পরের দাদা। এই সম্বন্ধেই বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বোধন করিতেন। কি মধুর সম্বন্ধ! আমরা হইলে হয়ত এই বিভিন্ন ভাবের ভাবুককে পরাস্ত করিবার জন্য বা সেই ভজনপথ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তি করিবার জন্য কতই সমালোচনা, কতই কূটতর্ক এবং কতই শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইতাম এবং আমার নিজ-আচরিত পন্থাই যে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ ও মহাপ্রভুর অনুমোদিত এবং গোস্বামিগণ-সম্মত ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতাম। আমরা জনসাধারণের নিকটে সুপণ্ডিত ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিয়া থাকি। কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, লব্ধপদ-প্রতিষ্ঠারূপ চণ্ডালিনী যে হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে সে হৃদয়ে ভক্তিদেবী স্থান পাইতে পারেন কি না। আমরা প্রায় সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, "এইটী মহাজনের কলম নয়। ঐটী গোস্বামিগণের মত নয়; কিন্তু স্থির চিত্তে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া দেখি না যে, প্রকৃত মহাজনের পথ বা গোস্বামীগণের মত কি

এবং কাহারও উপাসনা-প্রণালী লইয়া বিবাদ করা সম্পূর্ণ মুর্খতা বা গোস্বামিগণের মতবিরুদ্ধ কি না। যাক্, বৃথা সমালোচনায় সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মোটের পর আমাদের সকলেরই এই কথাটী মনে রাখা কর্ত্তব্য ; —

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃঋজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখ, বাবা! কাল দশমী। পরশ্ব দিন হইতে নিয়ম সেবা আরম্ভ। এবার নামব্রহ্মের বাড়ীতে নিয়মসেবা করিতে হইবে। এই একমাসের মধ্যে আর কোথাও যাইতে পারিবে না।

বাবাজী। আজ্ঞে, আপনাদের কৃপা এবং নিতাইচাঁদের ইচ্ছা। আমার ত সম্পূর্ণ বাসনা যে সর্ব্বদা আপনাদের চরণে পড়িয়া থাকি।

এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা আরত্রিক আরম্ভ হইলে ইঁহারা আরতিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্রে কেহ আর কিছুই আহারাদি করিলেন না। বাবাজী মহাশয় পরদিন প্রভাতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাতীসুরে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নামকীর্ত্তন করিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সমাধির সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করা ইঁহার স্বাভাবিক নিয়ম। সঙ্গিগণের প্রতি ইঁহার আদেশ ছিল যে, যদি কেহ লীলাকীর্ত্তনাদি নাও করিতে পার, অন্ততঃ ত্রিসন্ধ্যা নাম করা চাইই। বৈষ্ণব দেখিলেই তাহাকে উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম ছিল। কিন্তু তিনি প্রকৃত তত্ত্ব-

জিজ্ঞাসু ছিলেন। যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা! "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নামটী কোথায় পাইলে? নামটী বেশ মধুর, কিন্তু আধুনিক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনদিগের কৃপায় আমাদের ত কোনই অভাব নাই। তবে আবার নূতন সৃষ্টি করিবার দরকার কি?

বাবাজী। বাবা! আপনি গুরুজন ব্যক্তি। যদি আমার কোনও অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি।

বিষ্ণুদাস। বাবা! আমি সে জাতীয় লোক নহি। আমার সঙ্গে তুমি যতই বাদানুবাদ কর না কেন, আমার অসন্তোষ হইবে না; কিন্তু আমাকে শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া চাই। বিশেষতঃ তোমাতে আমাতে ত পিতাপুত্র সম্বন্ধ; সুতরাং কোন অপরাধের সম্ভাবনাই নাই।

বাবাজী। আপনি বলিলেন, "নিতই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নামটী আধুনিক। নিতাই, গৌর, রাধে, শ্যাম, হরে, কৃষ্ণ, হরে, রাম, এই আটটী নামের মধ্যে কোন্‌টী নূতন, আমাকে বুঝাইয়া দিন, সেই নামটী বাদ দিই।

বিষ্ণুদাস। (একটু চিন্তা করিয়া) না বাবা! নাম ত নূতন নয়; নামের ক্রমটা নূতন।

বাবাজী। ক্রমটা নূতন কথাটী বেশ বুঝিতে পারিলাম না।

বিষ্ণুদাস। নূতন ক্রম অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণপূর্ণতম। নিতাই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ এবং অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার অংশাবতার। শ্রীগৌরাঙ্গদেব মহাপ্রভু, নিতাই অদ্বৈত প্রভু; সুতরাং আগে মহাপ্রভুর নাম না করিয়া প্রভুর নাম করা ভাল হয় নাই। বরং গৌর নিতাই রাধে শ্যাম বলা ভাল।

বাবাজী। তাহা হইলে কৃষ্ণও ত পূর্ণপূর্ণতম। মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার শক্তিরূপা। যদি আংশাংশীভাবে পরিবর্ত্তনই করিতে হয়, তবে 'গৌর নিতাই শ্যাম রাধে, কৃষ্ণ হরে, রাম হরে' এইরূপ করিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়।

বিষ্ণুদাস। বাবা! ও যে বিষয় আশ্রয়তত্ত্ব; শ্রীমতী রাধারাণী আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতিরেকে বিষয় প্রাপ্তির উপায়ন্তর নাই।

বাবাজী। বেশ কথা। ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র বিষয়; অর্থাৎ প্রাপ্য বস্তু। রক্তক পত্রক দাস্যভাবে, সুবল মধুমঙ্গল সখ্যভাবে, নন্দ যশোদা বাৎসল্যভাবে এবং গোপীগণ মধুর ভাবে তাঁহার আশ্রয়। যিনি যে রসের উপাসক, তিনি সেই রসের আশ্রয়ের আনুগত্যে উপাসনা করিলে তদ্ভাবাঢ্য বিষয়কে অনায়াসেই লাভ করিতে পারিবেন! তাই আগে রাধা নাম না করিয়া কৃষ্ণনাম করিলে ভুল হয়। আচ্ছা, শচীনন্দন গৌরচন্দ্রকে কি প্রণালীতে ভজনা করিতে হইবে? অর্থাৎ গৌরাঙ্গই যখন বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয় কে হইবে? কাহার আনুগত্যে ভজিলে জীবের সহজে গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি হইবে?

বিষ্ণুদাস। রাধাশক্তি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আশ্রয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিষয়। অতএব গদাধর পণ্ডিতের আশ্রয়ে ভজিলে সহজেই জীবের গৌরাঙ্গপ্রাপ্তি হইবে।

বাবাজী। গুরুপ্রণালীর তাৎপর্য্যার্থ কি? এবং উপাসনামার্গে গুরুপ্রণালীর আবশ্যকতাই বা কি?

বিষ্ণুদাস। মহাপ্রভুর অনেক শাখা। যে ব্যক্তি যে শাখার পরিবার অর্থাৎ অনুগত, সেই শাখার পরম্পরাশ্রেণীর নাম তাহার গুরুপ্রণালী। যেমন কোন উচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে সিঁড়ির প্রয়োজন, সেইরূপ

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের নিকট গমন করিতে বা তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠীগুরু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহাকেও আশ্রয় বলা যাইতে পারে।

বাবাজী। বলা যাইতে পারে কেন? বলিতেই হইবে। গৌরাঙ্গ সাগরে যাইতে হইলে কোনও প্রণালী অর্থাৎ অন্তরঙ্গ কোনও গণের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং নিতাই, গদাধর বা অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কোন মতেই গৌরাঙ্গলাভ হইতে পারে না। অতএব নিতাই নাম আগে দেওয়ার তাৎপর্য্য সহজেই বুঝা গেল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবনিধি—সকল প্রকার রসের আকরস্বরূপ এবং তাঁহার গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার রসের পাত্রও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব যিনি যে ভাবে যে রসে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সেই ভাবে সেই রসের পাত্রকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সকলেরই এক গদাধর, নিতাই বা অদ্বৈতের ভাব ভাল লাগিবে কেন? 'যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।' ইহাকেই বলে প্রণালী, সিঁড়ি বা আশ্রয়। এখানে সেখানে একই রূপ। ব্রজে যেমন 'ব্রজবাসীর কোনও এক ভাব লৈয়া ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥' নবদ্বীপে সেইরূপ 'গৌরগণের আনুগত্যে ভজে যেই জন। অনায়াসে পায় সেই গৌরাঙ্গচরণ॥'

বিষ্ণুদাস। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, এ নামটী সার্ব্বজনীন নহে; একমাত্র নিত্যানন্দ পরিবারের জন্যই বিধান করা হইয়াছে।

বাবাজী। যেমন গৌরাঙ্গদেব ভাবনিধি, সেইরূপ নিতাইচাঁদ সকল ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন সকল রসের আকর, নিতাইচাঁদ সেইরূপ সকল রসের গুরু। কাজেই যিনি যে ভাবের বা যে রসের উপাসকই হউন না কেন, একমাত্র নিতাইকে আশ্রয় করিলেই

সেই ভাবে সেই রসে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিতে পারিবেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু।
যে যাহা চায়, সে তাহা পায়, বাঞ্ছাকল্পতরু॥ ইত্যাদি

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন ;—

অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা।
দশদিকময়, নিতাই সুন্দর নিতাই ভুবন ভরা॥
রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
রাধার ভগিনী, শ্যামসোহাগিনী, সব সখীগণ প্রাণ।
যাহার লাবণী, মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥
নিতাইসুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্নসিংহাসন শেষে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলাসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার আঁখি মুখ সর্ব্ব অঙ্গ।
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥
নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব বরজপুরে।
দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদন, নিতাই না ছেড় মোরে॥

এখন পর্য্যায়ক্রমে এই নামের অর্থ শুনুন :—ভজ নিতাই গৌর অর্থাৎ যদি তোমরা মানবজন্ম সফল করিতে চাও, তবে নিতাইকে আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজ অর্থাৎ সেবা কর। নিতাই প্রেমদাতা। আগে প্রেমধন না পাইলে কি দিয়া গৌরাঙ্গ সেবা করিবে? গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমের কাঙ্গাল। তিনি ত ধন, মান, কুলের কাঙ্গাল নন; বরং

ধন, মান, কুলাভিমানীর পক্ষে তিনি সুদুর্লভই বটেন। তাই মহাজনগণ বলিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গ পাইতে যদি থাকে অভিলাষ। একান্তভাবেতে হও নিত্যানন্দদাস॥ মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দদাস। নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ প্রকাশ॥" মহাপ্রভু নিজমুখেও বলিয়াছেন, "জনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যে লয় নিতাইএর নাম। আমি বিকাই তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥" সুতরাং দিনান্তে কিংবা নিশান্তেও একবার নিতাই বলিয়া ডাকিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পাওয়া যাইবে। গৌরকে পাইলে রাধাগোবিন্দপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন ভজনসাধন না করিলেও নিজ নিজ হৃদয়ের ভাব অনুসারে গৌরই রাধাশ্যামকে মিলাইয়া দিবেন।

বিষ্ণুদাস। মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" এই মহামন্ত্র জপিবার জন্য কলির জীবের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। তুমি কি বলিতে চাও, সেই হরে কৃষ্ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নামই জপ করিতে হইবে?

বাবাজী। "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নামের মধ্যে হরে কৃষ্ণ নাম পরিত্যাগ করিবার ত কোনই কথা হয় নাই। বরং জপিবার ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়াছে। গুরুদেব বলিয়াছেন, "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" অর্থাৎ নিতাই গৌরকে ভজিতে হইলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর। নিতাই গৌরের কৃপায় অনায়াসেই রাধাগোবিন্দ প্রাপ্তি হইবে। তাই গুরুদেব প্রণালীবন্ধনে নামটী বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং সংক্ষেপে নামের চুম্বক অর্থটীও বলিয়া দিয়াছেন.—"নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম ধন। রাসবিলাসে পাবে শ্রীরাধারমণ॥ হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম তরী আরোহণে। সংসার সাগর পার চল বৃন্দাবনে॥" আমার কোন ভজন

সাধন বা বিধিনিয়ম পালন করিবার সামর্থ নাই দেখিয়া করুণাময় গুরুদেব আদেশ করিয়াছেন, "তোর আর কিছুই করিতে হইবে না। এই নাম করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ কর্। নামের নিকট দেশ, কাল, পাত্র, শুচি, অশুচি, বিচার নাই। হেলায় শ্রদ্ধায় একবার উচ্চারিত হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। কিন্তু নামের কাছে কিছু চাহিবার দরকার নাই। নাম যাহা প্রয়োজন বোধ করেন, করিবেন।" আরও বলিয়াছেন, "তুমি বহু জন্ম সংসারী লোকের নিকট অনেক প্রকারে ঋণী আছ। তোমার এমন কি পরমার্থধন সঞ্চিত আছে যে, তদ্দারা সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পার? অতএব কেহ গ্রহণ করুক বা নাই করুক, অযাচিতভাবে এই অমূল্য ধন আপামর সাধারণকে নিষ্কামভাবে অবিচারে বিতরণ করিয়া যাও; সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।" তাই গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক এই নাম অবলম্বনে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আমি কাহারও উপদেষ্টা বা শিক্ষাদাতা নহি।

বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ নীরবে ইঁহার গুরুনিষ্ঠা এবং গুরুপাদপদ্মে আত্মনির্ভরতার কথা শুনিতেছিলেন এবং অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছিলেন। এবার আর ধৈর্য্য রহিল না—একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আমি বুঝিতে না পারিয়া নামের উপর এবং তোমার উপর কটাক্ষ করিয়াছি। আমি ঘোর অপরাধী, আমার গতি কি হইবে? বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে বলিলেন, "বাবা! আমি আপনার সন্তান; এ সব তো আমার শিক্ষা। আপনি এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবেন না।" এই বলিয়া পরমানন্দে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" নামকীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সকলে ঐ নাম ধরিয়াই গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। স্নানাদি শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটা সাড়ে চারিটার সময় সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে মহামায়ার বিজয়া দর্শনে গমন করিলেন। আজ গঙ্গাতীর লোকে লোকারণ্য। মা আনন্দময়ী চিরদিন পর্য্যন্ত জগবাসী আপামর সাধারণ জনগণকে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন করিয়া নিজেও যেন পরমানন্দিত চিত্তে শঙ্করমৌলিনিবাসিনী আদরিণী দ্রবময়ী জাহ্নবী দেবীকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন। হরিধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক ঢোল, সানাই, টিকারার ধ্বনি এবং জয় জয় ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত। আজ মায়ের আনন্দে সন্তানের আনন্দ। আবার সন্তানের আনন্দে মায়ের আনন্দ। উভয় আনন্দ যেন অন্যোন্যাপেক্ষী হইয়া পরস্পর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মা যেমন সপত্নীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সন্তানগণও চিরশত্রুতা ভুলিয়া প্রেমানন্দোৎফুল্লচিত্তে আবালবৃদ্ধবনিতা পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত ইঁহারা সকলে গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করতঃ নামানন্দে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে করিতে নামব্রহ্মের বাটী আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। আজ শ্রীএকাদশী। অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন হইবে! প্রভাতী সুরে নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নাম ধরা হইল।, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম নামটী যেন কল্পতরু। যাহার যে সময়ে, যে সুরে যে রাগিণীতে ইচ্ছা, ধরিলেই আনন্দ। আবার উহার সঙ্গে সঙ্গে পদপদাবলীও যোগ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে বেলার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চারিদিকে এক রব উঠিয়াছে,—"নবদ্বীপ হইতে এক সাধু আসিয়াছেন,

তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম—অপূর্ব্ব কীর্ত্তন—আশ্চর্য্য শক্তি। তিনি নামে গাছ নাচান—পাষাণ গলান।” ইত্যাদি।

শুনিয়া ক্রমে বহু লোকসমাগম হইতে লাগিল। দিবারাত্র সমান আনন্দ চলিতেছে। সরল নাম; বালকবৃদ্ধ সকলেই সমানভাবে উচ্চারণ করিতেছে—সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। এক এক সময়ে বোধ হইতেছে, যেন সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় প্রকট হইয়া নাম-কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। তাই সকলে অক্লান্তভাবে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মরণপূর্ব্বক নামানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ কীর্ত্তনে এতই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদের মাতাপিতা বহু কষ্টেও তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না। ক্রমে নাম-কীর্ত্তন এতই মধুর বোধ হইতে লাগিল যে, রাত্র প্রভাত হইয়া গেল, তবু কাহারও নাম ছাড়িতে মন হইতেছে না।

এই সময়ে বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বলিলেন, “বাবা! এখন নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলে ভাল হয় না?” বাবাজী মহাশয় “যে আজ্ঞা” বলিয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এবং বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া বঙ্কিমঠামে নাচিতে নাচিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করে কার সাধ্য? যে যে রাস্তায় কীর্ত্তন যাইতেছে, সেই সেই রাস্তার বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ী পর্য্যন্তও যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। নামের এক অপূর্ব্ব রোল উঠিল। বুলির মধ্যে “ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।” কিন্তু যে যে অবস্থায় থাকিয়া এই নাম শুনিতেছে, সে সেই অবস্থায়ই ছুটিয়া আসিয়া কীর্ত্তনে নাচিতেছে। এইরূপে কালনা গ্রামের বহুস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক বেলা অনুমান এগারটার সময় বাসায়

ফিরিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। ক্ষণকাল পরে গঙ্গাস্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক "জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈতগৌরাঙ্গ" কীর্ত্তন করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্ণ অনুমান তিনটার সময় পাঠের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নিয়ম সেবা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় নিজেই পাঠক এবং ইঁহারা কীর্ত্তনীয়া। শেষ রাত্রে মঙ্গল আরতির কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে আহ্নিকের কীর্ত্তন, অপরাহ্নে পাঠের পূর্ব্বকীর্ত্তন, পাঠান্তে আবার কীর্ত্তন; তদনন্তর সন্ধ্যা-আরতি, রূপ অভিসার ও মিলন কীর্ত্তন করিয়া তবে বিশ্রাম। বাবাজী মহাশয় এমনই কৌশলী যে, কাহাকেও সর্ব্বদা নাম করিবার জন্য আদেশ না করিলেও দিবারাত্রের মধ্যে অতি অল্প সময়ই অবকাশ থাকিত। কীর্ত্তন শুনিবার জন্য লোকসকল বহুপূর্ব্ব হইতেই আসিয়া বসিয়া আছে; বাবাজী মহাশয় হাতমুখ ধুইয়া কীর্ত্তনে বসিলে সকলেই তৃষিত চাতকের ন্যায় একদৃষ্টে ইঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল; ইনিও দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সুরসহযোগে বলিতে লাগিলেন ;—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

নামব্রহ্মের বাড়ীতে নিয়মসেবা।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ॥
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ,
শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুরনর-মুনি-মনমোহন ধাম॥
জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর,
জয় নিজ প্রেয়সী ভাববিনোদ।
বরজ তরুণীগণ, লোচন মঙ্গল,
নদীয়া-বধুগণ নয়ন আমোদ॥

জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যাঁর অংশ কলাতে গণন।

কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥
(যাঁর) লীলালাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান,
যাঁর রূপ ভুবনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
ব্রজের বৈদগ্ধীসার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধ হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদচরণ ॥



জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় অদ্‌ভুত, সো পঁহু অদ্বৈত,
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে ॥
নিজ পঁহু মনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প ॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনীর তীরে,
আইলা নাগররাজ।
তাহার পীরিতে, আসিয়া তুরিতে,
উদয় নদীয়া মাঝ ॥

জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈতচরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
" " খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ।
" " স্বরূপরূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
" " পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
" " কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র।
" " কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচার্য্য।
" " তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।
" " বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ।
" " বসুধা জাহ্নবাপ্রাণ গঙ্গাবীরচন্দ্র।
" " কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
" " পরমেশ্বর দাস পুরী গোঁসাই জয় জগদানন্দ।
" " জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ।
" " ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ।
" " অভিরাম গৌরীদাস নন্দন আচার্য্য।
" " রাঘব পণ্ডিত গদাধরদাস ভাগবতাচার্য্য।
" " দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
" " ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।
" " শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র।

জয় জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।
" " কালিদাস ঝড়ুঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।
" " হঞাছেন হবেন যত প্রভুর ভক্তবৃন্দ।
" " উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌরভক্তবৃন্দ।
এই বার সবে মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ।
আমায় সংকীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ।
যেন ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।

নানারূপ অলঙ্কার দিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইপদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের অবধি নাই। বালকবৃদ্ধ, পুরুষনারী সকলেই নিস্তব্ধ। কেহ বা কাঁদিতেছে, কেহ বা ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে। আনন্দসাগর যেন সংকীর্ত্তনরূপ পবনাঘাতে উত্তাল প্রেমতরঙ্গময় হইয়া আপামর সাধারণকে ভাসাইয়া দিল। অম্বিকাগ্রামে গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমে নিতাই গৌর যে নিত্যবিরাজমান, এ কথা বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। উত্তরোত্তর লোকসংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আনন্দের মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বেলা অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত পাঠ হওয়ার পর আবার কীর্ত্তন ধরিলেন,—

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।

জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।
" " শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
" " রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।
" " রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
" " ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।

জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ।
,, ,, পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।
এইবার কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ।

ক্রমে রূপ অভিসার ও মিলন কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনসমাপ্তি করিবেন, এই সময় বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমরা যে একেবারে কীর্ত্তন সমাধা করিয়া দিলে। রাধা দামোদর গাইবে কখন?

বাবাজী। রাধাদামোদর কি, আমি ত জানি না বাবা! আপনি বলুন, আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে গাহিব।

বিষ্ণুদাস। তোমাদের ত স্বভাব—কোন গ্রন্থাদিও দেখিবে না, মহাজনদিগের আচরণও অনুসন্ধান করিবে না। আচ্ছা, আমিই না হয় বলিয়া দিতেছি। এই বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন,—

ওহে কার্ত্তিকের অধিদেব রাধাদামোদর দয়া করহে।
ওহে জীব গোসাঞির প্রাণধন ,, ,, ,,
ওহে মা যশোদার নয়নতারা ,, ,, ,,
ওহে ব্রজের জীবনধন ,, ,, ,,
ওহে সুবলের মরমসখা ,, ,, ,,
ওহে যশোদার অঞ্চলের নিধি ,, ,, ,,
ওহে বৃন্দাবন বনদেবা ,, ,, ,,

ইত্যাদি বহু বহু আঁখর দিয়া গাহিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু একটী কথাও বলিতেছেন না; নীরবে বসিয়া আছেন। কীর্ত্তন শেষ করিবার পর বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়কে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা! এ কি রকম কীর্ত্তন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বলিলেন, মহাজনেরা এই পদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু

এরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা কখনও সাধকের মুখে আসিতে পারে বলিয়া এতদিন আমার ধারণাই ছিল না।

বিষ্ণুদাস। (একটু ক্রুদ্ধভাবে) দেখ, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই এই রাধাদামোদর কীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে। আজ তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, এতদিন কেহই এত বড় কথা বলিতে পারে নাই। আচ্ছা কি সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আমাকে বুঝাইয়া দাও।

বাবাজী। বাবা! আমি আর কি বুঝাইয়া দিব? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সিদ্ধান্ত একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছেন,—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লৈঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে॥
চারি জনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হইতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি॥
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেব মূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব॥
সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব পৌষে নারায়ণ॥

মাঘের দেবতা মাধব গোবিন্দ ফাল্গুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র কোঙর।

কার্ত্তিকের অধিদেব দামোদরকে যদি রাধাদামোদর, জীবগোসাঞির প্রাণধন বা মা যশোদার নয়নতারা প্রভৃতি বলা হয়, তবে কতদূর সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়, ভাবিয়া দেখুন। আমার মতে পূর্ণপূর্ণতম শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনপ্রিয়া শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অংশাংশের অংশ, তদ্বিলাস তদংশাংশরূপ দ্বাদশমাসাধিষ্ঠাতৃ দেবতার সংযোগ করাতে ঘোর অপরাধ হয়।

বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় একটু বিস্মিতভাবে উঠিয়া গিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি খুলিলেন এবং যথাযথ পূর্ব্বোক্ত পয়ার সকল দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। এতদিন উঁহার ধারণা ছিল যে ভাইপো কেবল নামকীর্ত্তন করিয়াই বেড়ায়; কোনও গ্রন্থাদির আলোচনা নাই। আজ তাঁহার সে ধারণা উল্‌টিয়া গেল। বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আজ হইতে আমি জানিলাম যে, এতদিন অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল গ্রন্থাদি দেখিয়াছি, সে সব দেখাই হয় নাই। অভিমান থাকিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-লীলাতত্ত্বের সিদ্ধান্তরহস্য বিন্দুমাত্রও স্পর্শ হয় না। অনুভবই প্রধান; যার অনুভব নাই, তার অধ্যয়নই বৃথা। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত অনেক সিদ্ধ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের সহিত নবদ্বীপ, নীলাচল, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে এই কীর্ত্তন করিয়া এবং শুনিয়া আসিতেছি। ইহার মধ্যে যে এত আছে, কৈ একদিনও ত

এ কথা কেহ অনুসন্ধান করি নাই। আজ আমার বহুদিনের ভ্রম সংশোধন হইল।" এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমে ঠাকুরের ভোগের পর সকলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাঠ শেষ হইলে বাবাজী মহাশয় পাঠের কীর্ত্তনান্তে আরতি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

নন্দদুলাল বাছা যশোদাদুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
একদিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দু'খানি॥
নেতের অঞ্চলে রাণী মুছে হাত পা।
তোদের নিছনি লৈয়া ম'রে যাক তোর মা॥
বলরাম দাসে বলে নন্দরাণী কুতূহলে।
লাখে লাখে চুম্ব দেই বদনকমলে॥

আরতি করু যশোদা মাই বালকমুখ হেরি।
গাওত নব নব নাগরী রাখাল সব ঘেরি॥
রম্ভাফল ঘৃতের প্রদীপ পুষ্পরচিত থারি।
সুন্দরীগণ হুলতি দেই শিশুগণ করতারি॥
রাখি শিঙ্গাবেণু যশোদা মাই কোলে নিল দোনো ভাই
ক্ষীর দেই মাখন দেই খাওয়ে রাম কানাই॥
সব শিশুগণ মুখ তুলি তুলি যশোমতী চুমো খাই।
মঙ্গল পুছত নন্দঘোষ জগদানন্দ গাই॥

শুভ আরতি কিয়ে জয়জয় কিশোর গোপাল কি।
গোঘৃত রচিত কর্পূরক বাতি, ঝলকত কাঞ্চন থার কি।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি জ্যোতি. মুখশোভা আভা নন্দলালকি।
চরণ কমল পর নূপুর রাজে, উরে দোলে বৈজয়ন্তী মালকি।
ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে, বাজত বেণু রসাল কি।
সুন্দর লোল কপোলন কি শোভা, নিরখত কিশোর গোপাল কি।
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি, অঞ্জলি কুসুম গোলাল কি।
হুঁ হু বলি বলি রঘুনাথদাস গোস্বামী, মোহন গোকুল লাল কি।
কিশোর গোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি।
যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি।
নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি।
গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
রাইয়ের আরতি করে আনন্দে মগন॥
জয় জয় রাধেজিকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পটাম্বর উড়ে নীলসাড়ী।
সীঁথিক সিঁন্দুর অরুণ উজোরি॥
বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥

চুয়া চন্দন অঙ্গে দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু-রাজনন্দিনী বদন উজালা॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতারি।
আরতি করত হি ললিতা পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধু মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদ পঙ্কজ মেরো মরমকি আশা
মদনমঞ্জরী সদা করত ভরসা॥

যতনে আরতি সমাপি তবে।
শ্যাম দরশনে চলই সবে॥
জল ভরিবার করিয়া ছলা।
যমুনায় চলে বরজবালা॥
(আমাদের) রাধিকারূপসী সখিনীসাথে।
(শিরে) গাগরি লইয়া চলই পথে॥
(ভাবের) আবেশে অবশ হইল গা।
চলই মন্থর না চলে পা॥
(হেথা) মা যশোদা নিকটে ভোজন সারি।
বাহিরে চলিলা মুরলীধারী॥
(নন্দ) মহল বাহিরে ফুলের বন।
(আমি) তঁহি উপনীত ব্যাকুলমন॥
নিভৃতে কদম্ব নিকুঞ্জমাঝে।
আসি দাঁড়াইলা রসিকরাজে॥

দূরসঞে দুহুঁ দোঁহারে দেখি।
সজল ছুটল তরল আঁখি॥
প্রদোষ সখিনী সহায় পাই।
শ্যাম-বামে যাই মিলল রাই॥

(অমনি) ললিতা আরতি লইয়া করে।
যুগল হেরিয়া আরতি করে॥
মরমসখী সে আরতি হেরি।
নাচত গাওত যুগল ঘেরি॥

জয় জয় আরতি যুগল কিশোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
আধ পীতাম্বর আধ নীল সাড়ী।
জলদে বিজুরী যেন রহু জড়াজড়ি॥
বেশ বনাওত প্রিয় সুকুমারী।
রতন সিংহাসনে কিশোরা কিশোরী॥
চুয়া চন্দন গন্ধ দেই ব্রজবালা।
কোটি চাঁদ জিনি দুঁহু বদন উজালা॥
দুহুক পরশ রসে দুঁহু ভেল ভোর।
দুঁহুক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
নব নব ব্রজবধু দেই করতালী।
করতহি আরতি ললিতা আলি॥
চৌদিকে সখীগণ দেই জয়কার।
সহচরী কুসুম বরিখে অনিবার॥

চামর বীজয়ি কোই দুঁহু অঙ্গে।
তাম্বূল দেই কোই প্রেম তরঙ্গে॥
বাজত বিবিধ বাদ্য শঙ্খ করতাল।
আনন্দে সখীগণ গাওয়ে রসাল॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখয়ি অনন্দে সখী চৌপাশ॥

সময়ে বুঝিয়া, সত্তর হইয়া,
চতুরী বরজবালা।
ভরিয়া কলসা, হইয়া উলসি,
নিজগৃহে উতরিলা॥
আসি দাসীগণ, রাধার চরণ,
ধোয়ায় শীতল নীরে।
অতি সুকোমল, এ থল কমল,
মুছল পাতল চীরে॥
হাস পরিহাসে, বসিয়া আবাসে,
সরম করল দূর।
ও রূপ মাধুরী, হেরি সহচরী,
আনন্দ সায়রে বুর॥

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে মধুর সুধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥

বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে।
নাহি পরাপর ভাব বিভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ নীরবে আরতি-কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। কীর্ত্তন শেষ হওয়ার পর বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! আবার যে গোল উপস্থিত হইল। আরতি-কীর্ত্তনের ক্রমভঙ্গ হইল যে?"

বাবাজী। আজ্ঞে ভুল সকলেরই হইতে পারে। বুঝাইয়া দিন, ভ্রম সংশোধন হইয়া যাইবে।

বিষ্ণুদাস। সর্ব্বপ্রথম শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি, তৎপরে রাধারাণীর এবং তৎপরে গোপালের আরতি হইবে। এ যে সবই বিপরীত! আবার সন্ধ্যার সময় যুগলমিলন, অভিসার! এ ত কোথাও শুনি নাই। আমি দুই চারিটী বিষয়ে তোমার নিকট পরাস্ত হইয়াছি। তাই বলি, যদি আমায় বুঝাইয়া দিতে পার, আমার আনন্দ হইবে। এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, তুমি একটা কিছু অনুভব না করিয়া কখনও কোন কার্য্যই কর না। যাহা হউক, এ বিষয়টী আমাকে বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দাও।

বাবাজী। আচ্ছা, আমার যতদূর ধারণা, এক একটী করিয়া বলি। ভুল হয় সংশোধন হইবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করি, মহাপ্রভুর সন্ধ্যা আরতি কোথায় হয়? অর্থাৎ ভক্তগণ কোন্‌স্থানে মহাপ্রভুকে সন্ধ্যাকালে আরতি করিয়া থাকেন?

বিষ্ণুদাস। আমাদের স্মরণপ্রণালীতে শ্রীগুরুদেব যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে সায়ংকালে যে সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হয়েন, তখনই আরতি করা হয়।

বাবাজী। গোধূলি সময়ে গোষ্ঠ হইতে যখন রামকৃষ্ণ নন্দালয়ে প্রবেশ করেন, তখন শ্রীমতী কোথায় থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন?

বিষ্ণুদাস। কেন? এ ত সহজ কথা। পদকর্ত্তারাও ত বলিয়াছেন,—

"অট্টালি উপরি, বসিয়া কিশোরী, নিরখে বঁধুর বাট।
হেন কালে তথি, লইয়া সঙ্গতি, মিলল কানুর ঠাট॥" ইত্যাদি।

এইরূপে অট্টালিকার উপরে বসিয়া সখীগণ সহ শ্রীমতীর কৃষ্ণদর্শন পদকর্ত্তারা অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সখাগণ সহ খিড়কি দ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র মা যশোদা আরতি করিয়া বনগমন-জনিত অমঙ্গলাদি দূর করতঃ অপরাপর শিশুগণসহ দুই ভাইয়ের হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নানাবিধ ক্ষীর, সর, নবনীত খাওয়াইয়া ঘরে লইয়া গেলেন। এদিকে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে সখীগণ অতিসন্তর্পণে কিঞ্চিৎ সুস্থ করতঃ তাঁহাকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজী। তবে আমি আর কি বলিব? আপনার কথাতেই ত জানা গেল যে, মা যশোমতী যখন গোধূলি সময় রামকৃষ্ণের আরতি করেন, তখন শ্রীমতী অট্টালিকার উপরে মূর্চ্ছিতা। সখীগণ বহুবিধ

শুশ্রূষা দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ করতঃ তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আরতি করিলেন। এখন বুঝিয়া দেখুন, পূর্ব্বে কাহার আরতি হইল; কৃষ্ণের কি রাধিকার।

বিষ্ণুদাস। পর্য্যায়ক্রমে ধরিতে গেলে ত কৃষ্ণেরই আগে আরতি হয়; কিন্তু লোকপরম্পরায় আগে শ্রীমতীর আরতি কীর্ত্তন হইয়া আসিতেছে।

বাবাজী। এ লোকপরম্পরার কোন মূল্য নাই। তবে যদি গোস্বামিগণের কলমে বা তাঁহাদের স্মরণ-পদ্ধতিতে কোথাও লেখা থাকে যে, আগে শ্রীমতীর আরতি হইবে, তবুও বরং কথা হইতে পারে। লোকপরম্পরার কথায় আর একটি কথা মনে হইল। রাধাগোবিন্দকে যুগল করিয়া সন্ধ্যার সময় আরতি করা হয়; কিন্তু কীর্ত্তনের সময় প্রথমে রাধা-আরতি কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে গোপাল-আরতি কীর্ত্তনের সময় বলা হয় যে, "হরত সকল সন্তাপ জনমকো মিটত তলপ যমকালকি। গোঘৃত রচিত কর্পূরকি বাতি (ভাল নন্দরাণী সাজায়েছে) (গোপালের মঙ্গলের লাগি) বলুন দেখি, ইহাতে ব্রজ-উপাসনা বজায় রহিল কি? ইহাতে সম্পূর্ণ রসাভাস হইল না কি? ব্রজলীলায় প্রাণই পরকীয় ভাব। যদি সেই ভাবেরই অভাব ঘটিল, তবে উহাকে ব্রজলীলা না বলিয়া গোলোকলীলা বলিলেই ত হয়। অতএব উপাসনা করিতে গেলে অন্ধ বিশ্বাসী হইয়া শুধু লোকপরম্পরা দেখিলে চলিবে কেন? শাস্ত্র, যুক্তি, ভাব এবং রসও ত দেখা চাই। আর এক কথা এই যে, মাধুর্য্যভাবে ব্রজরসের উপাসকগণ রাধাগোবিন্দের সম্মুখে কীর্ত্তন ধরিলেন যে, "হরত সকল সন্তাপ জনমকো মিটত তলপ যমকালকি" যাহারা বৈকুণ্ঠাদি ত দূরের কথা; দ্বারকা মথুরা পর্য্যন্তও প্রার্থনা করেন না, এমনকি শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের বাক্য রহিয়াছে,—"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসাযুজ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" তাঁহাদের মুখে শ্রীরাধা-গোবিন্দের আরতি দর্শনফলে যমের তলপ নিবৃত্তির কথায় ব্রজরস বা মাধুর্য্যভাব রহিল কি? শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি আগে করা হয় না কেন শুনুন,—শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা অনুসারে দেখা যায়, অপরাহ্ণ-কালে তিনি বয়স্যগণ সঙ্গে নগর-ভ্রমণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে নিজগৃহে আসিয়া দেববন্দনাদি কার্য্যশেষ করতঃ প্রদোষে শ্রীবাস-অঙ্গনে আগমন করেন। যদি শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যা আরতি হয়, তবে প্রদোষ সময় (সন্ধ্যারপর) ছাড়া হইতে পারে না? গোধূলি আরতির পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের আরতি হইলে দুই দণ্ড বেলা থাকিতে করা দরকার। কারণ সন্ধ্যা বলিতে দুই দণ্ড সময়; অর্থাৎ দিবাদণ্ড ও রাত্রিদণ্ড। যখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ হন, সেই সময়কে গোধূলি সময় বলা হয়। ঠিক্ ঐ সময়টীতে গোপাল আরতি করা চাই। ইহার পূর্ব্বে গৌর-আরতি করিতে হইলেই দেখুন, দুইদণ্ড বেলা থাকিতে হইল কি না। যদি বলেন, বাড়ীতেই আরতি করা হইবে, তাহা হইলে আরতি কীর্ত্তনের যে পদ গাওয়া হয়, উহা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ বাৎসল্যময়ী মা শচীদেবীর এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মুখে ঐশ্বর্য্যের খেলা হইলে বিশুদ্ধ বাৎসল্য বা মাধুর্য্যের হানি হইল না কি? কারণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রতিপাদক শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজভবনে নানারূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও উহা জনকজননীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য-সাগরের অতল তলে ডুবিয়া যাইত। কাজেই এরূপ ঐশ্বর্য্যের খেলা শ্রীবাস-অঙ্গন ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে না। সাত প্রহরিয়া ভাব প্রভৃতি যাবতীয় আবেশ শ্রীবাস অঙ্গনেই হইয়াছিল। মায়ের নিকট ঐশ্বর্য্যাদিবিহীন, বিদ্যারসে মাতোয়ারা নিমাই পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কোন ভাবের প্রকাশ দেখা যায় না।

সুতরাং আমার মতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ধ্যা-আরতি শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রদোষ সময় করাই বিধেয়। আপনি আর একটি প্রশ্ন করিয়াছেন, "সন্ধ্যার সময় অভিসার মিলন কোথায় পাইলে?" আমি জিজ্ঞাসা করি, অন্তরঙ্গ সখীদিগের নিকট পূর্ব্বরাগবতী শ্রীমতীর উক্তি—"সাঁঝের বেলায় গিয়াছিলাম জলে। নন্দের নন্দন কানু, করে লৈঞা মোহন বেণু, দাঁড়াইয়া কদম্বের তলে।" ইত্যাদি শত শত পদে মহাজনগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সন্ধ্যাকালে সখীগণসহ যমুনায় জল আনিতে যাওয়া এবং পথে কৃষ্ণদর্শন, এ ত সর্ব্ববাদিসম্মত। কেহ স্মরণে কেহ বা কীর্ত্তনে আস্বাদন করিয়া থাকেন। তবে এই মিলনটী সংক্ষেপে মিলন। এমন কি, সময়ানুসারে কোনও দিন নয়নে নয়নেও হইয়া থাকে। এই জল আনার ছলে সায়ংকালে অভিসার, যুগল-আরতি এবং বাড়ীতে আসা এই তিনটী পদই নরহরি দাস ঠাকুরের।

বিষ্ণুদাস। বাবা! তোমার এরূপ রসানুসন্ধান এবং লীলানুভব দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। এতদিন পর্য্যন্ত কৈ আমাদের এজাতীয় অনুসন্ধান আসে নাই ত! আসিবে বলিয়া আশাও করিতে পারি নাই। শ্রীগুরুকৃপায় দিন দিন তোমার উন্নতি হউক এই প্রার্থনা করি। যতদিন এদিকে থাকিবে, হতভাগা কাকা বলিয়া যেন উপেক্ষা করিও না। কিছুদিন একসঙ্গে থাকিবার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিলে পূরণ হইতে পারে।

বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন প্রতিষ্ঠার আশায় লোকরঞ্জনমানসে প্রকৃত পথ ছাড়িয়া কল্পিত পথে না যাই।" এইরূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া ভগবত্তত্ত্ব-আলোচনায় পরমানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে এক মাস পাঁচ দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, কাহারও স্মৃতি নাই। মধ্যে মধ্যে সাতগাছিয়া, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে নাম-কীর্ত্তনের দল আসিয়া আনন্দের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিল। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়ও যেন কল্পতরু হইলেন। ঠাকুরের ভোগের পর ক্ষুধার্ত্ত লোক উপস্থিত হইলে প্রায়ই বঞ্চিত হইত না। অকাতরে মহাপ্রসাদবিতরণ করিতেন। দেখিতে দেখিতে উত্থান-একাদশী উপস্থিত হইল। পূর্ব্ববৎ অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এবারকার কীর্ত্তনানন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষভাবেই সম্পন্ন হইল। দ্বাদশীর দিন বাবাজী মহাশয় সগণে পূর্ব্ববৎ নগরভ্রমণান্তে বাড়ীতে আসিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন।

এইভাবে তিন দিন কাটিয়া গেল। আজ পূর্ণিমা—রাসমহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউকে ফুলসাজে সুসজ্জিত করা হইল। সন্ধ্যা আরত্রিক শেষ হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এদিকে নানা জাতি পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা নামব্রহ্মের চাঁদনী পূর্ব্বেই সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয় চারি পাঁচটী সঙ্গীয় বালককে সখীবেশে সাজাইয়া অভিসার কীর্ত্তন করতঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন করিয়া নৃত্যরাস গান করিতে লাগিলেন, আর বালকগণ নৃত্য করিতে লাগিল। যথায় শ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ এবং লীলা-গুণগান হইয়া থাকে, তথায়ই যে নিত্যবৃন্দাবন প্রকট, ইহা আজ সর্ব্বসাধারণের অনুভবগম্য হইতে লাগিল। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই—সকলেই যেন ভাবে বিভোর। বাবাজী মহাশয়ের দুইটী চক্ষু রক্তবর্ণ; এক একবার গানের পদ অনুসারে সখীবেশধারী বালকগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন, আবার উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে নাচাইতেছেন। এক একবার পদের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন।

বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় ঠিক বালকবৎ কখনও হাসিতেছেন, আবার কখনও বা প্রেমভরে কাঁদিয়া অধীর হইতেছেন। উপস্থিত জনসমূহ প্রায় সকলেরই এইরূপ অবস্থা। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্তি করা হইল। ভোগের পর সকলেই কিছু কিছু প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় সগণে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। এদিকে মহোৎসবের যোগাড় হইতে লাগিল। চারি পাঁচজন পূজারী রান্না করিতেছে। ধূমধামের সহিত মহোৎসব হইবে। বাবাজী মহাশয় বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন কাকা! ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও বাবু ভায়াদিগকে ত প্রতিবৎসরই খাওয়ান হইয়া থাকে। এ বৎসর দুঃখী, কাঙ্গালী এবং বালক-বালিকাদিগকে খাওয়াইলে ভাল হয় না কি?"

বিষ্ণুদাস। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই বাবা! কিন্তু যোগাড়-যন্ত্র করিয়া লওয়া চাই।

বাবাজী। সেজন্য চিন্তা নাই। নিতাইচাঁদই সব যোগাড় করিবেন।

এই বলিয়া নবদ্বীপ দাসকে বলিলেন, "দেখ, নবদ্বীপ! তোমার উপর বালকবালিকা এবং নিকটস্থ দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার রহিল।" বলিয়া অপরাপর সঙ্গী লোকদিগকে যথাযোগ্য কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কেহ কেহ গঙ্গাজল আনিতে লাগিল। কেহ কেহ চাউল ধুইতে—কেহ কেহ বা তরকারী অমনিয়া করিতে লাগিল। বহুলোকের চেষ্টায় অতি সত্বরই রান্না শেষ হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! আপনার নিমন্ত্রিত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়া অবশেষ আমাদের হাতে দিন। আমরা অপরাপর লোকদিগকে খাওয়াইয়া দেই। বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় তাহাই করিলেন। ক্রমে বালক-

বালিকা, দুঃখীকাঙ্গালী যত আসিতে লাগিল, বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া নিজেই অতি যত্নসহকারে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। বালকবালিকা ও দুঃখীকাঙ্গালীদিগকে প্রাণপণে আহার করান ইঁহার চিরকালের স্বভাব। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বালকবালিকাদের হৃদয় অতি কোমল এবং স্বচ্ছ। ইহাদের হৃদয়ে সংসারের কপট কুটীনাটী স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে ত সকলেই যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়া থাকেন। দুঃখী দরিদ্রদিগকে কয়জন আদর করে? আমার মতে যদি খাওয়াইতে হয়, তবে ইহাদিগকেই খাওয়ান দরকার।" ক্রমে সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর সঙ্গিগণসঙ্গে নিজে মহাপ্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

গুরপ যাত্রা।

রাত্রিপ্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্থানান্তরে যাইবার জন্য বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিলে তিনি সাশ্রুনয়নে ইঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আমি এ কয়দিন তোমার সঙ্গে যে কি সুখে ছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা যে, আরও কয়েকদিন তোমাদের সঙ্গে এইরূপ আনন্দে দিন কাটাই। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনি জানেন।"

বাবাজী। বাবা! আমারও ত সেইরূপ বাসনা। জানি না নিতাই-চাঁদ কি উদ্দেশ্যে মানসিক বৃত্তি একটু চঞ্চল করিয়াছেন। অতএব কয়েক দিন একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রভু করেন ত আবার আসিয়া একসঙ্গে আনন্দ করা যাইবে।

এই বলিয়া বিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সদলে সিদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের সমাধিস্থলে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে রওনা হইলেন। কোথায় বা কোন্ দিকে

যাইবেন, কিছুই ঠিক নাই। স্বচ্ছন্দগতি বাবাজী মহাশয় নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে গ্রামে যেদিন বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিতেছে, সেদিন সেই গ্রামে কীর্ত্তনানন্দে যাপন করিতেছেন। এইরূপে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া একদিন বেলা অনুমান দশটার সময় গুরপ নামক একটী গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও সহিত পরিচয় নাই; কিন্তু ইঁহার ব্যবহারে বোধ হইতে লাগিল, যেন কত কালের পরিচিত স্থান। কীর্ত্তন করিতে করিতে কোনও একটী ঠাকুর মন্দিরের নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনৈক গোস্বামী-সন্তান ঠাকুর-মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সংকীর্ত্তনে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন।

মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ; দর্শন করিয়া সকলেই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাধাবল্লভ জিউর মন্দিরে হঠাৎ খোল করতালযোগে সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে গ্রামবাসী স্ত্রীপুরুষ বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন ধরণের নৃত্য, নূতন রকমের কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক্। বাবাজী মহাশয় এক একবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে লক্ষ করিয়া নানারূপ পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন, আর মধুর নৃত্য করিতেছেন। ক্রমে বেলা অধিক হইল দেখিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিপ্রভুর আগ্রহে স্নানাদি করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক সকলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নে আবার বহুলোক সমবেত হইতে লাগিল। গোস্বামিপ্রভু এবং গ্রামবাসী অন্যান্য অনেকেরই ইচ্ছা যে, ইঁহারা অন্ততঃ কিছুদিন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর বাড়ীতে অবস্থান করেন। একব্যক্তি বাবাজী মহাশয়ের নিকট অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ইনি বলিলেন, "বাবা! জানি

না নিতাইচাঁদ কি খেলা খেলিবার জন্য এস্থলে আনিয়াছেন। আপনারা নিতাইচাঁদকে জানান। তাঁহার ইচ্ছা হইলে দাসের আর আপত্তি কি?”

এইরূপ নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হইলে ইঁহারা আরতি-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। সে রাত্রে কেহ প্রসাদ পাইলেন না। সকলেই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর বাড়ীতে রহিলেন। পরদিন প্রাতে প্রভাতী কীর্ত্তন শেষ করিয়া সেস্থান হইতে রওনা হইবেন, এমন সময়ে নবদ্বীপ দাস বলিল, “দাদা! চৈতন্যের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।” বাবাজী মহাশয় মৃদুহাসিয়া বলিলেন, “বলিহারি লীলাময় নিতাইচাঁদের খেলা!” পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিপ্রভু আসিয়া বলিলেন, “দেখুন, এইরূপ পীড়িত লোক লইয়া স্থানান্তরে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর আপনাকে কিছুদিন এইস্থানে রাখিবার ইচ্ছা হইয়াছে।”

বাবাজী মহাশয় “আচ্ছা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক” বলিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে স্নানাদি করিয়া মধ্যাহ্নকীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউর প্রসাদ পাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। প্রভুর কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন। একজন দুইজন করিয়া সঙ্গিগণ প্রায় সকলেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িল; কাজেই শীঘ্র স্থানান্তরে যাইবার সম্ভাবনাও রহিল না।

নবদ্বীপদাসের পুনর্জীবন ও বাবাজী মহাশয়ের জ্বর।

একদিন অপরাহ্নে জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী একজন পণ্ডিত আসিয়া অতি আগ্রহের সহিত সকলের হাত দেখিতে লাগিলেন। কয়েক জনের হাত দেখার পর নবদ্বীপ দাসের হাতখানা ধরিয়াই চমকিতভাবে

তাঁহার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে ভূমিতে নানারূপ অঙ্কপাতপূর্ব্বক হাতের রেখার সহিত মিলাইয়া বিশেষ নিবিষ্ট-ভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের হাতে ভাল মন্দ বিশেষ কি একটা আছে, উহা জানিবার জন্য সকলেই একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিছুকাল পরে পণ্ডিত মহাশয় একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হাত খানি ছাড়িয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম মহাশয়! উহার হাতে কিরূপ দেখিলেন?"

পণ্ডিত। আজ্ঞে, কথাটা আপনাকে একটু একান্তে বলিব।

বাবাজী। কেন, একান্তের প্রয়োজন কি? জগতে ভাল এবং মন্দ দুইটী বস্তু পরস্পর একত্র মিলিত। এটী স্বাভাবিক নিয়ম। আমার মতে বরং যাহার কথা, তাহার সম্মুখেই বলা ভাল। কোন সঙ্কোচতার কারন নাই; আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন।

পণ্ডিত। কি আর বলিব? আমার বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধারণায় আমি যতটুকু বুঝিলাম, তাহাতে এই বালকের পরমায়ুকাল অবশেষপ্রায়। যদি কোনরূপ প্রতিকারের সম্ভব থাকিত, আমি বলিতাম। কিন্তু একেবারে ভোগকাল অবসান; এইজন্যই আমি বলিতে একটু সঙ্কোচ করিতেছিলাম।

নবদ্বীপ একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে, এ ত আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। যিনি আমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি একজন বহুদর্শী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। তিনি ১৩০৩ সালের পৌষ মাসের প্রথমাংশে আমার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এমন কি, কোন্ ব্যাধিতে, তাহাও বলিয়াছেন।

পণ্ডিত। আমি যাহা বুঝিলাম, তাহাতে জ্বর এবং কাসি রোগে দেহত্যাগ হইবে।

নবদ্বীপ। ঠিক কথা। তিনিও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাতে আর দুঃখ কি বাবা? আমার ত আজ পরমানন্দের দিন। এমন সৎ-সঙ্গে থাকিয়া যদি আমার ন্যায় পতিত জীবের দেহ পতন হয়, তবে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সঙ্গিগণ কিন্তু এইসকল কথা শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন। কারণ সকলেই নবদ্বীপগতপ্রাণ। বিভিন্ন দেশীয় দুই পণ্ডিতেরই যখন পরস্পর একমত হইল, তখন অবিশ্বাসেরও কারণ নাই। কি উপায় হইবে ভাবিয়া সকলেই অস্থির। নবদ্বীপ কিন্তু পূর্ব্ববৎ আনন্দিত। এ কথাটা যেন তাহার পুরাণ কথা। বাবাজী মহাশয়ের যেন সম্পূর্ণ উদাস ভাব। কেহ নবদ্বীপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছেন, "আমি কি জানি? নিতাইচাঁদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই ঘটিবে। ও কথা লইয়া বৃথা আন্দোলন কেন? নাম কর। মঙ্গলময় যখন যাহা করিবেন, সবই মঙ্গলের জন্য।" দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপ অতি কাতর হইয়া পড়িলেন। জ্বর এবং কাসি ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। সকলেরই ধারণা যে, নবদ্বীপ এবার আর রক্ষা পাইবেন না। একদিন অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। এমন কি কথা বলিবার শক্তি রহিত হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে সকলে উহাকে ঘেরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ করযোড়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আরক্ত নয়নযুগল ছলছল করিতেছে, আর এক একবার "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া হুঙ্কার করিতে-ছেন। বেলা অনুমান দশটার সময় নবদ্বীপ দাসের নাড়ী স্থানচ্যুত হইয়া গেল—চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং ক্রমে স্পন্দনহীন হইয়া আসিল। সঙ্গি-গণ কাঁদিতে কাঁদিতে গদগদকণ্ঠে নাম করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় গোকুল এবং বিধুকে বলিলেন, উহাকে ধরিয়া বাহিরে নাও।"

তখন সকলে হতাশ প্রাণে ধরাধরি করিয়া নবদ্বীপকে বাহিরে আনিয়া বসাইলেন। নবদ্বীপের ঊর্দ্ধনেত্র—মাথা টলিয়া পড়িতে লাগিল। উচ্চকণ্ঠে নাম হইতেছে, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় গিয়া নবদ্বীপকে বুকে ধরিয়া দাঁড়াইলেন। বাবাজী মহাশয় কম্পিতকলেবর। পাছে পড়িয়া যান, এই ভয়ে গোকুল ইঁহার পশ্চাদভাগে দণ্ডায়মান। নবদ্বীপের মাথাটী ইঁহার বামস্কন্ধে অবস্থিত। সঙ্গিগণ আত্মহারাভাবে নাম করিতেছেন। সে সময়ের সেই নামের ধ্বনি একবার যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সেই ব্যাকুলভাবে আসিয়া নামে যোগ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের মুদ্রিত নয়ন উন্মীলিত হইল। ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক তুলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় উহাকে বুক হইতে ছাড়িয়া দিয়া ভাবভরে ঢুলিতে ঢুলিতে "বোল শ্রীনিত্যানন্দ, বোল শ্রীনিত্যানন্দ" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

আগন্তুক দর্শকবৃন্দ এই ব্যাপারদর্শনে একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সঙ্গিগণ ভাবোন্মত্ত। সকলেরই মুখে "বোল শ্রীনিত্যানন্দ" এই এক বুলি। চারিদিকে নামের রোল উঠিল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপকে আর একবার আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে তিনি নাচিতে লাগিলেন। তখন সকলের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। এইরূপে কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপকে বলিলেন, "রজে গড়াগড়ি দাও; নিতাইচাঁদ এ যাত্রা তোমায় রক্ষা করিলেন।" নবদ্বীপ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা। তুমি রাখিতেও পার, মারিতেও পার।" এই বলিয়া রজে গড়াগড়ি দিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেও দণ্ডবৎ প্রণাম

করিয়া কীর্ত্তনস্থলে বসিলেন।

তখন গোকুল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, পরমায়ু না থাকিলে কেহ বাঁচিতে পারে কি ?"

বাবাজী। আরে পাগল! ঘরে খাবার না থাকিলে লোকে ধার করিয়াও কি খায় না ?

গোকুল। পয়সা কড়িরই ধার চলে জানি। পরমায়ুও কি ধার চলিতে পারে ?

বাবাজী। নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে—কাঠের পুতুলও কথা বলে। সামান্য পরমায়ুর কথা কি ?

এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর সকলে স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। ঐ দিন রাত্রে হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের ভয়ানক জ্বর হইল। তিন দিন পর্য্যন্ত সমানভাবেই জ্বর রহিয়াছে; কিন্তু কোন ঔষধও খাইতেছেন না বা উপবাসও করিতেছেন না। একজন কবিরাজ পূর্ব্ব হইতেই সকলকে দেখিতেছেন এবং ঔষধাদি দিতেছেন। একদিন তিনি বাবাজী মহাশয়কে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "দেখুন, আপনি লঙ্ঘন না দিলে সহজে অসুখ ভাল হওয়া কঠিন। বাতশ্লেষ্মা জ্বর; কোনও ঠাণ্ডা দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন না।"

বাবাজী। তবে কি পথ্য করা যাইবে ?

কবিরাজ। সামান্য মিছরির সঙ্গে কিঞ্চিৎ বার্লি অথবা আদার সঙ্গে দুটী খই খাইলেই ভাল হয়। আর দুটী মহালক্ষ্মীবিলাস ও একটী জ্বরচিন্তামণি বড়ি দিয়া যাইতেছি। এখন জ্বর চিন্তামণিটী আদাপানের রস মধু দিয়া সেবন করুন এবং দুই ঘণ্টা পরে তুলসীপাতার রস মধু দিয়া একটী মহালক্ষ্মীবিলাস আবার বৈকালে আর একটী সেবন করিবেন। রাত্রে যদি জ্বর বেশী হয়, তবে আমাকে যেন খবর দেওয়া

হয়। বাবাজী মহাশয় "যে আজ্ঞে" বলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। তিনিও প্রতিপ্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। শ্রীশ্রীরাধা বল্লভ জিউর সেবক গোস্বামিপ্রভুরা বাবাজী মহাশয়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া এবং কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে গোকুল. বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "আজ্ঞে, জ্বরের ঔষধটা এখন যোগাড় করি।"

বাবাজী। ঐ বড়ি তিনটী একসঙ্গে কাগজে মুড়িয়া আমার মাথার কাছে রাখিয়া দাও।

গোকুল অগত্যা তাহাই করিল। বাবাজী মহাশয়ের জ্বরের সংবাদ পাইয়া ইহার শিষ্য কলিকাতা-নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নানা প্রকার ফল, আচার, মোরব্বা এবং পুরাতন ঘি প্রভৃতি লইয়া বেলা বারটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক গোস্বামিপ্রভু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! এ ফলমূল এখন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভকে ভোগ দেওয়া যাইবেনা। দুই চারিদিন পরে আপনি একটু সুস্থ হইলে ভোগ দেওয়া যাইবে।" ইনিও বেশ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "না বাবা! এখন কি ও সব ভোগ দেওয়া যাইতে পারে?"

যথাসময়ে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউর ভোগের পর বাবাজী মহাশয় গোকুলকে বলিলেন, "দুইটী মহাপ্রসাদ লইয়া আইস।" গোকুল প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিল বটে; কিন্তু ইঁহার অত্যাগ্রহে অগত্যা কিছু মহাপ্রসাদ আনিয়া দিলে ইনি মহাপ্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন। অপরাহ্নে গোকুলকে আদেশ করিলেন, "যোগেন যত রকম ফল আনিয়াছে, সব রকম কিছু কিছু প্রত্যহ রাত্রে নিকুঞ্জ-ভোগে দিবে। গোকুল. বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল। ইনিও প্রত্যহ-নিকুঞ্জ-ভোগের ফল প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে

দুইদিন যায়, তিন দিনের দিন ইঁহার বুকে অত্যন্ত বেদনা হইল—জ্বরও খুব বেশী হইল। দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন পুরাতন ঘি ও আকন্দ পাতার সেক দিয়া ফ্লানেল দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখা হইল সকলেই ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলে ইনি বলিলেন, "আচ্ছা, কাল যাহা হয় বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ক্রমে রাত্রি হইল। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে বলিলেন, "একজন মাত্র আমার কাছে থাক, আর সকলে অন্যত্র যাইয়া শয়ন কর। আমাকে কেহ ডাকাডাকি করিও না।" এই বলিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় বলিয়া উঠিলেন, "কে আছ?" উত্তরে গোকুল বলিল, "আজ্ঞে আমি আছি।"

বাবাজী। দেখ গোকুল! ঐ যে উপরে আচারের হাঁড়িদুটী আছে, উহা নামাও ত।

গোকুল হাঁড়িদুইটী নামাইয়া দেখে যে, একটীতে আম ও নেবুর আচার এবং অপরটীতে আমের মোরব্বা রহিয়াছে। গোকুল বলিল, "আজ্ঞে শরীর যে তত ভাল নয়।"

বাবাজী। আমার শরীর ভাল না থাকিলে কি হইবে? নিতাই-চাঁদের খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে ভোগ দাও।

এই বলিয়া বুকে বাঁধা ফ্লানেল খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিজহাতে আচার বাহির করিয়া একখানি থালায় সাজাইয়া দিলেন। গোকুল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ অগত্যা ভোগ দিতে বাধ্য হইল। ভোগের পর সেই সব আচার, সাত আটটা কমলা লেবু এবং অন্যান্য ফলমুল প্রসাদ যথেষ্টরূপে পাইলেন। ইঁহাকে ওরূপভাবে অত প্রসাদ পাইতে বোধ হয় আর কখন কেহ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ।

রাত্র প্রভাত হইল। সকলেই বিশেষ চিন্তিত আছেন। গতকল্য

যেরূপ অসুখ বাড়িয়াছে, তাহাতে আজ ডাক্তার না আনিলে কোন মতেই চলিবে না, এই পরামর্শ স্থির করিয়া সকলেই বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া দেখিলেন, সবই বীপরীত। তখন ইনি বলিলেন, "দেখ, আজ আমি স্নান করিব। আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে।" শুনিয়া সকলেই অবাক্! কবিরাজ মহাশয় আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করতঃ বলিলেন। "কাল নাড়ীতে বড়ই কফের প্রাধান্য দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। আজ নাড়ীতে এতই বায়ুর প্রাবল্য জন্মিয়াছে যে, ঠাণ্ডা ফলমূল প্রভৃতি ব্যবহার না করিলে চলিবে না। আপনি উত্তমরূপে স্নান করিতে পারেন. কোনই আপত্তি নাই। গোকুল এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; কিন্তু আর থাকিতে পারিল না বলিয়া উঠিল, "কবিরাজ মহাশয়! এ নাড়ীর গতি যে কিরূপ, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যে নিমোনিয়ার রোগী রাত্রে বারটার পর সাত আটটা কমলানেবু এবং আধ হাঁড়ি আম, কাগজীনেবু ও কুলের আচার, আধ হাঁড়ি আমের মোরব্বা এবং অন্যান্য যত রকম ঠাণ্ডা ফল আছে ব্যবহার করে, পরদিবস প্রাতে সেই রোগীর নাড়ীতে বায়ুবৃদ্ধি!" এই কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনারা যখন জীবের ভবরোগ খণ্ডন করিতে পারেন; তখন এ ত সামান্য দেহরোগ। আপনাকে চিকিৎসা করিতে আসা আমার নিতান্ত ধৃষ্টতা হইয়াছে। আমি আপনার সন্তান; আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় কবিরাজ মহাশয়কে কোল দিয়া বলিলেন, "বাবা! নিতাইচাঁদকে বল। আমি ত কাঠের পুতুল তিনি যখন যে ভাবে নাচাইতে ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে সেই ভাবেই নাচিতে হইবে।"

কবিরাজ। বাবা! আমরা ত অত দূর বুঝি না; কাজেই কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এইরূপ নানা কথোপকথনে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। বাবাজী মহাশয় রীতিমত স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বৈকাল বেলা গ্রামবাসী অনেক লোকের অনুরোধে নগরকীর্ত্তন বাহির করিলেন।

শ্রীশ্রীনিতাইএর বাড়ীতে কীর্ত্তন।

এই ভাবে আট দশ দিন যায়, একদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। প্রাণ-মাতান গগনভেদী সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে চারিদিক হইতে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বৃদ্ধ বহুলোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সম্মুখস্থ একটী ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন তথায় একটী প্রমান নিতাইবিগ্রহ রহিয়াছেন। উহার গলদেশে একগাছি আপাদ-বিলম্বিত কেলীকদম্ব ফুলের মালা শোভা পাইতেছে। বাবাজী মহাশয় নিতাইচাঁদের অপরূপ সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্যময় মুখচন্দ্র দর্শনে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ আত্মহারাভাবে উদ্দণ্ডনৃত্য করিতে লাগিলেন। আগন্তুক দর্শকবৃন্দ নূতন ধরণের কীর্ত্তন নর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবাজী মহাশয় নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিতাইচাঁদ! ঐ মালা গাছটীর উপর আমার বড় লোভ হইয়াছে! আমার মনে বাসনা হইয়াছে তোমার প্রসাদী মালাগাছটী গলায় পরিয়া তোমার সম্মুখে প্রাণভরিয়া নৃত্য করি।" এই কথা বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিতাইএর গলার মালা-গাছটী ছিঁড়িয়া চরণের উপর পড়িল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে মন্দিরাভ্যন্তরে কেহই নাই। কাজেই সকলে

অত্যন্ত বিস্মিতভাবে সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেবক আসিয়া পরম উৎসাহের সহিত ঐ প্রসাদী মালাগাছটী যেমন বাবাজী মহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন, অমনি চারিদিক হইতে গগনভেদী "হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইল। সঙ্গিগণ দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে টলিতে টলিতে পদ ধরিলেন ;—

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসা'ল অবনী॥
প্রেমবন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
নিতাই রঙ্গিয়া মোর প্রেম কল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু॥

গাহিতে গাহিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিতাই-দত্ত মালাগাছটীও সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মালাগাছটী নৃত্যকালীন সজোরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। উপস্থিত লোকসকল এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এ বাবাজীটী

সহজলোক নহেন; নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন; কারণ একবার বলিবামাত্রই নিতাইএর গলার মালাগাছটী ছিঁড়িয়া পড়িল! আবার দেখ মহাপুরুষটী নৃত্যকালে এক একবার মাটি হইতে প্রায় একহাত দেড়হাত উর্দ্ধে উঠিতেছেন; মালাগাছটীও যেন ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। কেলীকদম্বের মালা এত ভারী যে, অন্যের গলায় হইলে এতক্ষণ ছিঁড়িয়া আটখানা হইয়া যাইত।” ইত্যাদি যাহার যেরূপ অনুভব, সে সেইরূপ বলিতে লাগিল।

অনেকগুলি স্ত্রীলোক একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন এবং এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তন্মধ্যে আন্দাজ ষোল-সতের বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক একদৃষ্টে বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া ছিল এবং দুইটী চোখের জলে তাহার মুখ-বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। ক্রমে কীর্ত্তনের তালে তালে মাথাটী হেলাইয়া দোলাইয়া হাতে তালি দিয়া “হা নিতাই প্রাণ নিতাই” বলিতে বলিতে একেবারে কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া নাচিতে লাগিল। মেয়েটী যেন এরাজ্যে নাই! উহার উর্দ্ধনেত্র, আলুলায়িত কেশকলাপ, মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছে, লক্ষ্য নাই। দেখিয়া উপস্থিত স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। বিস্ময়ের কথাও বটে; কারণ এই স্ত্রীলোকটী অতি সুশীলা, মৃদু স্বভাবা ও লজ্জাশীলা। অনবধানতাপ্রযুক্তও নিজশ্বশ্রূ বা দেবর প্রভৃতি কেহ কখনও যাহার উচ্চ কথা শুনিতে বা অনবগুণ্ঠিত মুখ দেখিতে পায় নাই, সে আজ শত শত পরিচিত অপরিচিত, যুবা বৃদ্ধ, গুরুলঘু জনগণ মধ্যে উচ্চকণ্ঠে—“হা নিতাই প্রাণ নিতাই!” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্য করিতেছে। মেয়েটীর সম্পর্কিতা কোন কোন স্ত্রীলোক একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিতেছেন, “বাড়ী গেলে আজ উহাকে ইহার উচিত প্রতিফল দেওয়া যাইবে।” কেহ কেহ বা বলিতেছেন,

"আজকালকার মেয়ে! বাবা! সাহসের বালাই যাই। আমরা যে বুড়া হইতে চলিলাম, তবু কোনও অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে যাইতে বা কথা বলিতে সাহস পাই না।" আবার কেহ কেহ বা কত কি ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছেন। একটী বস্তুকে সকলে ভাল বলিতে পারে না বা একটি কার্য্য সর্ব্ববাদি-সম্মত হয় না। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" এই অলৌকিক ঘটনা দর্শনে কেহ কেহ রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের খেলা বা নামের শক্তি অথবা মহাপুরুষের প্রভাব মনে করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন; আবার কেহ কেহ বা বিরুদ্ধভাবে নিন্দা ও কটাক্ষ করিতেছেন। জনৈক ব্রাহ্মণ অনুমান চারি-পাঁচ বৎসরের একটি শিশু কোলে লইয়া প্রথম হইতে সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন। এবার তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "বৈরাগী বৈষ্ণবের অসাধ্য কিছুই নাই; অকার্য্য বা অখাদ্যও কিছুই নাই। এ মেয়েটী যদি আমার সম্পর্কিতা কেহ হইত, তবে আমি উহার এই প্রেমের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতাম।" ইত্যাদি ভাল মন্দ, নিন্দা-প্রশংসা ও দোষ-গুণসমালোচনা তটস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেই চলিতেছে। বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ বাহ্যানুসন্ধানরহিত; ভাবে বিভোর ও প্রেমে মাতোয়ারাভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছেন। এই সময় হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ বালকটী পিতার ক্রোড় হইতে নামিয়া একেবারে কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে গিয়া নাচিতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় একপাশে দাঁড়াইয়া নিতাইচাঁদের খেলা দেখিতে-ছিলেন। বালকটী কিছুক্ষণ নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পুত্রের নৃত্য দেখিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেছিলেন। হঠাৎ তাহার অচৈতন্য অবস্থাদর্শনে আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। অতি ত্রস্তভাবে পুত্রকে কোলে

ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিনীতভাবে বাবাজী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আমার ছেলেটীকে বাঁচাইয়া দিন। আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া নানারূপ নিন্দা করিয়াছি। আমার সেই পাপেই এইরূপ শাস্তি হইয়াছে। এবার বুঝিতে পারিলাম, আপনি সামান্য মানুষ নন।" বাবাজী মহাশয় ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শ্রবণে নানারূপ মিষ্ট বাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবাঠাকুর! ভয় কি? নাম করুন, আপনার ছেলে এখনই ভাল হইবে। ইহাকে সামান্য বালক বলিয়া মনে করিবেন না। কোনও মহাপুরুষ আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সংকীর্ত্তনে এ প্রকার ভাবাবেশ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনই চিন্তা নাই; প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাকুন।"

ব্রাহ্মণ। বাবা! কিরূপভাবে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, আমি ত কিছুই জানি না। আপনি আমায় বলিয়া দিন।

বাবাজী। বাবা! ধন্য কলিকাল। একমাত্র নাম ধরিয়া ডাকিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ব্রাহ্মণ। ভগবানের ত অনেক নাম, রূপ এবং অবতার রহিয়াছে। কি নাম ধরিয়া ডাকিলে এই বিপদ হইতে আশু পরিত্রাণ পাওয়া যায়, আপনি উপদেশ করুন।

বাবাজী। বাবা! কলিপাবনাবতার পরমদয়াল নিতাই গৌরই কলিহত জীবের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। অতএব প্রাণ ভরিয়া নিতাই গৌর নাম করিলেই কেবল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া কেন, সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে।

এই বলিয়া নিজেই "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে

রাম।" নাম ধরিলেন। সঙ্গিগণও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। তখন মেয়েটী অচৈতন্যা হইয়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ পুত্র কোলে লইয়া মুখে নাম করিতেছেন বটে; কিন্তু প্রাণে আর ধৈর্য্য মানিতেছে না। চোখের জলে তাঁহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে। "হা নিতাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন। ব্রাহ্মণের কাতরতা দর্শনে বাবাজী মহাশয় উঁহার কোল হইতে বালকটিকে গ্রহণপূর্ব্বক কর্ণে হরিনাম দিয়া যেমন বুকে ধরিলেন, অমনি সে চৈতন্যলাভ করতঃ ইঁহার কোল হইতে নামিয়া পিতাকে বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী এবং নামাপরাধী। ইঁহাদিগকে সামান্য মানুষ মনে করিও না। ইঁহারা এক একজন এক একটি মহাশক্তি ধারণ করেন। বিশেষতঃ তুমি যাঁহার উপর কটাক্ষ করিয়াছ, তিনি যে সে ব্যক্তি নন। আজ তোমাদের এমন কি এ দেশেরও পরম সৌভাগ্য যে, এই মহাত্মার চরণদর্শন পাইলে। ইঁহার যথার্থ-তত্ত্ব তোমাদিগকে আমি কি আর বলিব? ব্রজলীলারস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগোবিন্দ রাধা-ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই লীলারস আস্বাদন করিয়া জীবকে বুঝাইবার মানসে বলরাম অনঙ্গমঞ্জরী মিলিততনু শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রকটে উভয়ের লীলা উভয়ে সম্যক্ আস্বাদন করিতে না পারায় সেই দুই (নিতাইগৌরাঙ্গ) মিলিততনু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে বিহার করিতেছেন। ইঁহার চরণে শরণাপন্ন হও, কৃতার্থ হইবে।" বলিতে বলিতে বালকটী আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িল। বাবাজী মহাশয় পুনর্ব্বার বালককে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় কম্পিত কলেবরে ভীতভীত ভাবে গিয়া পিতার কোলে উঠিল।

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটীর ঘর্ম্মাশ্রুপুলকপরিব্যাপ্ত দেহযষ্টিখানি নিশ্চল নিস্পন্দভাবে ভূতলে পতিত রহিয়াছে। এক একবার তাহার ঈষদ্-বিকম্পিত ওষ্ঠাধরে যেন অভাব বা অভিমানজনিত কান্নার কালিমারেখা দেখা যাইতেছে। ক্ষণকাল পরেই আবার যেন মিলন জনিত সুখোচ্ছ্বাসে বিকসিত গণ্ডদ্বয় এবং ওষ্ঠাধরে মৃদুমধুর হাসির ছটা অবলোকনে দর্শকবৃন্দ পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। আহা মরি! কি অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ! কিবা অপরূপ মাধুরী। প্রেম দেশ-কাল, গুণ-গৌরব, বেশ-বয়স, জাতি-বিদ্যা, কুল-মান, স্ত্রী-পুরুষ এবং সময়-অসময় বিচার করিতে জানে না; বিশুদ্ধ হৃদয়-কাননে প্রেমময়ের প্রসঙ্গরূপ বসন্তসমাগম হইলেই বিকসিত হইয়া নিজ সৌগন্ধ্যে দশদিক্ আমোদিত করিয়া তোলে। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় স্ত্রীলোকটীর কর্ণে মন্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক "জয় শ্রীনিত্যানন্দ রাম" বলিয়া যেমন উচ্চ হুঙ্কার করিলেন, অমনি স্ত্রীলোকটী চকিতের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। তখন অবকাশ পাইয়া তাহার স্বভাবজাত লজ্জা, ভয়, মান, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে যুগপৎ ঘেরিয়া ফেলিল। অমনি সে শশব্যস্তে উঠিয়া মাথায় কাপড় দিয়া অপ্রতিভের ন্যায় আস্তে আস্তে সঙ্গিণীগণের সহিত মিলিতা হইল। তখন সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

আজ যে স্থানে অন্ততঃ দুইজন লোক একত্র হইতেছে, সেই স্থানেই বালকটী ও স্ত্রীলোকটীর কথা লইয়া নানারূপ আন্দোলন চলিতে লাগিল। বালকের কথায় যেন সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। এই হইতে গুরপ গ্রামবাসী বহুসংখ্যক লোকেরই বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ ভক্তিভাব জন্মিল। সেদিন নিতাইএর বাড়ীতেই ইঁহাদের মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইল। এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

নবদ্বীপে প্রত্যাগমন।

একদিন বাবাজী মহাশয় প্রভাতে উঠিয়াই নবদ্বীপ প্রত্যাগমন মানসে তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট বিদায় চাহিলে সকলেই আর কিছুদিন গুরপে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীধামের আকর্ষণ এরূপ প্রবল হইল যে, কেহই বাধা দিতে পারিলেন না। অগত্যা সেইদিন তথায় থাকিয়া পরদিবস অতি প্রত্যুষেই শ্রীধাম নবদ্বীপাভিমুখে রওনা হইলেন। যাইবার সময় যে যে রাস্তা দিয়া গিয়াছেন, আসিবার সময় সে রাস্তায় না আসিয়া অন্যদিক্ দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে প্রায় অনেকেরই শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল; কিন্তু মানসিক অবস্থা নিত্য নব নবায়মান। শ্রীধাম আসিবামাত্র সকলের প্রাণে দ্বিগুণতর উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুইবেলা নগর-কীর্ত্তন। অবশিষ্ট সময় পাঠ এবং নামসংকীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীর সহিত মিলন।*

শ্রীযুক্ত গৌরহরিদাস বাবাজী মহাশয়ের ভেকের শিষ্য শ্রীযুক্ত রাধা-রমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান কালে প্রায়ই "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গলি গলি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই সময় নবদ্বীপবাসী অনেক লোকও ঐ নাম করিয়া তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত।

*শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীনাথ গোস্বামী নামক জনৈক মহাত্মা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

বাবাজী মহাশয় অতি দীর্ঘাকার, চতুর্হস্তপরিমিত-দেহ, পরম প্রেমিক ও অদোষদর্শী। কখনও কেহ তাঁহার নিকটে পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করিতে গেলে উহা তাঁহার নিকট অতিশয় অপ্রীতিকর হইলেও পাছে সে প্রাণে ব্যথা পায়, এই বলিয়া তিনি "বাবা! সর্ব্বদা নিজের দোষ স্মরণ রাখা উচিত। তোমাকে ত ভগবান্ বিচারক করিয়া পাঠান নাই" ইত্যাদিরূপে সুমিষ্ট বাক্যে এমনভাবে প্রবোধ দিতেন যে, সে ব্যক্তি জীবনে আর কখনও সেরূপ কাজ করিত না। তিনি অবিচারে আবালবৃদ্ধযুবক সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহার সেই প্রেমময় আলিঙ্গন, হাসিমাখা সুমধুর কথা এবং সুধামাখা সঙ্গ-সুখ যে একবার অন্ততঃ ক্ষণকালও উপভোগ করিত, সে জন্মের মত তাঁহার কেনা হইয়া যাইত। জীবনে মরণে সে আর সেই আনন্দময় মুখখানি বিস্মৃত হইতে পারিত না। নবদ্বীপবাসী প্রায় অনেকেই তাঁহার প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। বালকবালিকাগণ তাঁহার এতই বাধ্য ছিল যে, তিনি যখন রাস্তায় বাহির হইতেন, তখন উহারা মাতাপিতার শাসনবাক্য অতিক্রম করিয়াও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইত এবং পরমানন্দে নাম করিতে করিতে নৃত্য করিত।

এই সময় মহাত্মা অবধূত শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামীজি মহারাজ নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়ায় বাস করিতেছিলেন। আমি, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মদাস রায়, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমরা কয়েকজন স্বামীজির শিষ্য হইলেও নামকীর্ত্তনে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বড়ই আনন্দ পাইতাম বলিয়া প্রায় অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তিনি আমাদের মুখে স্বামীজির ভাবাবেশ প্রভৃতির কথা অবগত হইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ

আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কয়েকদিন যায়, হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় নাম করিতে করিতে স্বামীজি যে ঘরে বসিয়াছিলেন, একেবারে সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাতামাতি কীর্ত্তন—সকলেই উন্মত্ত—কাহারই দেহস্মৃতি নাই। স্বামীজি এবং বাবাজী মহাশয় উভয়েই যেন মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় এক একবার হুঙ্কার গর্জ্জন করিতেছেন। আমরা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক্! জানি না, কাহার শক্তিবলে উপস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকসকলও প্রেমে বিভোর! সকলেই আজ আনন্দে মাতোয়ারা! সকলেই নাম করিতেছেন, আর হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। তন্মধ্যে কালিদাস বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, শ্রীনাথ গোস্বামী, দেবেন বাবু, রঘুনাথ বাবু, হরেন বাবু, প্রিয় বাবু, চক্রপাণি প্রভৃতি কয়েকজন একটু বিশেষভাবে মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন। সকলেরই চোখে জল—সকলেরই অঙ্গে পুলক—সকলেই অসামাল। কে কাহাকে দেখে? বাবাজী মহাশয় এবং স্বামীজি মহারাজ উভয়েই ভাবাবিষ্ট—উভয়েই সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত—উভয়েরই অঙ্গে সময় সময় এরূপ কম্প উপস্থিত হইতে লাগিল যে, দেখিয়া আমরা বিস্মিত। উভয়ের চোখের জলে উভয়ে অভিষিক্ত হইতেছেন। এক একবার দুইজনে এমনই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেছেন যে, দেখিয়া শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। দুইজনেরই চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত; কিন্তু ক্রিয়াসকল এক প্রকার।

ক্ষণকাল পরে হাত ধরাধরি করিয়া মত্ত মাতালের ন্যায় নাচিতে নাচিতে দুইজনে ঘরের বাহির হইলেন। সঙ্গিগণ আমরা সকলেই বাহিরে আসিলাম। হঠাৎ ভাবভরে স্বামীজির চৈতন্যরহিত হইয়া গেল। পাছে ভূমিতলে পতিত হয়েন, এই ভয়ে দেবেন বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয়েরও

তদ্রূপ অবস্থা। স্বামীজির কণ্ঠদেশে বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত এবং বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠদেশে স্বামীজির বামহস্ত সংলগ্ন। উভয় দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ। যেন কয়েকটী ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত দুইটী কাঠের পুতুল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহা মরিমরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! যেন সাক্ষাৎ নিতাইগৌর মূর্ত্তিমান্ হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়াছেন। ধন্য সেই শুভ মুহূর্ত্ত—ধন্য সেই রাত্রি—ধন্য উভয় মহাত্মার সঙ্গিগণ—ধন্য সেই সকল দর্শকমণ্ডলী। আজ আমিও ধন্য; কারণ আমার ন্যায় অবিশ্বাসী ঘোর পাষণ্ডই বা কোথায়, আর এই অপূর্ব্ব শুভ সম্মিলনই বা কোথায়? ধন্য মহাপুরুষের সঙ্গমাহাত্ম্য!

হঠাৎ স্বামীজি মহারাজ অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক দক্ষিণ উরুদেশে বাবাজী মহাশয়কে বসাইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "ভাই চরণদাস! তুমি পূর্ণ নিত্যানন্দ শক্তি! তুমি সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণ দেশে গমন করিয়া ঘোর পতিত, পাষণ্ডী, নাস্তিক, কুতর্কনিষ্ঠ, উপধর্ম্মপরায়ণ জীবসকলকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি দান কর। তোমা ভিন্ন জীব-উদ্ধারের আর উপায় নাই। বিনয়ের খনি, দৈন্যের মূর্ত্তি, তৃণাদপি নীচাভিমানী বাবাজী মহাশয় সাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দাদা আপনি শক্তিসঞ্চার করুন। আপনাদের কৃপাকটাক্ষে কাষ্ঠের পুত্তলিকা নাচিতে সমর্থ হইয়া থাকে। জীব-উদ্ধার ত সামান্য কথা। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, জগবাসী মায়ামুগ্ধ ত্রিতাপতাপিত জীবসকল নামরসে বিভোর হইয়া প্রেমবন্যায় ভাসিয়া যাউক। ম্লেচ্ছ, যবন, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত প্রেমানন্দ-পূর্ণহৃদয়ে "হা নিতাই গৌরাঙ্গ" বলিয়া অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদুক। দেখিয়া শুনিয়া মনের সাধ মিটাই—জীবন ধন্য মনে করি।"

বলিতে বলিতে ইঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দুইজনকে বুকে ধরিয়া দুই জনের কান্না আর থামে না। অতি গম্ভীর দুইটী মহাপুরুষ আজ ভাবে অধীর হইলেন। এই মহা ভাবসাগরের অন্তস্তলে প্রবেশ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। পরস্পর পরস্পরকে বড় করা মহাপুরুষদের স্বাভাবিকী বৃত্তি। এ বিষয় লইয়া সমালোচনা করা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম বই আর কিছুই নহে।

ক্ষণকাল পরে উভয়েই একটু স্থির হইলেন। ইত্যবসরে আমাদের বড় পিসীমা* একথালা ঘরে-ভাজা গরম গরম টাট্‌কা জিলিপী স্বামীজির হাতে দিলেন। স্বামীজিও এক একখানি করিয়া নিজে খাইতে খাইতে অর্দ্ধাংশ বাবাজী মহাশয়ের মুখে এবং অপর একখানি বাবাজী মহাশয়ের মুখে দিয়া তদর্দ্ধাংশ নিজে খাইতে লাগিলেন। এইরূপে ভোজন করিতে করিতে এক একখানা ভক্তবৃন্দকে দিয়া বলিতেছেন, "নে রে দেওয়া নেওয়া প্রসাদ কে পাবি?"

মহাপুরুষগণ সর্ব্বদা আনন্দ ময়। যখন যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আনন্দই তাঁহাদের চিরসঙ্গী—আনন্দই তাঁহাদের প্রাণ—আনন্দই তাঁহাদের উপজীবিকা। দেখিতে দেখিতে উভয়েই সম্বন্ধরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। আর দৈন্যভাব নাই; এক্ষণ পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল-কামনায় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বামীজি বাবাজী মহাশয়ের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ।" বাবাজী মহাশয়েরও ঐ বুলি। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় নিজের পদধূলি লইয়া স্বামীজির বক্ষঃস্থলে দিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি কিছুদিন জগতে থাকিয়া জগতের উপকার কর।"

* স্বামীজি মহারাজের জ্যেষ্ঠা গুরুভগিনী।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। সেইদিনকার ভাব, প্রেম ও আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রকাশ করিলাম।

শিবরাত্রি।*

আজ শিবচতুর্দ্দশী। চারিদিকে মহা ধূমধাম। বালকগণ পুষ্প, বিল্বপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার মানসে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। হাটে বাজারে, ঘাটে মাঠে কেবল পুষ্প-বিল্বপত্র ও ফুলের ছড়াছড়ি। সকলেরই মুখ শুষ্ক; কিন্তু আনন্দময়। আজ সকলেই নানাবিধ উপহারে ভোলানাথকে ভুলাইতে চেষ্টিত। সকলেই উপবাসক্লিষ্ট দেহদ্বারা আশুতোষের সন্তোষবিধানের জন্য ব্যস্ত।

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় সদলে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই ভুবনমঙ্গল জগৎ-মাতান নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পোড়া মা তলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে মাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরে মায়ের নিকট কত আব্দার—কত কান্নাকাটি করিয়া যেন বাবার নিকট যাইবার আদেশ পাইলেন। অমনি চরণে চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে বুড়োশিব তলার দিকে ছুটিলেন। যাইবার সময় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হরিসভায় গিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে চারিটার সময় বাবা বুড়োশিবের নিকট উপস্থিত হইয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি,

* এই ঘটনাটীও আমরা উক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি।

উমেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, মাধবচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যেন একটু কটাক্ষভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওহে বাবাজী! আজ শিবরাত্রি। একটু মহাদেবের নাম কর না বাবা!" বাবাজী মহাশয় করযোড়ে "যে আজ্ঞা বাবা!" বলিয়া নাম ধরিলেন, "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। গৌরীশঙ্কর সীতা রাম॥" এই ধুয়া ধরিয়া ক্রমে নানারূপ পদ গাহিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে সেই পদগুলি ধারণা করিয়া রাখে? দুই একটী পয়ার যাহা মনে ছিল, তাহাই লিখিলাম:—

জয় শিবশঙ্কর ত্রিজগত-গুরু।
করুণা বিতর হর বাঞ্ছা কল্পতরু॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য তুমি ভুবনে বিদিত।
বৈষ্ণবী-মায়াতে যেন না হই মোহিত॥
জ্ঞানদাতা বলি তোমায় বলে সর্ব্বজন।
আত্মতত্ত্বজ্ঞান মোরে কর বিতরণ॥
নারী মাত্রে মাতৃসম জ্ঞান কর দান।
পরদুঃখ দেখি যেন আপন সমান॥
স্থাবর জঙ্গম জীবে গুরু করি মানি।
নিজদেহে দীনজ্ঞান দেহ শূলপাণি॥
কৃষ্ণ প্রভু মুঞি দাস এই জ্ঞান দেহ।
গুরুবাক্যে কভু যেন না হয় সন্দেহ॥
কাম ক্রোধ আদি রিপু নাশি গঙ্গাধর।
ভকতি বিশ্বাস জ্ঞান সন্তানে বিতর॥

ইত্যাদি কত কত পদ যে গাহিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব যতলোক সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন,

সকলেই বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনিয়া স্তম্ভিত। সকলেই প্রেমে গরগর। তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি প্রভৃতি যাঁহারা বাবাজী মহাশয়কে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের সংকীর্ণ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু যেন এ রাজ্যে নাই। চিত্রপটে শিবনেত্র দেখিয়া আমার মনে হইত যে, এরূপভাবে চক্ষু রাখা মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য; আজ আমার সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় শিবনেত্রবৎ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া দক্ষিণ হস্তখানি উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বক্রভাবে দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর তেজঃপুঞ্জ-পরিপূর্ণ বিশাল দেহখানির ভর রাখিয়া নাচিতে নাচিতে "শিবরাম, শিবরাম" শব্দে এক একবার এমনই হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন দেবাদিদেব ত্রিপুরারি শঙ্করদেব আজ ইঁহার দেহে আবির্ভূত হইলেন। আপাদমস্তক পুলকাবলী-বিভূষিত দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন একটী শিমূলবৃক্ষ নাচিতেছে। এক একবার হুঙ্কার দিয়া এরূপভাবে কম্পিত হইতেছেন যে, দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হইতেছে। প্রায় চারি ঘণ্টাকাল এইরূপভাবে কাটিয়া গেল। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার মাত্র হইয়াছে। তখন রজে গড়াগড়ি দিয়া আবার "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। গৌরীশঙ্কর সীতা রাম॥" এই নাম করিতে করিতে সেস্থান হইতে গঙ্গাতীরাভিমুখে রওনা হইবেন, এই সময় তারাপ্রসন্ন চূড়ামণি, উমেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত, বাবাজী মহাশয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আজ আমরা ধন্য হইলাম। তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর এরূপ শক্তি দিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বে না জানিয়া তোমাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়াছিলাম। সেজন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি

তুমি বাবা! আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইও না।” বাবাজী মহাশয় করযোড়ে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “আজ্ঞে আমি নিতান্ত অযোগ্য। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের পাদপদ্মে আমার মতি থাকে। আমি কাঠের পুতুল। আপনারা যখন যেমন নাচান, তখন তেমনই নাচি। শাস্ত্রাদি জ্ঞান ত আমাদের কিছুই নাই।

চূড়ামণি। বাবা! আমাদের বিশ্বাস, তোমারই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছে। কারণ যখন দ্বেষবুদ্ধি নাই, তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে বা হইয়াছে। তোমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত কেহ করে না।

বাবাজী। বাবা! দেবতাকে দ্বেষ করা ত দূরের কথা! আমাদের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মত এই যে ঈর্ষা, দ্বেষ হিংসা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি যে হৃদয়কে স্পর্শ করে, সে হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেম আসা ত দূরের কথা, ভক্তিদেবী তাহার নাম শ্রবণ মাত্র ভীতা হইয়া দূরে পলায়ন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥
সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সবার নিকট মেগে লবে ইষ্টভক্তি বর॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম কেন বাবা! ধর্ম্মপদবাচ্য পদার্থে কখনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার আলোককে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ নিত্য সত্য ধর্ম্মবস্তুতে অনিত্য অসত্য দোষ সংশ্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব। তবে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেটী ব্যক্তিগত—ধর্ম্মগত নয়।

শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিতচিত্তে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন বাবাজী মহাশয়ও নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে মহাসংকীর্ত্তন।*

আজ সূর্য্যগ্রহণ। মহা হুলস্থুল ব্যাপার। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক যাত্রিগণ গ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নান এবং ধামদর্শনমানসে নবদ্বীপে আসিয়াছে। কেহ কাচে কালী মাখাইয়া, কেহ কেহ বা কাল পাথরে জল রাখিয়া এবং কেহ কেহ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদির সাহায্যে সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতেছে এবং সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণকাল প্রতীক্ষা করিতেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রীপুরুষ সকলেই মহাব্যস্ত। কেহ পুরশ্চরণ মানসে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। কেহ কেহ বা গ্রহণকালে দান করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া গঙ্গাতীরে যাইতেছেন। কেহ বা হোম করিবার মানসে তদুপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিতেছেন। যাজক ব্রাহ্মণগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যজমান সংগ্রহ করিতেছেন। কীর্ত্তনীয়াগণ গ্রহণকালের প্রতীক্ষায় খোলকরতাল লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। ভিখারীগণ ঘাটের দুই পার্শ্বে কাপড় বিছাইয়া বসিয়া আছে। দোকানীগণ দানের উপযোগী নানাবিধ বস্তু লইয়া দোকান সাজাইতেছে। যে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত, সেও আজ ব্রাহ্মণ বা মা গঙ্গাকে কিছু না কিছু দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সময়ে আমি বেড়াইতে বেড়াইতে আমপুলিয়া পাড়ায়

* এই ঘটনাটী নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামীজি মহারাজের আশ্রমে যাইয়া দেখি যে, অনেকগুলি লোক স্বামীজিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু স্বামীজি বলিতেছেন, "তোমরা যাও, আমি আশ্রমে থাকি।" মহাপুরুষের হৃদয়ের গূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিবে? হঠাৎ আমাকে দেখিবামাত্র অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, "দাদা! গ্রহণোপলক্ষে স্বামীজিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে পারিলে বড়ই আনন্দ হইত। কিন্তু স্বামীজি কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। আমাদের বিশ্বাস, আপনি একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে।" আমিও তাহাদের কথা শুনিয়া অতিশয় উৎসাহ সহকারে স্বামীজিকে বলিলাম, "দেখুন, আপনি একটু গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলে যদি অনেক লোকে সুখ পায়, তবে আপনার আপত্তি কি? চলুন, যাইতেই হইবে।" বলিয়া হাত ধরিবামাত্র তিনি ঠিক বালকের ন্যায় উঠিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে রওনা হইলেন। যাইতে যাইতে ক্রমে আমরা সকলে ষ্টীমারঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনকার ষ্টীমার ষ্টেশন-মাষ্টার কালীপ্রসন্ন বাবু স্বামীজির শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বামীজিকে দেখিবামাত্র বিশেষ আগ্রহ সহকারে ষ্টেশন ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন। আমিও তাঁহার পার্শ্বে একটী চেয়ারে বসিয়া "হরি বল হরি বল হরি বল ভাইরে। হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাইরে।" এই পদটী হাতে তালি দিয়া আস্তে আস্তে গাহিতেছিলাম। অপরাপর সঙ্গিগণ ঘরের বাহিরে বসিয়াছিলেন। এই সময় হঠাৎ এক জন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "গ্রহণ লাগিয়াছে।" শুনিবামাত্র স্বামীজি ও আমি উভয়ে বাহিরে আসিলাম। যে পদটী আমি গাহিতেছিলাম, অন্য কয়েকজন ভক্তও আমার সঙ্গে সেই পদটী গাহিতে ছিলেন। আমি

গঙ্গাতীরে পূর্ব্বোক্ত নিমগাছটী ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, রাজেন দাদা* একাকী গঙ্গাতীরস্থ রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে আমাদের দিকে আসিতেছেন। ক্রমে নিকটে আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম, আজ যে কীর্ত্তন ছাড়া একাকী?"

রাজেন দাদা। হ্যাঁ ভাই! কেন যেন আজ আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তাই একাকীই বেড়াইতেছি।

আমি। তবে এইখানেই কীর্ত্তন হউক না কেন? স্বামীজিও রহিয়াছেন।

রাজেন দাদা। নিতাইচাঁদ কি ভাবে নাচাইবেন, তিনিই জানেন।

বলিয়া পূর্ব্ববৎ বরাবর শ্মশানঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও আমাদের পূর্ব্বোক্ত নামই চলিতেছিল। তিনি আসিয়াও ঐ নামই ধরিলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে গাহিতে লাগিলেন এবং অপর সকলে তাঁহার দোহারকী করিতে লাগিল। বলিতে কি, শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যবর্ত্তী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নাম ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। এই সময় উত্তর দিক্ হইতে দশবার জন লোক খোলকরতাল যোগে "নিতাই বল গৌর বল হরি বল ভাইরে। নিতাই চৈতন্য বিনে আর গতি নাইরে॥" এই নাম করিতে করিতে যেমন ইঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি ঠিক চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এক অপূর্ব্ব খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে চারিদিক্ হইতে যতই নাম-সংকীর্ত্তনের দল আসিতে লাগিল, সকলেই ঐ কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে

* ইঁহার গুরুদেব ইঁহাকে যাদব দাস, সর্ব্বসাধারণে চরণদাস এবং উপর পাড়ার সকলে রাজেন বাবু বলিয়া ডাকিতেন।

প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিমগাছটী ঠেস্ দিয়াই সেই অপূর্ব্ব রহস্য দেখিতেছিলাম। স্বামীজি ও রাজেন দাদা উভয়েই সেই মহাসংকীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থলে প্রেমভরে নৃত্য করিতেছিলেন। লোকে লোকারণ্য। কত খোলকরতাল যে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। যুগপৎ সহস্রকণ্ঠে হরিধ্বনিতে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। রমণীগণের উলুধ্বনি ও ভক্তগণের মনপ্রাণমাতান জয়ধ্বনি ও খোলকরতালের ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইতে লাগিল। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর—সকলেই আত্মবিস্মৃত—সকলেই মহাপুরুষদ্বয়কে ঘেরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। সকলেরই অঙ্গ ধূলিধূসরিত। দূর হইতে কাহাকেও লক্ষ্য করা সুকঠিন। আমি কিন্তু পূর্ব্ববৎ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে সেই মহাসংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর প্রতি চাহিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শত সহস্র লোকের মস্তক ভেদ করিয়া রাজেন দাদার মস্তক প্রায় বিতস্তি প্রমাণ উর্দ্ধে শোভা পাইতেছিল। সূর্য্যদেব যতই অধিক পরিমাণে গ্রহগ্রস্ত হইতেছেন, রাজেন দাদার দেহ হইতে ততই তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখখানি এরূপ রক্তিমাকার ধারণ করিতেছে যে, দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করা সুকঠিন হইতেছে। পাঁচ সাত দশজন একসঙ্গে ভাবভরে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছে। অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে ধরিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে। অগস্তক বালকগণ তাহাদিগকে শুশ্রূষা করিতেছে। অপর দিকে বহুমূল্য বসনভূষণে বিভূষিতা কৃষ্ণনগর-নিবাসিনী পরমাসুন্দরী রাববিলাসিনীগণ ভাববিগলিত নেত্রে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ভাবভরে অচৈতন্য ব্যক্তিদিগের নয়নজল মুছাইয়া বাতাস করিতেছে। কেহ কেহ বা বহুমূল্য উত্তরীয় বসনে ভাবাবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ধূলিধূসরিত

অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া বাতাস দিতেছে। আবার কেহ কেহ বা তাহাদের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছে। কি পবিত্র ভাব! আত্মপর, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নাই। সকলেই সুপবিত্র নামসাগরে ডুবিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছে। সকলেরই হৃদয় অপ্রাকৃত ভাবভরে এরূপ কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যেন মহাভাবস্বরূপিণী কোমলহৃদয়া করুণাময়ী বৃষভানুনন্দিনী কায়ব্যূহরূপে প্রতিদেহে অবস্থান করিতেছেন। আমরা অনেক সময় নবদ্বীপে অনেক-বার সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছি। অনেক মহাত্মার কীর্ত্তনও শুনিয়াছি; কিন্তু রাজেন দাদার ন্যায় এরূপ তন্ময়তা, এত আকর্ষণ, এত আত্মবিস্মৃতি কেহ কখনও করিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, আমি আমার জীবনে নামসংকীর্ত্তনে একসঙ্গে এত লোক এবং এত খোলকরতাল একত্র মিলন কখনও দেখি নাই। আর একটী অশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রহণের অবস্থিতিকাল চারি ঘণ্টা। এতকাল ব্যাপিয়া একভাবে নামকীর্ত্তন চলিতেছে; কিন্তু কাহারও ক্লান্তি বোধ নাই। সচরাচর কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর উদ্যম হ্রাস হইয়া আসে। কিন্তু এ যেন ক্রমেই উদ্যম বাড়িতে লাগিল। আমার কথা ভাবিয়াই আমি বিস্মিত; কারণ একভাবে চারি ঘণ্টাকাল স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সূর্য্যদেব পূর্ণগ্রস্ত হইলেন বটে; কিন্তু নামরূপ সূর্য্যের আলোকে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইল। সূর্য্যদেব পূর্ণরূপে গ্রহগ্রস্ত হওয়ায় গগনে শ্রীহীন তারকামণ্ডলী দর্শনে আমার মনে হইতে লাগিল যেন উহারা রাজেন্দ্র-মুখচন্দ্র বিগলিত নাম সুধাপানে পরিতৃপ্ত শত সহস্র ভক্তরূপ নক্ষত্রমণ্ডলীর উজ্জ্বলতা দর্শনে নিজ নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছে। নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে যেমন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, অমনি স্বামীজি মহারাজ ও রাজেন দাদা

উভয়েই প্রেমবিহ্বলভাবে বাৎসল্যময়ী মা জাহ্নবীদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সকলেই ইঁহাদের অনুকরণ করিল। মাও যেন এতক্ষণ সতৃষ্ণনয়নে স্থিরভাবে সন্তানগণের অপরূপ প্রেমনৃত্য দেখিতেছিলেন; হঠাৎ পরিশ্রান্ত সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দভরে উত্তাল তরঙ্গময়ী হইলেন। প্রেমোন্মত্ত সন্তানগণ মায়ের কোলে গিয়াও স্থির হইতে পারিলেন না। জলে আবার একপ্রকার নূতন ভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। একজনকে মধ্যে রাখিয়া দশ বার জন মণ্ডলীবন্ধনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপভাবে শত শত দলে নৃত্য ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে হঠাৎ সকলেরই যেন চমক ভাঙ্গিল। দোকানীর দোকানের কথা, গৃহস্থের বাড়ীঘর ও স্ত্রীপুত্রাদির কথা, যাত্রিকদিগের টাকাকড়ি ও জামা-কাপড় প্রভৃতির কথা যেমন মনে পড়িয়া গেল, অমনি শশব্যস্তে তীরে উঠিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। স্বামীজি ও আমরা ভিজা কাপড়েই বাড়ীতে আসিলাম। আমার জীবনে এরূপ আনন্দ আমি আর কখনও উপভোগ করি নাই—করিব বলিয়া আশাও খুব কম।

রামদাসের সহিত মিলন।

একদিন অপরাহ্নে বাবাজীমহাশয় গোবিন্দদাস মহান্তের* আখড়ায় বসিয়া আছেন। সঙ্গে নবদ্বীপ দাদা এবং আর দুই একটী সঙ্গী রহিয়াছেন। মহান্তের সহিত নানারূপ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ হইতেছে, এই সময় হঠাৎ চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স্ক একটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বালক

*নবদ্বীপে পালগোবিন্দ বলিয়া বিখ্যাত।

আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দূর হইতে বালকটীকে দেখিবামাত্র সকলেই যেন উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হঠাৎ নবদ্বীপদাদা উঠিয়া বালকটীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকটে লইয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয় উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নবদ্বীপদাদা বলিলেন, বালকটী অল্পদিন হইল শ্রীধামে আসিয়াছে। ইহার নাম **রামদাস।** ফরিদপুর-নিবাসী মহাত্মা জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্যের অনুগত। সম্প্রতি ইহারা হরিসভায় আছে। এ বালকটী বড়ই অনুরাগী। নিতাইচাঁদ নামসংকীর্ত্তন বিষয়ে ইহাকে বড়ই কৃপা করিয়াছেন। ইহার মধুময়কণ্ঠে প্রেমমাখান নামকীর্ত্তন শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়—ঘোর পাষণ্ডের প্রাণও যেন ক্ষণকালের জন্য হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় রামকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কাছে বসাইলেন। বালক রামদাস অভিনব অপ্রাকৃত সুশীতল বক্ষ-সংস্পর্শে অতীব বিস্মিত হইয়া নিজহৃদয়ের মধ্যে নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল এবং পুনঃপুনঃ বাবাজী মহাশয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় রামের পিঠের উপর বামহস্ত দিয়া বলিলেন, "চল ভাই! যাওয়া যাক্।" বলিয়া মহান্তকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সকলেই প্রস্থান করিলেন। ক্রমে চৌমাথা রাস্তার উপর আসিয়া বলিলেন, "ভাই রাম! একটী নাম ধর ত।" বলিতেই রাম নাম ধরিল—"হরি বলরে ভাই, গদাধর গৌরাঙ্গ বন্ধু জাহ্নবা নিতাই। বন্ধু জাহ্নবা নিতাই সীতা অদ্বৈত গোঁসাই" ইত্যাদি। রাম একে বালক, মধুময় কণ্ঠস্বর—তাহাতে আবার অনুরাগমাখা; কাজেই নামটি এতই মধুর লাগিতে লাগিল যে, যেই শুনিতেছে, সেই যেন সেই সময়ের জন্য প্রাকৃত রাজ্যের কথা ভুলিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া

যাইতেছে। রামদাস প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া অগ্রে অগ্রে গাহিতেছে। বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ তাহার দোহারকী করিতেছেন। এক এক সময় রামের এক একটী ভাবমাখান আঁখর স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

শুনিয়া বাবাজী মহাশয় কম্পিত কলেবরে "হা নিতাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার করতঃ সকলের হৃদয় প্রেমানন্দে পরিপ্লুত করিতেছেন। ক্রমে সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলে হরি-সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। একে নামের প্রবল স্রোতে সকলের হৃদয়ক্ষেত্র বিধৌত এবং স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে। তাহাতে আবার নবনটবর হেমকিরণিয়া গৌর-সুন্দরের মূর্ত্তিখানি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সকলেই আত্মহারা! কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর! ক্রমে খোলকরতাল সহ অনেকে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি হইল। বাবাজী মহাশয় মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক রওনা হইলেন। প্রেমের মূর্ত্তি সরলহৃদয় বালক রামদাস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র ইনি প্রেমার্দ্রহৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভাই! আজ বড়ই সুখী করিলে। নিতাইচাঁদের চরণে প্রার্থনা করি, দিন দিন তোমাকে প্রেমধনে ধনী করুন। তোমা দ্বারা জগতের লোক সুখী হউক। যতদিন নবদ্বীপে থাকিবে, ভাই! এক একবার দেখা করিও।" বিনয়ের খনি দৈন্যের মূর্ত্তি রামদাস অবনতমস্তকে করযোড়ে বলিল, "দাদা! আমি বালক, আপনি কৃপা করুন। যেন নিতাইগৌরের প্রতি অচলা ভক্তি থাকে।" বলিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডবৎ করিল। বাবাজী মহাশয়ও সুমধুর বাক্যে রামকে বিদায় দিয়া সঙ্গিগণসহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

জন্মতিথি ও হোরিলীলা।*

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি। বালকবৃদ্ধ পুরুষনারী সকলেই আনন্দে বিভোর—সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল—সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে উদ্‌ব্যস্ত। বালকবালিকাগণ আবির ও পিচকারী লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ব্যবসায়িগণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে, বাড়ীওয়ালারা যাত্রিকসংগ্রহে, যাত্রিকগণ ঠাকুরদর্শনে, শাক্ত ব্রাহ্মণগণ ঠাকুরের দোলযাত্রা উৎসবে এবং বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ আনন্দময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব-উৎসবে উন্মত্ত। নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক যাত্রিকগণের সমাগম হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হাতে আবির। সকলেই অতি ব্যস্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুদর্শনে যাইতেছে। মহাপ্রভুর দরজায় অত্যন্ত ভিড়। ভিতরে কীর্ত্তনীয়াগণের গান হইতেছে। রাজেন দাদা নামানন্দে বিভোর। সকালবেলা নাম করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া বেলা অনুমান বারটার সময় সদলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সকলেরই অঙ্গ রজ এবং আবিরে পরিব্যাপ্ত। রাজেন দাদার চক্ষু দুইটী ভাবে ঢুলুঢুলু ও ঈষদ্ রক্তবর্ণ। দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি এ রাজ্যে নাই। এক একবার বলিতেছেন, আহা মরি! আজ আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব তিথি। পতিতপাবন, পরম-দয়াল শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় কলিকবলিত অধর্ম্মপরায়ণ, নিন্দুক পাষণ্ডীগণও হেলায় উদ্ধার হইতেছে ও হইবে। কেবল আমা হেন ভণ্ডেরই উদ্ধারের উপায় নাই। আমি পরবঞ্চক, প্রতিষ্ঠালোলুপ এবং দেবদ্বিজগুরু বৈষ্ণবদ্বেষী। হা প্রভু! কতদিনে আমার চিত্তশুদ্ধি

---

* এই ঘটনাটীও আমরা পূজ্যপাদ কালীবাবুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

হইবে? কতদিনে আমি আপামরসাধারণ সকলের চরণে লুটাইয়া পড়িব? কতদিনে আমি দীনাতিদীন হইয়া নিতাই-দাসানুদাস বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিব?" ইত্যাদি নানারূপ আক্ষেপ করিতে করিতে অবিরতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। রাজেন দাদা আর একবার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। তখন আশ্রমে মহাপ্রভুর অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। গুরুদেব বলিলেন, "বাবা যাদব! আজ আর কোথাও কীর্ত্তন করিতে না গিয়া আশ্রমেই মহাপ্রভুর জন্মকীর্ত্তন করিয়া আমাকে শুনাও।" রাজেনদাদা "যে আজ্ঞা বাবা! তাই হইবে।" বলিয়া নবদ্বীপদাসকে কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে বলিলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভুর অভিষেক আরম্ভ হইলে রাজেনদাদা জন্মোৎসব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে মহাজনকৃত পদসকল কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে পদ ধরিলেন :—

বদনে বল জয় জয় শচীর কুমার।
গৌর আমার নিগমনিগূঢ় অবতার॥

বলিতে বলিতে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। ঐ পদের অনুকূলে যে কত পদ গাহিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? রাত্রি প্রায় নয়টার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া পঞ্চামৃত ও কিঞ্চিৎ ফলমূল প্রসাদ পাইয়া নামকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন। কোথায় যাইবেন, কে জানে। সঙ্গিগণ চিরদিনই জানেন যে, কোনও বিশেষ আকর্ষণ ব্যতীত ইনি এরূপভাবে কোথাও যান না। তাই তাঁহারা ছায়ার ন্যায় অনুগত-ভাবে সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে করিতে চলিলেন।

এদিকে আমপুলিয়া পাড়ায় পূজ্যপাদ জ্ঞানানন্দ স্বামীজি মহারাজের আশ্রমে হোরি উপলক্ষে চারি পাঁচ সের আবির আনা হইয়াছে এবং

পঁচিশ ত্রিশ জনের উপযুক্ত লুচি কচুরী তৈয়ারী করা হইতেছে। আশ্রমবাসী কেহই জানে না যে, অন্য কেহ আসিয়া এই আশ্রমে যোগ দিবেন। স্বামীজি ঘরের মধ্যে বসিয়া আস্তে আস্তে কয়েকটী ভক্তসহ হোরিকীর্ত্তন করিতেছিলেন। সদর দরজা বন্ধ আছে। হঠাৎ বাহিরে নামকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনা গেল। স্বামীজির আজ্ঞায় জনৈক ভক্ত দরজা খুলিয়া দিবামাত্র রাজেনদাদা সদলে মদমত্ত সিংহের ন্যায় নামের হুঙ্কার করিতে করিতে একেবারে স্বামীজির ঘরে উপস্থিত হইলেন। মত্ত সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া অপর সিংহ যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, আজ রাজেন দাদার হুঙ্কার শ্রবণে স্বামীজিও সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভক্তগণের তাৎকালিক অবস্থা সহজেই সকলে অনুভব করিতে পারেন। উভয় মহাত্মার পদভরে পৃথিবী থরহরি কম্পিতা। স্থান অতি সংকীর্ণ; পাছে উভয় মহাত্মার কোনরূপ আঘাত লাগে, তাই ভক্তগণ অতি সন্তর্পণে চারিদিক রক্ষা করিতেছেন ও নামকীর্ত্তন করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে কৌশলী ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া নানারূপ কৌশলে নৃত্যকারী মহাপুরুষদ্বয়কে লইয়া অঙ্গনে বাহির হইলেন।

এই মহাপুরুষদ্বয় বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন পথ এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও পরস্পরের এমনই আন্তরিক ভালবাসা যে, উভয়ের সম্মিলনে কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে, উঁহারা বিভিন্ন পন্থী। উভয় মহাত্মার শিষ্যগণেরও ঐরূপ ধারণা। কেহ কেহ বা মনে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন যে, রাজেন বাবু এবং স্বামীজি দুই ভাই। উভয় দলের ভক্তবৃন্দকে দেখিবামাত্র হৃদয়ে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। একদল গৈরিক বসনধারী, শিখাসূত্রবিহীন ও মুণ্ডিতমস্তক; অপর দল শুভ্র ডোরকৌপিন, বহির্ব্বাস, এবং শিখাকণ্ঠীধারী। একদল শাক্ত সন্ন্যাসী, অপর দল বৈষ্ণব, কিন্তু পরস্পর দ্বেষভাবরহিত। পরস্পর

পরস্পরকে দেখিবা মাত্রই দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রেমালিঙ্গনপরায়ণ। উভয় দলের ভক্তবৃন্দ উভয় মহাপুরুষকে গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

অঙ্গনে বাহির হইবামাত্র আবিরখেলা আরম্ভ হইল। সব লাল হি লাল। হঠাৎ রাজেন দাদা বসন্ত সুরে পদ ধরিলেন—

ফাগু খেলত গোরা গদাধর সঙ্গে।
কুঙ্কুম মারত দুঁহু দোঁহা অঙ্গে॥
মারে পিচকারী গুলি গোলাল।
আবিরে দুঁহু তনু লালহি লাল॥
খেলত ব্রজে জনু কানু পেয়ারি।
দুহুঁক বদনে ঘন হোরি হোরি॥
চৌদিকে ভকত ফাগু যোগায়।
কোই নাচত কোই আনন্দে গায়॥
ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥
কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
কৃষ্ণদাস তহিঁ ভৈগেও ভোর॥

সুবল মঙ্গল লেই মুরারি।
রঙ্গ গোলাল ভরি পিচকারী॥
ললিতা বিশাখা সহ নওল কিশোরী।
আনন্দে কানু সনে খেলত হোরি॥
পণ করি দুই দলে খেলা আরম্ভিল।
পহিলে বেশর বাঁশী বিশাখা ধরিল॥

কানু সঞে প্যারী বিশাখা সুবল।
ললিতার সঙ্গে ফাগু খেলত মঙ্গল॥
ললিতা বলয়ে শুন বচন আমার।
উড়নী ঘাঘরি পণ হৈল দোঁহাকার॥
বিবিধ খেলন রঙ্গে আনন্দ অপার।
হারি জিতি নাহি কারো সম সবাকার॥
ফাগু মুঠি ফেলি যব ললিতা মারিল।
আঁখি কচালিয়া তব বটু পলাইল॥
ধর ধর বলি পাছু ধাইল সুবল।
কানুরে ঘেরিল তব গোপিনী সকল॥

রসবতী খেলত নাগর সঙ্গে।
মারত কুঙ্কুম শ্যামর অঙ্গে॥
আঁখিযুগ অরুণিত মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে॥
খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে সহচরী পথ নাহি পায়॥
হারুয়া হারুয়া বলি দেই করতারি।
লইল পাগড়ী কেহ কেহ বা বাঁশরী॥
হাসিয়া কহয়ে তব রসবতী রাই।
আইস হে হারুয়া পুনঃ ফাগুয়া খেলাই॥
বিশাখা বলয়ে তুয়া সঙ্গিনীসমাজ।
কৈসে খেলব একা নাগররাজ॥

ধনী কহে সযুখে বিশাখা হউক তুয়া।
ললিতা আমার আইস খেলিহে ফাগুয়া॥
লালহি লাল ভেল রসিক শেখর।
পুনহুঁ খেলত দুহুঁ নাগরী নাগর॥
লাল কোকিলাকুল লাল শুকশারী।
লাল ভ্রমরাগণ ময়ূরা ময়ূরী॥
লালহি তরুলতা লালহি ফুল।
লাল মধু পিবত লাল অলিকুল॥
(সব লালহি লালরে)

এই বলিয়া সকলে অপূর্ব্বভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নবদ্বীপ দাসের হৃদয়ে ললিতা সখীর আবেশ হইল। তিনি "ধনী কহে সযুখে বিশাখা হউক তুয়া" এই পদ অবলম্বনে বলিতে লাগিলেন :—

আ মরি কি লাজের কথা শোন্ বিশাখা ধনি।
নিতুই নিতুই খেলায় হারে নাগর শিরোমণি॥

রসপুষ্টি মানসে যদি কেহ কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাঁহার প্রতিপক্ষ হওয়া রাজেন দাদার চিরন্তন স্বভাব। তাই আজ ইনি বিশাখার পক্ষাবলম্বনে পদ ধরিলেন :—

নাই কি মনে ও ললিতে সেই সে দিনের কথা।
কুসুম চুরি কি ঝকমারি হয়েছিল তথা॥
ললিতা। দিবানিশি রাইয়ের লাগি পাগলপারা শ্যাম।
গোঠে মাঠে বাঁশরীতে জপে রাধানাম॥
বিশাখা। ভাটের মুখে নাম শুনে কে কাঁদে দিবানিশি।
শয়নে স্বপনে মনে ভাবে কালশশী॥

ললিতা। (হঁ্যাগা) রাই দেখিতে কদমতলায় কে করেছে থানা।
বিশাখা। সে যে রাইকে দেখা দিবার তরে করে আনাগোনা ॥
ললিতা। পাশাখেলায় কুণ্ডতীরে কে হারিল বল।
বিশাখা। একা নাগর পেয়ে সবাই করেছিলি ছল ॥
ললিতা। নাই কি মনে মানের দিনে কে ধরিল পায়।
বিশাখা। অধীর হয়ে তার পরে কে দূতীরে পাঠায় ॥
ললিতা। রাজকুমার কে নারীর দ্বারে করিল কোটালী।
বিশাখা। রাজকুমারীর মুক্তা চুরি সব কি পাশরিলি ॥
ললিতা। রাজার নন্দন বনে বনে কে ধেনু চরায়।
বিশাখা। (বল) রাজনন্দিনী কোন রমণী দধি বিকে যায় ॥
ললিতা। নারীর বেশে যাবক লয়ে কে পরাল পায়।
বিশাখা। রাজার মেয়ে কাহার তরে কাননে বেড়ায় ॥
ললিতা। সেজে বালা গেঁথে মালা কে দিল গলায়।
বিশাখা। পররমণী পরের ঘরে কে রাঁধিতে যায় ॥
ললিতা। (মোদের) রাসেশ্বরীর পদতলে কে লিখিল নাম।
বিশাখা। (হঁ্যাগা) বাঁশী শুনে চিত্রপটে কে সঁপিল প্রাণ ॥
ললিতা। মিছে গরব করিস্ না গো ও বিশাখা সখী।
শ্যাম মনোমোহিনী রাই সুধামুখী ॥
বিশাখা। শোন্ ললিতা মরম কথা দুঁহু রাই কানু।
রূপে গুণে কুলে মানে কেহ নহে উনু ॥
শ্যামের বামে শ্যামসোহাগী দেখ্‌তে কেমন ভালো।
মেঘের কোলে সৌদামিনী জগৎ করে আলো ॥
রাইয়ের গুণে শ্যামের আদর শ্যামের গুণে রাই।
ছাড়াছাড়ি শ্যামগোরীর কিবা আদর ভাই ॥

(আয় গো সখী) শ্যাম সনে একাসনে বসাইয়া রাই।
প্রাণ খুলে সবে মিলে দুহুঁ গুণ গাই ॥
কালোর কোলে কিবা শোভা কনকবরণী।
নবজলধরে যেন থির সৌদামিনী ॥

বলিয়া সকলেই প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। আজ নবদ্বীপ দাসের উপর শক্তিসঞ্চার দেখিয়া আমি অবাক্। অবশ্য উপস্থিত ভাবে এরূপ সুমধুর পদাবলী আমরা রাজেন দাদার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি বটে; কিন্তু নবদ্বীপ যে রাজেন দাদার এত কৃপার পাত্র, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কিছুক্ষণ এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর কীর্ত্তনসমাপ্তি করিয়া সকলে রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাপুরুষদের সকলই অদ্ভুত। চারি পাঁচ সের মাত্র আবির আনা হইয়াছিল। সেই স্থলে প্রায় দুই মণ আড়াই মণ আবির উঠিয়া গেল। কীর্ত্তনান্তে বাহিরে যাইয়া দেখি, মিষ্টি এবং আবিরের দোকান বসিয়াছে। স্বামীজি নবদ্বীপ দাসকে কোলে ধরিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি স্থির হইয়া রাজেন দাদা এবং অন্যান্য সকলকে প্রসাদ পাইবার জন্য অনুরোধ করায় সকলেই একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিলাম। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জনের উপযোগী লুচি কচুরী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের ভোগ লাগিয়াছিল। কিন্তু আমরা এক সঙ্গেই ষাট্‌সত্তরজন প্রসাদ পাইতে বসিলাম। আরও প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন বসিতে বাকী রহিল। কি আশ্চর্য্য! আমরা সকলেই আকণ্ঠ পূরিয়া প্রসাদ পাইলাম। মনে হইল, বোধ হয় আর কেহ কিছুই খাইতে পাইবে না। কিন্তু উঠিয়া দেখি, তখনও প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জনের উপযোগী লুচি কচুরী প্রসাদ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, প্রথমে যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, তরপর আর কিছুই হয় নাই। তখন

বুঝিলাম, মহাত্মাদের কটাক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। এ আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

প্রসাদ পাইবার পর রাজেন দাদা সদলে নাম করিতে করিতে গুরুদেবের আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীজি ও অন্যান্য সকলেই রাজেন দাদার অমানুষিকী শক্তির কথা সমালোচনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজি বলিলেন, "নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইবামাত্র রাজেন বাবুর দেহে নিতাইগৌর দুই ভাই খেলা করিতে থাকেন। উঁহার নিজের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তাহা না হইলে যে সে রকমের কয়েকটী মাত্র লোক লইয়া এরূপ কীর্ত্তনানন্দ কেহ কি কখনও দেখিয়াছ ?" কিছুক্ষণ এইরূপ সমালোচনার পর সকলেই নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন। স্বামীজিও বিশ্রাম করিলেন।

গোকুল ও নবদ্বীপ দাসের বিদায়।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন বাবাজী মহাশয় প্রভাতে উঠিয়াই অতি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। যাঁহার মুখে হাসি ছাড়া কথা নাই, যাঁহার সর্ব্বদা আনন্দময় চেষ্টা- সর্ব্বদা রসময় ভাব, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সহিত যাঁহার সমান ব্যবহার, নিজ শিষ্যদিগের সঙ্গেও যিনি গুরুত্ব ভাব রাখিতে ভালবাসেন না, যিনি বিন্দুমাত্র নিজমর্য্যাদার প্রার্থী নন, যিনি কাহারও মুখ ম্লান দেখিলে ব্যথিত হন, আজ তিনি পরম গম্ভীর। কাহারও সহিত কথা নাই, মুখে হাসিও নাই। সঙ্গিগণের হৃদয়ে বড়ই আতঙ্ক—না জানি কাহার উপর কি কঠোর আদেশ হইবে।

ক্রমে বেলা আটটা বাজিলে হঠাৎ গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন "গোকুল।"

গোকুল। আজ্ঞে।

বাবাজী। একবার এদিকে এস ত।

গোকুল নিকটে গিয়া প্রণাম করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বৎস, আমার কয়েকটী কথা শোন।" গোকুল "যে আজ্ঞে" বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে কর যোড়ে উপবেশন করিল।

বাবাজী। দেখ, তোমার মা, স্ত্রী ও ছোট ভাই তোমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার একবার বাড়ী যাওয়া দরকার। অনেক দিন ত আমাদের সঙ্গে রহিলে; আবার যখন মনে হইবে, আসিও। যখন সংসার আশ্রম করিয়াছ, তখন সেটীও অবশ্য দেখিতে হইবে ত! যদি বিবাহ না করিতে বা মা না থাকিতেন, তবুও বরং এক কথা। সতী সাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণকন্যার অভিসম্পাত তোমাকে ও আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

গোকুল অধোবদনে বসিয়া অতি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে—মুখে রা নাই; কেবল এক একবার কাতরনয়নে নবদ্বীপ দাদার মুখপানে চাহিতেছে। কেবল গোকুল বলিয়া নয়, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ সকলেই নবদ্বীপদাদা-গতপ্রাণ; যাহার যে মনের ভাব, নবদ্বীপ দাদা সব জানেন। কিছু বলিতে কহিতে হইলে নবদ্বীপ দাদাই বলিবেন। আজ গোকুলও যেন কাতরনয়নে নবদ্বীপ দাদাকে ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে যে "দাদা! আমার মনের সংকল্প ত তুমি সকলই জান; অতএব যাহা বলিতে হয়, তুমিই বল।"

ক্ষণকাল পরে নবদ্বীপদাদা আস্তে আস্তে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "ও ত নিজে কিছু বলিতে পারিতেছে না, ওর মনের ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। ও আর বাড়ী যাইবে না বা সংসার করিবে না।"

বাবাজী। আমার বোধ হয় তুমিই ইহার পরামর্শদাতা!

নবদ্বীপ। আমি যদি পরামর্শ দিয়া লোকের সংসারবন্ধন মোচন করিতে পারিতাম, তবে আমি জগতে আর মায়ার অধিকার রাখিতাম না। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্র এবং অনেকানেক ধর্ম্মপ্রচারকগণ উচ্চকণ্ঠে সংসারের নশ্বরতা, দুঃখময়তা প্রভৃতি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন; কিন্তু কই, কয়জন লোক সংসার ত্যাগ করিতেছে? কয়জন মন দিয়া সেই কথা শুনিতেছে? আবার হয় ত একজন বাল্যকাল হইতেই সংসারে অনাসক্ত। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসমা স্ত্রী এবং মাতাপিতা সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সংসারে রাখিতে পারেন না। যুক্তি বা পরামর্শ করিয়া কি সংসার ত্যাগ হয়, না ভোগ হয়? ইহার যখন সংসার করিবার ইচ্ছা নাই, তখন ইহার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিবার প্রয়োজন কি?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "যখন ইহার সহিত তোমার এত ভালবাসা, তখন আমার মতে তোমারও ইহার সঙ্গে যাওয়া উচিত। এ কথায় আর প্রতিবাদ না করিয়া অবিলম্বে তোমরা উভয়েই বাড়ী চলিয়া যাও। নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় সময়ান্তরে আবার দেখা হইবে।" এই বলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥

কার সাধ্য যে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? যে গোকুলদাদা বা নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশয়ের ছায়ার ন্যায় অনুগত—স্বপ্নেও যাঁহারা ইঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে অক্ষম, তাঁহারা আজ অবনতমস্তকে এই বজ্রাদপি কঠোর আজ্ঞাপালনে তৎপর। যে আনন্দময় সঙ্গত্যাগের কথা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—শরীর শিহরিয়া উঠে, আজ ইঁহারা

বাবাজী মহাশয়ের সুখ হইবে জানিয়া অকাতরে সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছেন। গোকুলদাদা মনে মনে ভাবিতেছেন "হায় হায়! আমার ন্যায় হতভাগার জন্য কিনা দাদাকেও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িতে হইল!" আবার ভাবিতেছেন, "নিশ্চয়ই মঙ্গলময় গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবার জন্য দাদাকে সঙ্গে দিতেছেন।" নবদ্বীপ দাদার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, কর্ত্তব্যচিন্তা, বিরহ প্রভৃতি উপস্থিত হওয়ায় মুখখানি যেন কেমন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। একটু চিন্তার পর বলিয়া উঠিলেন, "ভাই গোকুল! আর কেন? আমার বিশ্বাস, আমরা যতক্ষণ এস্থানে থাকিব, ততক্ষণই দাদার কষ্ট হইবে; অতএব চল, আর কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করি।" এই বলিয়া "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম করিতে করিতে উভয়ে বাহির হইলেন। সঙ্গিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর গেলে দাদা ইঙ্গিতে নিষেধ করায় সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। এদিকে নবদ্বীপদাদা এবং গোকুলদাদা খেয়াঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিলেন। ক্রমে গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া নবদ্বীপদাদা গোকুলকে বলিলেন, "দেখ ভাই গোকুল! দাদা আমাদিগকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী কোথায়? সকলেই যখন আমাদিগকে পুরীর বাবাজী বলে, তখন পুরীতেই ত আমাদের বাড়ী। অতএব দাদা আমাদিগকে পুরী যাইতেই আদেশ করিয়াছেন। গোকুল বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা দাদা! আমারও তাই মনে হইয়াছিল। চল, আমরা অন্য কোথাও না গিয়া একেবারে পুরীধামেই চলিয়া যাই।" এই বলিতে বলিতে খেয়ার নৌকা গঙ্গার পারে পৌছিলে উভয়ে নৌকা

হইতে নামিয়া হাঁটাপথে নাম করিতে করিতে পুরী অভিমুখে রওনা হইলেন।

এদিকে নবদ্বীপদাদার বিরহে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। সকলেরই মুখ ম্লান—সকলেরই মন এক একবার হুহু করিয়া উঠিতেছে। সকলেরই মুখে "হা নিতাই! এ কি করিলে!" এই এক বুলি। নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে ইঁহাদের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম; কাজেই তাঁহার বিরহ সকলের একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কেহ বলিতেছে, "হায়! গুরুদেব যদি আমাকে দাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিতেন, তবুও ভাল ছিল।" এস্থলে হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বাবাজী মহাশয়কেই ত সকলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন —বাবাজী মহাশয়ই ত সকলের গুরু তবে ইঁহার সঙ্গে থাকিয়াও উঁহাদের এরূপ অবস্থা হইতেছে কেন? এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মোট কথা—ইঁহারা নবদ্বীপ দাসকে আশ্রয় করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বিষয় করিয়াছেন। অর্থাৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যে আনন্দ বা মাধুর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইঁহারা সেই বস্তুটী নবদ্বীপ দাদার মারফতে উপভোগ করিয়া থাকেন; সুতরাং যদিও ইঁহারা প্রেমানন্দময় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই রহিয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দও পূর্ব্ববৎই চলিতেছে, তথাপি ইঁহারা উপভোগ করিবার যন্ত্রের অভাবে যথাযথ উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। তাই আজ নবদ্বীপদাদার বিরহে ইঁহাদের মনে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইতেছে।

সদলে কলিকাতায় গমন।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক অতীত হইতে চলিল। একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় গুরুদেবের শ্রীচরণে

দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা! পুরীধাম যাইবার জন্য প্রাণে বড়ই উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। যদি আজ্ঞা হয়, তবে একবার জগন্নাথদর্শন করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করি। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় যেন ভোলানাথ। বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! যাহাতে তোমার সুখ হয় কর, তবে বুড়ো বাপকে এক একবার দেখা দিতে যেন ভুলিও না।" এই বলিয়া ইঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। আহা মরি! গুরুদেবের কি অপূর্ব্ব বাৎসল্য! গুরুদেব শিষ্যের সুখে সুখী, শিষ্যও গুরুদেবের সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। ইহারই নাম অপ্রাকৃত ভালবাসা—ইহাকেই বলে নিঃস্বার্থ প্রেম। বাবাজী মহাশয় নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে গুরুদেবকে স্থির করিলেন। গুরুদেবও প্রসন্নচিত্তে শিষ্যের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। ইনি দশ বার জন সঙ্গীর সহিত নাম করিতে করিতে গঙ্গা পার হইয়া কৃষ্ণনগর ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলেন।

কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী পুষ্করিণীর তীরে গাছতলায় বসিয়া ইঁহারা নাম করিতেছেন, এমন সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন?"

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদের প্রেরণায় কলিকাতায় যাইবার জন্য মনে বাসনা জন্মিয়াছে। এখন তাঁহার ইচ্ছা।

ভদ্রলোক। বাবা! বারটা চব্বিশ মিনিটে গাড়ী আসিবে। সে ত অনেক বিলম্ব। এখন মাত্র নয়টা বাজিয়াছে। আপনাদের আহারাদির কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

বাবাজী। বাবা। আমরা ত কিছুই জানি না। নিতাইচাঁদ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনিই জানেন।

ভদ্রলোক। আজ্ঞা হয়ত আমি কিছু যোগাড় করিয়া দিই। আমিও কলিকাতায় যাইব; আহারাদির পর এক সঙ্গেই যাওয়া যাইবে।

বাবাজী। নিতাইএর ইচ্ছা। আমি আর কি বলিব ?

ভদ্রলোকটী বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী বিধুভূষণ নামক জনৈক ভক্তকে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ বাজার হইতে চাউল, ডাইল, তরকারী প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য সকল মুটের মাথায় দিয়া লইয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের সুচতুর সঙ্গিগণ বেলা সাড়ে এগারটার মধ্যেই ডা'ল তরকারী অন্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় ঐ পুষ্করিণীতে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে সঙ্গিগণ ইঁহার অধরামৃত লইয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বেলা বারটার সময় ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গিগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, "ষ্টেশনে ত আসা হইল; কিন্তু টিকিটের কি হইবে? কাছে ত একটী পয়সাও নাই।" বাবাজী মহাশয় কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে প্রফুল্লচিত্তে পূর্ব্বোক্ত বাবুটী এবং অন্যান্য কয়েকটী ভদ্রলোকের সঙ্গে ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে বসিয়া আছেন। এই সময় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। বাবুরা যার যার টিকিট করিতে চলিয়া গেলেন। জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন। "বাবা! আপনাদের টিকিট হয় নাই কি?" বাবাজী মহাশয় অতি প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন, "বাবা! আমি ত কিছুই জানি না। নিতাই জানেন। ভদ্রলোকটী মনে করিলেন, নিতাই নামে ইঁহার সঙ্গীয় কোন ব্যক্তি বোধ হয় টিকিট আনিতে গিয়াছে।

এই সময়ে পৃথিবী কম্পিত করিয়া মদমত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় গাড়ী ফুৎকার করিতে করিতে ষ্টেশনে পৌছিল। ছোটবড় সকলেই ব্যস্ত সমস্তভাবে গাড়ীতে ওঠানাবা করিতে লাগিলেন। একজন চাপরাশী আসিয়া বলিয়া গেল, "বাবু! জল্‌দি উঠ, গাড়ী আভি ছোড়্ দে গা।" বাবাজী মহাশয় কিন্তু নিশ্চিন্তমনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। সঙ্গিগণ একটু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, গাড়ী যে ছাড়িয়া দিবে!"

বাবাজী। তোমাদের সঙ্গে যদি কিছু থাকে, টিকিট করিয়া গাড়িতে উঠিতে পার। আমার যখন টিকিট হইবে, আমি তখন যাইব; না হয় এখানেই দশদিন থাকিব। আমার ত আর কলিকাতায় ছেলে মেয়ের বিবাহ নাই। নিতাইচাঁদের দরকার বোধ হয় নিবেন, না হয় তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। ভিখারীর অত ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন?

শুনিয়া সকলেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। এদিকে আরোহিগণ গাড়িতে উঠিয়াছে, এই সময়ে ষ্টেশনমাষ্টার বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আপনারা কোথায় যাইবেন?"

বাবাজী। বাবা! কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য নিতাইচাঁদ এখানে আনিয়াছিলেন। জানি না এখন তাঁহার কি ইচ্ছা!

ষ্টেশনমাষ্টার। কেন, আপনাদের কি টিকিট হয় নাই?

বাবাজী। জানি না বাবা!

মাষ্টার। তবে কে জানে?

বাবাজী। নিতাইচাঁদ জানেন।

মাষ্টার। কেন, আপনাদের সঙ্গে কিছু পয়সাকড়ি নাই কি?

বাবাজী। না বাবা! বিশেষ প্রয়োজনও নাই।

শুনিয়া ষ্টেশনমাষ্টার বাবু যেন একটু চঞ্চল হইলেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! বিশেষ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। মঙ্গলময় নিতাইচাঁদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

মাষ্টার। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে।

বাবাজী। হইলই বা! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! আজ না হয় কাল হইবে। কাল না হয় দশদিন পরেই হইবে।

ষ্টেশনমাষ্টার বাবু বাবাজী মহাশয়ের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তায়

বিস্মিতভাবে ইঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। একবার বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি টিকিট হাতে লইয়া দ্রুতবেগে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে ইঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় গাড়ীতে উঠিয়াই খোলকরতালযোগে নাম করিতে লাগিলেন। গাড়ীও যেন নামের তালে তালে আনন্দে নাচিতে নাচিতে যাইতে লাগিল। দৃঢ় বিশ্বাসীর নিকট ভগবান্ চিরদিনই বাঁধা। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

এই দুই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত এই মহাপুরুষের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় লক্ষিত হইয়া থাকে। অপরাহ্ণ অনুমান পাঁচটার সময় গাড়ী গিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলে ইঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন।

মুকুন্দ ঘোষের বাড়ীতে অবস্থান।

আজ কলিকাতায় মহাহুলস্থুল ব্যাপার। চারিদিকে মহাসংকীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে। গগনভেদী হরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। ব্যাপারখানা কি বুঝিতে না পারিয়া বাবাজী মহাশয় বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, এই সময় সাহেব বেশধারী একটী বাঙ্গালী বাবু ইঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে হরিনাম সংকীর্ত্তন কর।"

বাবাজী। কেন বাবা! আজ চারিদিকে এত নামকীর্ত্তন হইবার কারণ কি?

বাবু। কেন, তোমরা কি জান না যে কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রত্যহ বহু লোকের প্রাণহানি হইতেছে? তাই রাজকীয় আদেশানুসারে সর্ব্বত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয়ের দেহ অশ্রু-কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত হইল। তখন প্রেমগদগদকণ্ঠে নাম ধরিলেন :—

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

এক একবার নামের হুঙ্কারে পৃথিবী যেন কম্পিতা হইতেছেন। লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আজ আর কাহারও দ্বেষাদ্বেষি নাই। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই প্রাণের ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতেছে। আজ কাহারও ঔদ্ধত্যভাব নাই— সর্ব্বত্র সমভাব! রাজকীয় পাশের কোন আবশ্যকতা নাই এবং কোন মসজিদের নিকট দিয়া হরিনামসংকীর্ত্তন করিতেও নিষেধ নাই। সংকীর্ত্তনের দল শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ক্রমে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। যে যে রাস্তা বা গলি দিয়া সংকীর্ত্তনের দল গমন করিতেছে, তথায় যেন নামের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। দোকানী পসারী সকল অতীশয় ব্যগ্রভাবে আসিয়া সংকীর্ত্তনের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। কলিকাতা সহরের সাময়িক অবস্থা দর্শনে বাবাজী মহাশয় আনন্দে অধীর হইয়া যাইতেছেন। বালকবৃদ্ধযুবা সকলেই অনিমেষনয়নে বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া আছে। ইঁহার গগনভেদী কণ্ঠস্বর, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত বিশাল দেহখানি এবং চরণে চরণ রাখিয়া সুমধুর নৃত্য একবার যাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে সে শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও প্রেমবিহ্বলভাবে নাচিতে নাচিতে ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

ক্রমে ইঁহারা যেমন দর্জ্জিপাড়ার ভিতর দেওয়ান পাড়ার বাজারে

গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি একটি দোকান হইতে জনৈক ভক্ত কীর্ত্তনসম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন তিনি সাশ্রুগদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন, "বাবা! আজ এ অধমের কুটীরে পদার্পণ করিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "নিতাইচাঁদের ইচ্ছা!" তখন ভক্তটী ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ভক্তটীর নাম মুকুন্দ চন্দ্র ঘোষ; জাতিতে গোয়ালা। স্বামী স্ত্রী পরম ভক্ত। বাজারের মধ্যে উঁহার একখানি মিষ্টান্নের দোকান আছে। কোন ভাল জিনিষ প্রস্তুত হইলে ঘোষ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে নিকটস্থ ঠাকুরবাড়ী এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও সাধু-সন্ন্যাসিদিগকে কিছু কিছু দিয়া পরে নিজের বাড়ীর ঠাকুরকে ভোগ দিতেন। তাঁহার পত্নীটী ঠিক্ যেন মা যশোদার ন্যায়। পাড়াপ্রতিবেশী বালকবালিকাগণ যেন তাঁহার প্রাণ। তিনি দোকান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন আনাইয়া ঠাকুরকে ভোগ দিবার পর বালকবালিকাদিগকে বিতরণ করিতেন। স্নেহময়ী ঘোষপত্নী আজ বহুপুত্রের মা হইলেন। বাবাজী মহাশয় ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই বলিলেন, "মা! বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খেতে দাও।" মাও আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাৎসল্য-ভরে ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদ সকলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। ঘোষ মহাশয় একপাশে দাঁড়াইয়া এই সকল অপ্রাকৃত স্নেহময় ব্যবহার দর্শনে কাঁদিয়া অধীর হইতেছিলেন। এইরূপ পরমানন্দে বাৎসল্যময়ী ঘোষপত্নী প্রদত্ত মিষ্টান্ন প্রসাদ পাইয়া ইঁহারা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে ভোগরাগের যোগাড় হইতে লাগিল। যথাসময়ে ঠাকুরের ভোগের পর প্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

প্লেগ উপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন।

রাত্রি প্রভাত হইলে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক নগরকীর্ত্তনে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া ঘোষ-মহাশয়ের স্ত্রী বলিলেন, "বাবা! রাত্রে ভালরকম প্রসাদ পাওয়া হয় নাই। এখন নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলে ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইবে এবং সকলের বড়ই কষ্ট হইবে। অতএব আমি তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় করিয়া দিই; ছেলেরা রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিক। সকাল সকাল স্নানাদি করিয়া প্রসাদ পাইবার পর নগরকীর্ত্তনে গেলেই আমারও মনে আনন্দ হইবে, সকলের শরীরও সুস্থ থাকিবে।" বাবাজী মহাশয় অগত্যা তাহাতেই সম্মতিপ্রদানপূর্ব্বক রান্নার জন্য দুইজনকে রাখিয়া নাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। ঘোষ মহাশয় বাজারের সকলকে বলিয়া দিলেন যে, চারিটার সময় নগরকীর্ত্তন বাহির হইবে। ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতেই নগরকীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে বহুলোক মুকুন্দ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় হাতমুখ ধুইয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক লোকসকল কীর্ত্তন শোনা ত দূরের কথা, ইঁহার প্রেমময় সৌম্যমূর্ত্তিখানি দেখিয়াই একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। ইঁহাদের সঙ্গে একখানি খোল এবং দশ যোড়া করতাল ছিল। পাড়া হইতে একজন ভক্ত আর একখানা খোল লইয়া আসিল। এইরূপে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই কত যে খোল করতাল আসিতে লাগিল, কে তাহার সংখ্যা করে? বাবাজী মহাশয় "প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত

বিধান" ইত্যাদি নগরকীর্ত্তনের বন্দনা করিয়া "আবার বল হরিনাম আবার বল" এই নাম ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। গগনভেদী সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে যেন দশদিক কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে যত কীর্ত্তনের দল আসিতেছে, সকলই আসিয়া এই কীর্ত্তনের সহিত যোগ দিতেছে। নামের ধ্বনি, খোলকরতালের ধ্বনি, হরিধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতিতে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় টলিতে টলিতে আগে আগে গমন করিতেছেন। ইঁহার আঘূর্ণিত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় হইতে অবিরতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন হইতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল এক একবার প্রেমভরে ফুলিয়া উঠিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় এরূপ কম্প উপস্থিত হইতেছে যে, দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট। ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে কি হিন্দু, কি যবন যাহাকেই সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাকেই কোল দিয়া বলিতেছেন, "হরিবোল—হরিবোল। আমার প্রেমদাতা নিতাই বলে হরিবোল হরিবোল। (নামে সকল ব্যাধি দূরে যাবে) (ও ভাই মিছে মায়ায় ভুল নারে) (ও ভাই কখন কি হয় বলা যায় না) (স্ত্রীপুত্র সঙ্গে যাবে না) (একবার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে) (ও ভাই জাতির গরব ক'দিন রবে) (যম ত জাতি বাছবে না রে) (প্লেগ ত হাকিম মানবে না রে) (কাল ত বয়স দেখ্‌বে না রে) (বালবৃদ্ধ বাছবে না রে) (কিছুই সঙ্গে যাবে না রে) (নাম মাত্র পথের সম্বল) একবার গৌরহরিবোল হরিবোল, হরিবোল বল ভাই।" ইত্যাদি।

এক একবার এমনভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন যে, দেখিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে কেহ ইঁহার স্পর্শ পাইতেছে, সে আর যায় কোথায়?

অমনি হাতে তালি দিয়া নাচিতেছে, আর "হরিবোল হরিবোল" বলিতেছে। বাগবাজারের মোড়ে চৌমাথার উপর দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কয়েকটী উকীলবাবু কাছারী হইতে বাসায় যাইবার সময় একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। উহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "দেখ ভাই! নামকীর্ত্তন ত অনেকেই করিয়া থাকেন; কিন্তু এই লোকটীর ন্যায় এরূপভাব কেহ কখন দেখিয়াছ কি? লোকটা এক একবার হরিবোল বলিতেছে, আর শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রত্যেকের শরীরে একটা electricity pass করিয়া দিতেছে। ভাবভঙ্গি বা আকারপ্রকারে ইহাকে সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।" শুনিয়া সকলেই একবাক্যে তাহার কথায় সায় দিলেন। অধিক্ষণ উহাদের ঐরূপ সমালোচনা করিতে হইল না। হঠাৎ ধূলি-ধূসরিত ঐ দীর্ঘাকার বাবাজীটি টলিতে টলিতে আসিয়া এক একটী বাবুকে যেমন আলিঙ্গন করিলেন অমনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিশোভিত উকীলবাবুরা পদমর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হইয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একজন সাহেব নামকীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ পাইয়া অপর কয়েকটী সাহেবকে বলিতে লাগিলেন—

It seems to me that this man is not a common man. The Almighty God is sure to listen to the prayer, made with so earnestness at the time of danger and difficulty. Such an attraction and dependence upon God is absolutely necessary to be saved from the calamity of danger. These men think the distress of others as their own and are praying with heart and soul to save the public from the dreadful jaws of plague. It is the instruction of Jesus that

man should sacrifice his own life for the good of others. do not think him an ordinary man. If he stays in Calcutta for some days more, the plague will surely disappear.

অপর একটী সাহেব এই কথায় সায় দিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

Oh! yes, he is really a glorious man.

এইপ্রকার যাহার যেরূপ মনের ধারণা, সে সেইরূপ বলিতে লাগিল। এইরূপভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দশটার সময় ইঁহারা বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তখনও সঙ্গে বহুলোক। তাহারা যেন গৃহে যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব আকর্ষণ! কি মোহিনী শক্তি! দোকানী দোকানের কথা, গৃহী স্ত্রীপুত্রাদির কথা, উকীলবাবু মক্কেল, মোকদ্দমা ও আইনানুশীলনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শ্রমজীবিগণ নিজ নিজ কার্য্য ভুলিয়া ইঁহাদের সঙ্গে বেড়াইতেছে। রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের এক অপূর্ব্ব রঙ্গ! প্লেগের সময় কলিকাতায় কীর্ত্তনানন্দের কথা লেখনীতে লেখা বা ভাষায় ব্যক্ত করা মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। যিনি দেখিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন, তিনিই উহা কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এইভাবে প্রায় একমাস কাল মুকুন্দ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিদিন বৈকালে নগরকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দও যেন উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন কাহাকেও কিছু বলা নাই কহা নাই প্রসাদ পাইবার পর বেলা অনুমান দুইটা আড়াইটার সময় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে কলুটোলা শোভারাম বসাকের লেনস্থিত ২৬ নং বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুলিন বাবুর সহিত মিলন।*

সন ১৩০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সময়ে একটী সংকীর্ত্তনের দল "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নামকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। তারিখটার কথা ঠিক মনে নাই, তবে বৃহস্পতিবারের কথা স্মরণ থাকিবার কারণ এই যে, প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত। পাঠক শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ এবং কয়েকজন শ্রোতা নীচের বৈঠকখানায় (যেখানে প্রত্যহ পাঠ হয়) উপস্থিত ছিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া আমরা সকলেই গৃহ হইতে প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় কলিকাতায় প্রথম প্লেগের প্রাদুর্ভাব। পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের খুব ধূমধাম। আমাদের পাড়াতেও চার পাঁচটী সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোন দল প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পাড়ার মধ্যে সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত। আমরা সকলে প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, সেইরূপ কোন একটী সংকীর্ত্তনের দল আসিয়াছে। কিন্তু প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম, কয়েকটী অপরিচিত বাবাজী সংকীর্ত্তন করিতেছেন।

সে সময় আমার বাবাজী বৈষ্ণবদের উপর বড় একটা—বড় কেন, একেবারেই শ্রদ্ধা ছিল না। আমার তখনকার ধারণা যে, সংসারে অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তব্যবিমুখ, লক্ষ্যশূন্য এবং চরিত্রহীন কতকগুলি লোক বাবাজীর ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক লোকপ্রবঞ্চনা করতঃ নিজেদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়। আমার তখন এইরূপ ভাব; আমার

* এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বাবু পুলিনবিহারী মল্লিক মহাশয় নিজে যাহা লিখিয়াছেন; তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

জ্যেষ্ঠ সহোদর কুঞ্জবিহারী মল্লিক মহাশয় কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। আমরা জাতিতে সুবর্ণবণিক। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবে বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবণিক মাত্রেই বংশানুক্রমে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। আমরা শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরিবার। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় ঠিক সেই পরিবারের প্রকৃত কর্ত্তব্যপালনপরায়ণ ও সর্ব্বদা অকুণ্ঠিতভাবে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসেবায় অনুরক্ত। আমার কিন্তু দাদার ঐরূপ ভাব ভাল লাগিত না। আমি মনে করিতাম দাদার এই একটী ভুল সংস্কার। প্রকৃত অভাবগ্রস্ত বা পতিপুত্রবিহীনা অসহায়া বিধবা অথবা মাতৃপিতৃহীন নিঃসহায় বালকবালিকাদের সাহায্য না করিয়া সবল, সুস্থকায়, আত্মসুখরত বাবাজীদিগের জন্য অর্থব্যয় করার ন্যায় অপব্যয় আর কি হইতে পারে? আমার বিশ্বাস, এইরূপ অর্থসাহায্যদ্বারা মানবসমাজের মহান্ অনিষ্টকর কার্য্যেরই সহায়তা করা হইতেছে। একে যৌবনের মদগর্ব্ব, তাহাতে আবার ইংরাজী শিক্ষারূপ গরম মসলা; উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণাগুলি আমার হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু এই ভিখারীর দল আজ আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিল—সকল অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইঁহারা একমনে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম কীর্ত্তন করিতেছিল। নামের কোন অর্থ বুঝিলাম না; কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল; অর্থাৎ শুনিতে বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। ইতিপূর্ব্বে বাবাজী বৈষ্ণব মহাশয়দের গানে আমার গায়ে যেন শেল বিদ্ধ হইত। কেন জানি না, আজ এই বাবাজী মহাশয়দের "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" নামে প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা অস্পষ্ট অনির্ব্বচনীয় সুখবোধ হইতে লাগিল।

আর তাহাদের সেই নৃত্য—জানি না সে কি নৃত্য। আমি এযাবৎ বাবাজী মহাশয়দের নৃত্যে কখনও আনন্দলাভ করি নাই; তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগ প্রভৃতির নৃত্য দেখিয়া থাকি, সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক সময় বাবাজীদের উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম। স্ব ইচ্ছায় কখনও ঐরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; তবে যাহা দেখিয়াছি, তাহাও অপরিহার্য্য অবস্থায়। কিন্তু এই বাবাজীদের নৃত্য আজ আমাকে যেন কেমন একপ্রকার মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, কয়েকজন বাবাজী একটী দীর্ঘাকার বাবাজীকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে করিতে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইল, মধ্যেস্থিত দীর্ঘাকার বাবাজীটীই এই সংকীর্ত্তন-দলের নেতা। কারণ তিনি গাহিতেছেন, আর সকলে তাঁহার দোহারকি করিতেছে। যখন সঙ্গিগণ গাহিতেছেন, তখন তিনি চরণে চরণ রাখিয়া মধুর ভাবে নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের যে কি মাধুরী, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি। কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে এমন কোন নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নাই, (অবশ্য খ্যাতনামাদের মধ্যে) যাঁহার নৃত্য আমি দেখি নাই। ইহা ছাড়া কাশী, দিল্লী, অমৃতসহর, ঢাকা প্রভৃতি অনেক স্থানে বহু বহু সুবিখ্যাত নর্ত্তক নর্ত্তকীদের নৃত্য দেখিয়াছি। কিন্তু কখনও আমার মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য সামান্য চোখের দৃষ্টিতে, নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়া যদি কেহ এ নৃত্যের বিশ্লেষণ করিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি ইহার কোন গুণ দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। আমি কিন্তু দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে কেহ একবার এই মহাত্মার নৃত্য দেখিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এ নৃত্য যেন কথা কয়। যে ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয় না—ইঙ্গিতে বুঝান যায় না—

শব্দে উচ্চারিত হয় না, এ নৃত্য যেন সেই ভাব ব্যক্ত করে। এ নৃত্য যেন প্রাকৃত রাজ্য ভুলাইয়া কোন এক অপ্রাকৃত শান্তিময় রাজ্যের পূর্ণ চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর পরমানন্দময় নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্রায় একঘণ্টাকাল এই আগন্তুক সংকীর্ত্তনকারী বাবাজীগণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের অপরিচিত। কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর আমাদের বিশেষ অনুরোধে সকলে বৈঠকখানায় আসিয়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সকলেও যথাযোগ্য স্থানে বসিলে প্রভুপাদ আগন্তুক বাবাজীদের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কোথায় থাকা হয়?"

বাবাজী। বাবা! আমরা ভিখারী। আমাদের থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। তবে অধিকাংশ সময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি।

প্রভু। আপনার নাম?

বাবাজী। এ দাসকে লোকে রাধারমণ চরণদাস বলিয়া ডাকে।

প্রভু। (সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইঁহারা কি আপনার সঙ্গেই থাকেন?

বাবাজী। আজ্ঞে হাঁ, আপাততঃ আছেন বটে।

প্রভু। শ্রীধাম পুরীতে কোথায় থাকা হয়?

বাবাজী। আজ্ঞে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। নিতাইচাঁদ যেদিন যেখানে রাখেন, সেদিন সেই খানেই থাকা হয়।

তখন প্রভুপাদ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা কুঞ্জ! তুমি বৈষ্ণবগতপ্রাণ এবং বৈষ্ণবসেবা বড়ই ভালবাস। আজ তোমার সৌভাগ্যবশে একটী পরম বৈষ্ণব উপস্থিত হইয়াছেন।

কায়মনোবাক্যে ইঁহার সেবা কর।" অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠ সমাপ্তির পর আমার সহোদরের বিশেষ আগ্রহে ইঁহারা সেদিন আমাদের বাটীতেই অবস্থান করিলেন। সংকীর্ত্তন-দলের নেতা বাবাজী মহাশয়ের প্রত্যেক কার্য্যই আমার যেন বড় ভাল লাগিতে লাগিল। তাঁহার কথায় কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ছায়া বা সংকীর্ণতার সংস্পর্শ নাই। তাঁহার প্রত্যেক কথাই সরল, সুযুক্তিপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি যুক্তিতে এবং প্রতি তত্ত্বনির্ণয়ে যেন কি একটী অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব নিহিত আছে। যিনি যে প্রশ্ন করিতেছেন, হাসিমুখে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন। বিরক্তি জিনিষটি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি বহু সাধুবৈষ্ণব দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্তু এমন সৌম্য মূর্ত্তি, এরূপ প্রসন্ন ভাব, ঈদৃশ সরলতাপূর্ণ ব্যবহার এবং এ প্রকার হাসিমাখা সুমধুর কথা আর কোথাও পাই নাই।

ক্রমে আমাদের বৈঠকখানায় বহুলোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের কথা উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের গবেষণা অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমূর্ত্তিটীকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাস বিবৃত করিতে লাগিলেন। কেহ বা প্রণবস্বরূপ বলিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তিসম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে বাবাজী মহাশয়! এ বিষয়ে আপনার কি মত?" বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন,

"শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহ সম্বন্ধে আপনারা যিনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য।" এই কথা শুনিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি মহাশয়! পরস্পর বিরুদ্ধভাব-প্রকাশক সকল কথাই সত্য! এ কিরূপে সম্ভবপর হয়?

বাবাজী। আজ্ঞে আপনি যাহা অজ্ঞ করিতেছেন, তাহাও সত্য; কারণ প্রাকৃত জীবের মধ্যে এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় অসম্ভব; কিন্তু ভগবানে সকলই সম্ভবপর। শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহ সম্বন্ধে আপনারা যিনি যাহা বলিলেন, সেগুলি বিরুদ্ধভাবব্যঞ্জক হইলেও তাঁহাতে সবই সম্ভব হইতে পারে।

আবার একজন বলিলেন, মহাশয়! জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিটী হস্তপদ-বিহীন, চক্রাকারনেত্র; ওরূপ অদ্ভুত হইবার কারণ কি? এটী ভগবানের কোন্ রূপ?

বাবাজী। শ্রীজগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নীলগিরি গমন, নীলমাধববিগ্রহের অন্তর্ধান, ব্রহ্মার আদেশে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন এই চতুর্ধা মূর্ত্তির নির্ম্মাণ প্রভৃতির বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু বিগ্রহের হস্তপদাদির ওরূপ হইবার কারণ কোন গ্রন্থে আছে কি না জানি না। তবে এ সম্বন্ধে মহাত্মাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিলে যদি আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়, বলিতে পারি।

সকলে। বেশ, তাহাই বলুন।

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারকালীলার সময় একদিন মহিষীগণ সমবেত হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছিলেন, এই সময় একজন বলিলেন, "ভাই! ঠাকুর বৃন্দাবনলীলায় না জানি কতই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। নতুবা দ্বারকায় এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ষোড়শ সহস্র রূপগুণকুলগৌরবসম্পন্না মহিষীগণ পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সেই গ্রাম্য বনচারিণী গোপীদিগের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না কেন? প্রায়

প্রতি নিশিযোগেই নিদ্রিতাবস্থায় "রাধে রাধে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন।"

মহিষীগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ ভাই! ঠিক্ বলিয়াছ।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মহিষীগণ কি উপায়ে ঠাকুরের বৃন্দাবন-লীলার সম্পূর্ণ বিবরণ জানা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন সত্যভামা বলিলেন, "ঠাকুরের বৃন্দাবনে অবস্থানকালে সঙ্গে ছিলেন এবং সমস্ত লীলা পরিজ্ঞাত আছেন, এমন কেহ দ্বারকায় আছেন কি না অনুসন্ধান করা দরকার।" তখন রুক্মিণীদেবী বলিলেন, "একমাত্র মা রোহিণীদেবী ভিন্ন এমন আর কেহই নাই। সকলে একত্রিতা হইয়া মা রোহিণীদেবীকে অনুরোধ করিতে পারিলে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।" শুনিয়া সকলে রোহিণীদেবীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতঃ বৃন্দাবনলীলা-কথা শুনাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রোহিণীদেবী বলিলেন, "মা সকল! আমি মা হইয়া কিরূপ পুত্রের মধুরলীলা-কথা বর্ণনা করি? রামকৃষ্ণ বা অন্য কেহ শুনিতে পাইলে লজ্জার সীমা থাকিবে না। যদি তোমরা এমন কোন নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে পার যে, অন্য কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, তবে আমি বলিতে পারি।"

মহিষীগণ। কেন আমাদের অন্তঃপুর মধ্যে আর কে আসিবে?

মা। রামকৃষ্ণ আসিতে পারে। বৃন্দাবনলীলা-কথার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে, যে স্থানে সেই লীলা কীর্ত্তন হইবে, রামকৃষ্ণকে সেইস্থানে যাইতেই হইবে।

যতক্ষণ মা বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিবেন, ততক্ষণ সুভদ্রাদেবী দ্বারদেশে থাকিয়া দ্বাররক্ষা করিবেন; কাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এইরূপ স্থির করিয়া মহিষীগণ সুভদ্রাদেবীকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। এদিকে মা রোহিণীদেবী মহিষীগণের নিকট

ধীরে ধীরে ব্রজলীলা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনলীলা বলিতে বলিতে মা রোহিণীদেবী ও মহিষীগণ এমনই তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, কাহারই আত্মস্মৃতি নাই। ক্রমে রোহিণীদেবীর কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া অন্তঃপুর প্লাবিত করত: দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সেই অমৃতময় লীলাতরঙ্গাঘাতে ক্রমে সুভদ্রাদেবীর দেহস্মৃতি লোপ পাইতে লাগিল। এই সময় রামকৃষ্ণ বৃন্দাবনলীলা-কথার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া রাজসভা হইতে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সুভদ্রাদেবী প্রেমানন্দবিহ্বলা, ভাববিভোরা ও আত্মবিস্মৃতা। সুভদ্রাদেবীর এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে এরূপ অপূর্ব্ব ভাবের কারণ জানিবার জন্য অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ রোহিণীদেবীর শ্রীমুখোদ্গীর্ণা বৃন্দাবন-লীলারসাত্মিকা অমৃতময়ী বাণী আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র উভয়ে ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে সুভদ্রাদেবীর দুইপার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক বৃন্দাবনলীলাকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রেমের কথায় প্রেমের স্রোত বহিয়া আত্মজ্ঞানাদি ভাসিয়া গেল। আনন্দলহরীতে হাবুডুবু খাইয়া রামকৃষ্ণ ও সুভদ্রাদেবীর হস্তপদ সঙ্কুচিত এবং নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র গলিয়া লম্বিতভাব ধারণ করিলেন।

এই সময়ে স্বচ্ছন্দগতি নারদ শ্রীকৃষ্ণদর্শনমানসে দ্বারকায় উপনীত হইলেন। রাজসভায় রামকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এই মাত্র তাঁহারা অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন।" অব্যাহতগতি নারদ অন্তঃপুরের দ্বারদেশে গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণভাগে বলরাম, মধ্যস্থলে সুভদ্রাদেবী, বামভাগে কৃষ্ণচন্দ্র এবং তদ্বামে সুদর্শন চক্র। এইরূপে চারিটী মূর্ত্তি স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন। অতি

অপরূপ শোভা! সকলেরই নয়নে অশ্রুধারা, হস্তপদ সঙ্কুচিত, নেত্রদ্বয় চক্রাকৃতি এবং সুদর্শনচক্র দীর্ঘাকার। প্রেমে বিগলিত, আনন্দময়, চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিদর্শনে নারদ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া করযোড়ে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান পূর্ব্বক উঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে অন্তঃপুরস্থিতা মা রোহিণীদেবীর বর্ণিত বৃন্দাবনলীলা-কাহিনীও সমাপ্ত হইল, কৃষ্ণচন্দ্রও নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিত ভাবে ভাবসম্বরণপূর্ব্বক নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্রমে বলদেব সুভদ্রাদেবী এবং সুদর্শনও স্ব স্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া সলজ্জভাবে বলিলেন, "দেবর্ষে! মঙ্গল ত? কতক্ষণ আগমন হইয়াছে?"

নারদ। আমার সমস্ত বিবরণ পশ্চাতে নিবেদন করিব। অগ্রে আমার মনের কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে হইবে।

ভগবান্। নারদ! তোমার মনে কি কৌতূহল জন্মিয়াছে, আমাকে খুলিয়া বল।

নারদ। ভগবন্! আজ আমি আপনাদের যে অবস্থা দর্শন করিলাম, এইরূপ হইবার কারণ কি?

ভগবান্। নারদ! ত্রিজগতে তোমার অবিদিত কি আছে। তথাপি তোমার যখন কৌতূহল জন্মিয়াছে শ্রবণ কর। আজ অন্তঃপুর মধ্যে মা রোহিণীদেবী প্রাণারাম, রসময় বৃন্দাবনলীলা বিলাস বর্ণনা করিতেছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ভগিনী সুভদ্রা দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিল। মা রোহিণীদেবীর নিষেধ হেতু অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারায় দ্বারদেশে অবস্থান পূর্ব্বক সেই বৃন্দাবনলীলাকথা শ্রবণ করিয়া ভাবের তরঙ্গে আমাদের ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

শুনিয়া নারদ প্রেমানন্দে বৃন্দাবনলীলাকে এবং বৃন্দাবনবাসী-বাসিনী-

দিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্নচিত্তে নারদকে বলিলেন, "নারদ! আজ বড়ই আনন্দের দিন। অতএব তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

নারদ। প্রভো! যদি এ দাসের প্রতি কৃপা করিয়া বরপ্রদানে অভিলাষী হইয়াছেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, প্রেমে বিগলিত এই প্রেমময় চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়া বৃন্দাবনের লীলা বিলাস, ভাব ও প্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষতা আপামর সাধারণ জীবকে বুঝাইয়া দিন।

ভগবান্।/ তথাস্তু। পূর্ব্বে আমি মহামায়ার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য প্রতিশ্রুত আছি। আবার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আরাধনায় নীলাদ্রিতে প্রকাশ হইব বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। অতএব তোমাদের তিন জনের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী নীলগিরিতে দারুব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইব।

এই প্রেমময় চতুর্দ্ধা মূর্ত্তিই পুরীধামে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনরূপে বর্ত্তমান।

শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়ের মুখে এই মনোমুগ্ধকর কর্ণরসায়ন জগন্নাথ-দেবের বিবরণ শ্রবণে সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন। আহারাদির পর শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ বিশ্রাম করিলেন। আমিও সে রাত্র তাঁহাদের নিকটেই রহিলাম। পরদিন প্রভাতে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয় সগণে বসিয়া আছেন। উঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থার জন্য আমি একটু ব্যস্ত; কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন একটু অবসর পাই, অমনি আসিয়া উঁহাদের নিকটে বসি। ক্রমে অনেক লোক আসিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সকলের সঙ্গেই সমভাবে আনন্দিতচিত্তে সহাস্যবদনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কেহ কোন তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সরল ভাষায় তাহার সদুত্তর দিতেছেন। কাহার সহিত

কোন বিষয় লইয়া তর্ক করা যেন উঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। যে যাহা বলিতেছে, বিরক্তি নাই—যেন সন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি। জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ভগবান্‌কে কিরূপে পাওয়া যায়?

বাবাজী। তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়।

ভদ্র। শুধু চাহিলেই কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

বাবাজী। নিশ্চয়ই। দেখুন, ভগবান্ নিজে আমাদের হইবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাকে চাই না। চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ভদ্র। তবে আপনি কি বলিতে চান যে, আমরা ভগবান্‌কে চাহি না?

বাবাজী। না। বাস্তবিক আমরা তাঁহাকে চাহি না। আমার কথায় বিরক্ত হইবেন না। আচ্ছা বলুন দেখি, এ সংসারে সামান্য অর্থের জন্য আমরা যত কষ্ট স্বীকার করি, পুত্রকন্যা বা আত্মীয় স্বজনের কোন ব্যাধি হইলে যেরূপ ব্যস্ত হই, এক একটী বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির জন্য যত একাগ্রতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকি, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যাকুলতা বা একাগ্রতা আমাদের আছে কি? আমরা সকলেই নিজ নিজ সুখের জন্য লালায়িত। ভগবান্‌কেও যে আমরা চাই, তাহাও নিজ সুখের জন্য।

ভদ্র। মানবজীবনে সুখভিন্ন প্রাপ্তির বিষয় আর কি হইতে পারে?

বাবাজী। মানবজীবনে প্রাপ্তির বিষয় আনন্দ—সুখ নহে।

ভদ্র। আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি?

বাবাজী। সুখ মায়াকল্পিত; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্তু। সুখ নিজের জন্য ব্যস্ত—সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র; আর আনন্দ অপরের জন্য ব্যস্ত—নিজে সংসারের হইবার জন্য ব্যাকুল। সুখ প্রভু

হইতে চায়; আনন্দ দাসানুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্ব্বদাই ভয় পাছে কিছু হারায়; আনন্দ আপনার যথাসর্ব্বস্ব অকুণ্ঠিত-ভাবে বিতরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। সুখ ধূলামাটি হইতেও সতত সঙ্কুচিত—বাধাবিঘ্ন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সংসারের সকলপ্রকার বাধা বিপত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করতঃ আনন্দে পরিণত করে। সুখ সুধার জন্য লালায়িত; আনন্দ দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক সদাশিবরূপে সদানন্দে বসিয়া থাকে। ফল কথা—সুখ স্বার্থপর; আনন্দ নিঃস্বার্থ।

ভদ্র। এ আনন্দ পাইবার উপায় কি?

বাবাজী। ভগবৎ-নামসংকীর্ত্তনই আনন্দ এবং ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এটী আমার নিজের কথা নয়; সনাতন আর্য্যশাস্ত্রও উচ্চকণ্ঠে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন:—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ। ইত্যাদি

ভদ্র। কোন কোন শাস্ত্রে এ কথা আছে বটে; কিন্তু অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মত এবং অনন্ত পথ। নামসংকীর্ত্তন তন্মধ্যে একটী মাত্র পথ হইতে পারে।

বাবাজী। তাহা নয়। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন:—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ভদ্র। আপনি কি বলিতে চান যে, কলিকালে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা প্রভৃতিতে কিছুই ফললাভ হইবে না?

বাবাজী। কেবল যে আমিই এ কথা বলি, এমন নয়। আর্য্যশাস্ত্রও স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়া থাকেন। যথা:—

ধ্যানাদ্ দানাৎ জপাৎ যোগাদ্ যৎফলং ভুবি বিশ্রুতং।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য তৎ ফলং জায়তে ধ্রুবম্॥

দেখুন, পথ কোনটীই হেয় নহে; সরল অন্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত যিনি যে কোনও পথ অবলম্বন করিবেন, তিনি তাহাতেই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে সরলতা এবং ব্যাকুলতাই আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেটী দেশ কাল পাত্রের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা হইল কি না, তাহাও দেখা দরকার। যোগাদির জন্য যেমন দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন, আমাদের তাহার সম্পূর্ণ অভাব। তৎপর মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যেরূপ গুণসম্পন্ন উপাদানে গঠিত হইলে যোগাদির কঠোর নিয়ম সংযমাদি প্রতিপালনে সমর্থ হওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। কারণ কলিহত দুর্ব্বল জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ। দেশের অবস্থাও যাগযজ্ঞাদির প্রতি-কূল বই অনুকূল নহে। আবার কালপ্রভাবে যজ্ঞীয় দ্রব্য, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ এবং বিশুদ্ধ মন্ত্রাদিরও একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। আমরা সভ্যতোন্মুখ কলির জীব। স্বার্থবশতঃ নিরন্তর বাসনা কামনার ঘাত প্রতিঘাতে মোহান্ধ হইয়া কলিরাজের শাসনে কামাসক্ত ও পাপোন্মুখ হওয়ায় মায়াকূপে নিপতিত। এখনকার উচ্চ শিক্ষার ফল প্রায়ই নাস্তিকতায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থার ব্যবস্থা—এ রোগের ঔষধ ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা প্রভৃতি হইতে পারে কি না সহজেই বুঝা যাইতেছে। তাই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ পরহিতরত মহর্ষিবৃন্দ আমাদের এই রোগের একমাত্র মহৌষধ নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইটী পাছে ভুলিয়া যাই বলিয়া দৈন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে যাজন করতঃ আমাদের রোগমুক্তির উপায় ও

ভগবৎপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। আমরা যদি নিবিষ্টচিত্তে আমাদের অবস্থা ভাবিয়া দেখি, তবে সহজেই বুঝিতে পারিব যে, আমাদের জীব বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ভুল; কারণ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, এই অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে জীব আখ্যা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের সে বিশ্বাস হইয়াছে কি? বিষমব্যাধিগ্রস্ত আমাদের এইরূপ ঘোর দুরবস্থাদর্শনে পরমদয়াল, পতিতপাবন নিতাইচাঁদ (বলিতে বলিতে চক্ষু আরক্তিম ও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল) জীবের দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে সেধে যেচে মা'র খেয়ে পায়ে প'ড়ে হরিনাম মহৌষধ দিয়াছেন। আমরা এমনই বিকারগ্রস্ত রোগী যে, ভ্রমেও একবার সেই ঔষধের কথা মনে করি না বা অমন পরমদয়াল, অযাচিতকৃপাকারী বৈদ্যের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি না। ধিক আমাদের জীবনে। কি আর বলিব? আমরা ঘোর পাপাসক্ত অধর্ম্মপরায়ণ কামনাবাসনার কিঙ্কর দুর্ব্বল কলিহত জীব। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই আমাদের পরিত্রাণের পরম উপায়।

ভদ্র। আপনি যদি বিরক্ত না হন, তবে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে বলুন। আমার বিরক্ত হইবার কোনই কারণ নাই। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনারা আমার সহিত ভগবৎ সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন।

ভদ্র। একমাত্র হরিনামসংকীর্ত্তনই যদি উদ্ধারের পথ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত অনন্ত পথ, অনন্ত মত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবে নানাদেবদেবীর উপাসনা ত কিছুই থাকে না এবং ঋষিগণ-প্রতিপাদ্য বিধিসকল একেবারেই অলীক ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে।

বাবাজী। কেন, কিসে আপনি এরূপ অনুমান করিতেছেন?

ভদ্র। আপনিইত বলিলেন;—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ অর্থাৎ কলিতে হরিনামই একমাত্র উদ্ধারের পথ—অন্য পথ নাই।" তাহা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন কি? আপনার কথায় বুঝা যাইতেছে যে, আপনার কথিত পথটিই প্রকৃত পথ, অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার কোনই আবশ্যকতা নাই। সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের কি ইহাই অভিমত?

বাবাজী। না, না আমি এরূপ বলি নাই বা সনাতন হিন্দুশাস্ত্রেরও এরূপ অভিপ্রায় নহে। এই বিশ্বরচনার চতুর্দ্দিকেই বৈচিত্র্যময়। একটী বৃক্ষে কত লক্ষ লক্ষ পত্র; কিন্তু দুইটী পত্র একরূপ নহে। জগতে কত কোটি কোটি মানব; কিন্তু দুইটী মানব আকৃতি ও প্রকৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বসংসারের একদিক এইরূপ বৈচিত্র্যময় পার্থক্য, তেমনি তাহার অপর দিকে একটী অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র খসিয়া মাটীতে পড়িতেছে, সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে মানবজাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বরূপ, স্বভাব, ভাব ইচ্ছা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর সংসারে বিচরণ করিতেছে, তাহারাই আবার প্রত্যেকে একস্থানে এক আনন্দের জন্য লালায়িত। যে যাহা করিতেছে তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব এই জগতে একই ঈশ্বরের একই শক্তির দুই প্রকার খেলা নিরন্তর দেখা যায়। একটী আকর্ষণ, একটী বিকর্ষণ। একটী কেন্দ্রানুগ, একটি কেন্দ্রাতীগ অর্থাৎ একটি টান রাখা—অপরটী ছাড়িয়া দেওয়া। একটীর স্বধর্ম্ম অনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ—অপরটীর স্বধর্ম্ম অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম উল্লাসকে একটী পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যর মধ্যে

মিলাইয়া দেওয়া। অতএব যদি এই বিশ্বসংসারের সমস্ত বিষয় আমূল পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য, দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈত অর্থাৎ অপূর্ব্ব মিলন দেখা যায়। এইটাই প্রকৃতির নিয়ম। বহুর মধ্যে একেরই লীলা অর্থাৎ বহু হইয়া লীলা করাই লীলাময়ের লীলামাধুর্য্য। যে শাস্ত্রে বা ধর্ম্মে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেই শাস্ত্র বা ধর্ম্ম কখনও যথার্থ সত্য হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে ও আর্য্যধর্ম্মে কুত্রাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না; অতএব উহা যথার্থ সত্য। আমাদের সনাতন আর্য্যধর্ম্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম, ইহা যে মানবের পূর্ণতম পরিণতির একমাত্র উপায় এবং অন্যান্য যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একক উপলব্ধি করান—বহুর মধ্যে একের সামঞ্জস্য। তাই আমাদের ত্রৈত্রিংশ-কোটি দেবতা। আমাদের মধ্যে এত বিভিন্ন সম্প্রদায় হইলেও ঐ সমস্তেরই উদ্দেশ্য সেই সচ্চিদানন্দ গোবিন্দকে উপলব্ধি করান। শাস্ত্র যেখানে বলিয়াছেন, নামসংকীর্ত্তনই কলিতে পরম উপায়, সে স্থানে বুঝিতে হইবে যে, উহা কোন নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক নাম নহে। যেমন সত্যযুগে ধ্যান, এ কথায় ইহা বুঝা যায় না বা শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় না যে, একটী মাত্র রূপের ধ্যান; বরং শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় যে, মহর্ষিবৃন্দ শত শত বিভিন্ন দেবতার ধ্যানে তন্ময় হইতেন। এইরূপ ত্রেতায় যজ্ঞ, ইহাতে একটী মাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞের কথা বুঝায় না; তখন শত শত প্রকারের যজ্ঞাদির কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। সেইরূপ কলিতেও নামসংকীর্ত্তন বলিলে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট নামসংকীর্ত্তন বুঝায় না বা শাস্ত্রের তাহা তাৎপর্য্যও নহে। তবে কলিযুগের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা নামসংকীর্ত্তন; ধ্যান, যোগ, যজ্ঞাদি

নহে, ইহাই বুঝায়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আকরস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-তনু, যজ্ঞেশ্বর এবং পূর্ণ পূর্ণতম বস্তুকে প্রাণিগণের স্ব স্ব রুচি অনুসারে অনন্ত পথে পাইতে, অনন্ত মতে জানিতে, অনন্ত আকারে অনুভব করিতে ও অনন্ত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শে আস্বাদন করিতে হইবে ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। যদি অনন্তকে একটীমাত্র নির্দ্দিষ্ট পথেই পাওয়া বা অনুভব করা যায়; অন্য পথে পাওয়া বা অনুভব করা যায় না, এইরূপ বলা হয়, তবে সেটী কখনই প্রকৃত পথ হইতে পারে না।

ভদ্র। আপনি যে বলিলেন, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" অর্থাৎ কলিতে হরিনামই একমাত্র উপায়। ঐটীতে আর সার্ব্বজনীন নাম হইল না। উহাতে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই বলা হইল। হরিনাম বলিলে সর্ব্বধর্ম্ম বা সকল সম্প্রদায়ের কথা কি করিয়া বলা হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। হৃ ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করিয়া 'হরি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা অর্থাৎ যিনি চিত্ত মনপ্রাণকে হরণ করেন, তিনিই হরি শব্দবাচ্য। সুতরাং কালীরূপে শাক্তদের চিত্ত হরণ করেন বলিয়া তাঁহারা হরিশব্দে কালীকেই বুঝিবেন। এইরূপ শৈবগণ হরিশব্দে শিবকে, সৌরগণ হরিশব্দে সূর্য্যকে এবং গাণপত্যগণ হরিশব্দে গণপতিকে বুঝিবেন। ফলকথা যিনি যাঁহার উপাসক, তিনি তাঁহার নামকীর্ত্তন করিলেই অভিষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবেন।

ভদ্র। আচ্ছা যদি কোন প্রাকৃত বস্তু কাহারও চিত্ত হরণ করে, তবে তাহাকেও কি হরি বলিতে হইবে?

বাবাজী। 'রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শই চিত্ত হরণের মূল কারণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান্ শ্রীহরিই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আকর-

স্বরূপ। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক যে কোন বস্তুতেই চিত্ত মনপ্রাণ হরণ করুক না কেন, তত্ত্বতঃ সেইটাই শ্রীহরির কার্য্য জানিতে হইবে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল বস্তুনিচয়ই ভগবান্ শ্রীহরিতে পর্য্যবসিত।

ভদ্র। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। আমরা অনাদিবহির্মুখ কলিহত জীব; আমাদের মন বুদ্ধি সর্ব্বদা অবিদ্যা ও অজ্ঞানাবৃত। সেই অবিদ্যা ও অজ্ঞান দূরীভূত না হইলে ভগবদুপলব্ধি বা ভাবাদির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমাদের সর্ব্বপ্রথমে অবিদ্যা ও অজ্ঞান বিনাশের চেষ্টা করা দরকার। অবিদ্যা ও অজ্ঞান বিনাশের জন্য বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক। এই বিদ্যারই অবান্তর নাম ভাষা। ভাষাই বস্তুপ্রকাশক। যদি ভাষা না থাকিত, তবে আমাদিগকেও মূক হইয়া থাকিতে হইত। এমন কি, মানবের মানবত্ব বা পরস্পরের হৃদয়ের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির আদান প্রদান কিছুই থাকিত না। ভাবিয়া দেখুন, বেদ, উপনিষদাদিতে আমরা যে সকল পূর্ব্বতন মহর্ষিবৃন্দের প্রাণের ভাব ও হৃদয়ের উপলব্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, ভাষাই তাহার মূল কিনা। শাস্ত্রকথিত যে সকল অবতারকে আমরা নিত্য সত্য বলিয়া বুঝি বা বিশ্বাস করি, তাহারও মূলে ভাষা। ভাষাতেই আমরা সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। এই ভাষার মূল শব্দ। এই শব্দের আশ্রয় বা উৎপত্তি স্থান ভগবান্ শ্রীহরি। যদি বলেন কিরূপে? সৃষ্টির আদিতে আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি "তপঃ তপঃ" এই দুইটী শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাকে আদেশ করিয়াছিলেন। শব্দের এই প্রথম সৃষ্টি। তবে বুঝুন, এই শব্দ হরিতে পর্য্যবসিত হইল কি না? অন্য প্রকারে অর্থাৎ অনুলোম বিলোম ভাবে জগতের যাবতীয় বস্তুজাত একমাত্র হরিতে

পর্য্যবসিত; কারণ প্রথম আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, শব্দের কম্পনে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ুর পরস্পর ঘর্ষণে বা ঘাতপ্রতিঘাতে অগ্নি, ক্রমে ভূতত্রয়ের সংমিশ্রণে জল, আবার চারিভূতের ঘাতপ্রতিঘাতে মৃত্তিকা। এই পঞ্চভূত হইতেই ক্রমে জাগতিক বস্তু সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার বিলোম অর্থাৎ বিপরীত ভাবে দেখুন, জীবের নাশে পঞ্চভূতে, তন্নাশে পঞ্চতন্মাত্রে, তন্নাশে তত্ত্বে, তত্ত্বনাশে প্রকৃতিতে, প্রকৃতির অভাবে একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীহরিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব হরের্নাম শ্লোকদ্বারা যে কলিতে একমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে, এই হরি শব্দে তত্ত্বতঃ পরম পুরুষ গোবিন্দকে বুঝাইলেও শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি কোন দেবতাই বাদ পড়িলেন না। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।"

ভদ্র। আপনি যদি কোন অপরাধ না লন, তবে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। সে কি বাবা! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার নিকট কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচের কারণ নাই। বরং তাহাতে আমি পরম আনন্দিতই হইব।

ভদ্র। নামের সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, সে সকলই শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নামের অর্থ বুঝিতে চাহি না। তবে কেবল মুখে অর্থাৎ একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেই কি নাম করা হয়? আর তাহাতেই কি পরমপদ লাভ হয়? মোটের পর আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি। আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাবলম্বিগণ উচ্চকণ্ঠে নামের মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথার ভাব এই যে, নাম

করিলেই পরমপদ লাভ হয়। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে আজকাল যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে এত আবর্জ্জনা কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু চারিশত কয়েক বৎসর মাত্র অপ্রকট হইয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ যত আবর্জ্জনাময় হইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অপর কোন ধর্ম্মের এত শীঘ্র এইরূপ অবনতি হইতে দেখা যায় না। প্রত্যক্ষভাবে চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে যে, যাঁহাদের জীবিকার উপায় একমাত্র হরিনাম অর্থাৎ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা অহরহ নাম করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি একটুকু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ঘোর নাস্তিক কুতর্কনিষ্ঠ পাষণ্ডগণও যে বীভৎস কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাঁহারা অকাতরে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এমন কি সামান্য নীতির বহির্ভূত কার্য্য করিতেও তাঁহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ জন্মে না। ইহার কারণ কি? আমি নামের প্রতি কটাক্ষ করিতেছি না। বড়ই প্রাণের ব্যথায় আপনাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বাবাজী। আপনার প্রতি মহাপ্রভুর বড়ই কৃপা; তাই আপনার প্রাণের মধ্যে এইরূপ ব্যথার সঞ্চার হইয়াছে। আমার বোধ হয়, আপনার মনের ভাব এই যে, শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—ভগবৎ-নামই পরমপদ লাভের একমাত্র উপায়। এই নাম বলিতে কি বুঝা যায়? একটী পাখী মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অর্থাৎ জড় যন্ত্রের ন্যায় কেবল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে মাত্র। তাহাতে তাহার পরমপদ লাভ হইবে কি না; অর্থাৎ বস্তুলক্ষ্য নাই, প্রাণে আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই, মনে ধারণা নাই—প্রাণহীন, মনহীন, হৃদয়হীন, জ্ঞানহীনের কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণই কি সাধন?

ভদ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এইরূপই বটে।

বাবাজী। দেখুন, এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর আমি আর কি বলিব? শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন:—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

অর্থাৎ সঙ্কেতে হউক, পরিহাস করিয়াই হউক, উপদেশস্থলে হউক বা হেলায় হউক একবার ভগবৎ-নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই জীব বহু-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করে। যথা—মহাপাপী যবন মৃত্যুকালে বিভীষিকা দর্শনে হারাম হারাম (শূকর) এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া এবং অজামিল দস্যু মৃত্যুকালে নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিল। ইত্যাদি। যদি বলেন, নামপরায়ণ ব্যক্তিদিগের এরূপ কুৎসিত আচরণ দেখা যায় কেন? এই বৈপরীত্যের প্রতি নাম উচ্চারণমাত্র কারণ নহে। আমার মনে হয়, নামাপরাধই এই রূপ বৈপরীত্যের একমাত্র কারণ। যেহেতু নাম অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ বা নাম শক্তিবলে দুষ্কার্য্য করা ঘোর অপরাধের কার্য্য। অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় অমূল্য নামের বিনিময়ে কিনা সামান্য অকিঞ্চিৎকর অর্থ গ্রহণ? ইহাও কি অপরাধের কারণ নহে? শ্রীমন্মহাপ্রভু নিতাইচাঁদকে অযাচকে নাম বিতরণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। আমরা কিনা সেই নাম অবলম্বনে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি! ধর্ম্মজগতে এ কাজটী যে কতদূর গর্হিত, একবার ভাবিয়া দেখুন। এই নিমিত্তই আমাদের এত অবনতি। আবার এক শ্রেণীর লোক নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে লোকনিন্দা বা সমাজশাসনের ভয়ে সদ্বেশ বা তীর্থস্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার অর্থ-লাভ বা প্রতিষ্ঠার আশায় অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে

মহদ্‌বেশ অবলম্বন পূর্ব্বক দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে লোক প্রবঞ্চনা দ্বারা মহাজনগণের পথে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। জগতে যে সকল লোক এইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন, আপনি কি তাঁহাদের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু, অনুরাগী, ভগবন্নিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের তুলনা করিতে চান? ব্যবসায়ী ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিদিগের ক্রিয়াকলাপকে আপনি কি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে চান? আমি কাহারও প্রতি কটাক্ষ বা পক্ষপাত করিয়া বলিতেছি না। যথার্থই বলিতেছি, কোন ব্যক্তিগত ব্যবহার বা ব্যবস্থা সার্ব্বভৌম ধর্ম্মগত হইতে পারে না।

ভদ্র। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক হওয়ায় প্রকৃত বৈষ্ণব বাছিয়া বাহির করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আপনার সুমীমাংসায় আমার মনের সন্দেহ ও প্রাণের ব্যথা অনেকটা প্রশমিত হইল। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম; সে জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

বাবাজী। পরমদয়াল নিতাইচাঁদের কৃপায় আপনাদের সহিত নানারূপ ভগবৎ-কথার আলোচনায় আজ আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম।

এইরূপে বাবাজী মহাশয় সকলেরই মনের অভাব, প্রাণের পিপাসা, অন্তঃকরণের তাপ, চিত্তের সংশয় দূর করিয়া পরম শান্তি সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। আমার মনের অবস্থা কেমন এক রকম হইয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে যে, আমার মত কুসংস্কার-মেঘাচ্ছন্ন মহামোহান্ধকারে পতিত অভিমানী বাবুদিগকে আনিয়া এই ভিখারী বৈরাগীটির নিকট উপস্থিত করিয়া দেই।

ক্রমে বেলা অতিরিক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাবাজী মহাশয়! বেলা অধিক হইল, স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সেবার পর বসিয়া কথাবার্ত্তা করিলে ভাল হইত না?" শুনিয়া ঠিক্ বালকের

ন্যায় স্নান করিতে চলিলেন। আমি যতই তাঁহার মধুর ব্যবহার দেখিতেছি, ক্রমে ততই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। স্নানাদি শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করতঃ সকলেই বিশ্রাম করিলে আমিও উহাদের শেষ অধরামৃত পাইয়া বিশ্রাম করিলাম।

অপরাহ্ণ আন্দাজ পাঁচটার সময় আর একটী সংকীর্ত্তনের দল আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দলে দশবারজন লোক। উহাদের মধ্যে অনুমান কুড়ি বাইশ বৎসর বয়স্ক একটি ছেলে মূলে গান করিতেছিল। ছেলেটীর কণ্ঠস্বর বড়ই মিষ্ট। আমরা সকলেই বাহিরে আসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি আখর। প্রতি কথায় যেন কতই সুধাবর্ষণ হইতেছে। কিছুসময় কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় আসিয়া ঐ ছেলেটীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রথমে আমি মনে করিলাম, এ কান্না কিসের? মায়ার না প্রেমের—সুখের না দুঃখের—স্বার্থের না নিঃস্বার্থের? ক্ষণকালমধ্যে আমার সে সন্দেহ মিটিয়া গেল। কিছুকাল পরে বুঝিলাম, এ কান্না প্রেমের কান্না। এ কান্না যতই বাড়িতেছে, সুখের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাবাজী মহাশয় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "রাম! এবার আমার সঙ্গে পুরী যাইবে?"

রাম। আপনার কৃপা, আর নিতাইচাঁদের ইচ্ছা।

তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, এই বালকটীর নাম রামদাস। বাবাজী মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোথায় আছ?"

রাম। (একটী ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া) রামবাগানে ইঁহাদের বাড়ীতে আছি। সে পাড়ার সকলে কীর্ত্তনানন্দ বড়ই ভাল বাসেন ও কীর্ত্তনে যোগ দিয়া থাকেন। তাই সেখানে থাকিতে আমার বড়ই ভাল লাগে।

এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ পুনর্ব্বার নাম করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই হইতে রামদাস প্রত্যহই আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। আমরাও তাহার মধুর ব্যবহারে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। বাবাজী মহাশয় তাহাকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতেন। আমার বড়দাদা কুঞ্জবাবু যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায়ই রামদাসকে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীমদ্‌বাবাজী মহাশয়ের নিকট অনেকেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে লাগিল। আমিও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ কুঞ্জ! আমার ইচ্ছা হইতেছে, কিছুদিনের জন্য গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন স্থানে থাকি।" অমনি আমার মাতুল বাবু বটকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "যদি আমার প্রতি আদেশ করেন, তাহা হইলে সকলকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী আমার বাগান বাড়ীতে লইয়া যাই।" আমরা সকলেই সেই স্থানটী অতি মনোরম বলায় বাবাজী মহাশয়ের অনুমতিক্রমে গাড়ী করিয়া বটুমামার বাগানবাড়ীতে যাওয়া হইল। স্থানটী অতি নির্জ্জন ও মনোরম। বাবাজী মহাশয় মনোমত স্থানটী পাইয়া পরমানন্দে নামকীর্ত্তন করতঃ শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলেন। আমার বড় দাদা প্রায় সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকেন এবং অন্যান্য অনেক বাবু ভায়াগণ নামমাত্র অফিসে যান; অবকাশ পাইলেই আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হন। রামদাস ইঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। রাম যেন বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত। যখন তখনই আদর করিয়া বলেন, "রাম! একটু নামশুনাও ত ভাই!" রামও দাদার আজ্ঞা পাইবামাত্র প্রেমানন্দে গরগর হইয়া প্রাণমাতান, হৃদয়গলান, ভাবগদগদকণ্ঠে নাম করিয়া দাদার এবং অপরাপর সকলের প্রীতিবর্দ্ধন করেন।

সালিখায় কীর্ত্তন।

এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন বাবাজী মহাশয় **দাস গদাধরের** পাটদর্শনমানসে এঁড়েদহ যাইতে মনস্থ করিলে একজন বলিলেন, "আজ সালিখায় কীর্ত্তন করিবার কথা আছে; অতএব পাট-বাড়ী দর্শন করিয়া একেবারে বরাবর সালিখা যাওয়াই সুবিধা হইবে।" বাবাজী মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। যথাসময়ে সকলেই এঁড়েদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে পাটবাড়ী উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। বাবাজী মহাশয় দাস গদাধরের সহিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলন এবং নানারূপ লীলাদির কথা পদে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের অবধি নাই—মাতামাতি কীর্ত্তন! কাহারই দেহস্মৃতি নাই। দাস গদাধরের গোপীভাবে নৃত্য প্রভৃতির কথা কীর্ত্তন করিয়া বাবাজী মহাশয় এক একবার অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন। এঁড়েদহ-গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নানাবিধ সাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত-কলেবর বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া এবং মনপ্রাণমাতান সংকীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময় সহকারে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "অমরা কখনও এরূপ কীর্ত্তনশ্রবণ বা এরূপ প্রেমবিকার দর্শন করি নাই। আমাদের মনে হইতেছে, আজ যেন প্রেমের মূর্ত্তি রাধাভাবাবিষ্ট দাস গদাধর পুনঃপ্রকট হইয়াছেন।" বাবাজী মহাশয়ের ভাবদর্শন ও কীর্ত্তনশ্রবণে ভাবুক ভক্তগণ সেই অতীত কালের দাস গদাধর সহ নিতাইচাঁদের লীলাখেলা যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ এইরূপভাবে কীর্ত্তননর্ত্তনে উপস্থিত জনসাধারণের মনপ্রাণ মোহিত করিয়া সালিখা রওনা হইলেন। এঁড়েদহ-নিবাসী অনেক

ভক্তগণও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বাবাজী মহাশয় ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মঙ্গলময় পরম কারুণিক দয়ার আধার ভগবান্ যখন যাহা করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। আজ মহামারী প্লেগ ব্যাপার উপলক্ষে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিব কি দোষ দিব? পক্ষপাতী বলিব কি নিরপেক্ষ বলিব? মঙ্গলময় বলিব কি অমঙ্গলময় বলিব? দযাময় বলিব কি নির্দ্দয় বলিব? সুখময় বলিব কি সুখচ্ছেদক বলিব? আমরা কলিহত ক্ষুদ্র জীব; সুখ দুঃখ দুইটী বস্তু লইয়াই আমাদের ব্যবহার। একটী পরমানন্দ, অপরটী ঘোর নিরানন্দ। একটী জ্যোতির্ম্মণ্ডল, অপরটী নিবিড় অন্ধকার। ভগবান্ কিন্তু এ দুয়ের অতীত। তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, রসময়তনু, পরমদয়াল প্রেমদাতা।

ভক্তগণ। আজ্ঞে, আপনি একবার বলিলেন, ভগবান্ সুখদুঃখ দুইয়েরই অতীত; আবার বলিতেছেন, তিনি সুখস্বরূপ ইহা কিরূপে সম্ভবে?

বাবাজী। ভগবান্ সুখস্বরূপ সত্য; কিন্তু আমরা যাহাকে সুখ বা আনন্দ বলি, তিনি তাহার অতিত। কারণ আমাদের পুত্র জন্মিলে সুখ, মৃত্যুতে দুঃখ, ধনাগমে আনন্দ, ধননাশে হা হুতাশ, বন্ধুজন সমাগমে হর্ষ, বিয়োগে দুঃখ। এ দুইটীই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণিক। আমাদের চেষ্টা অজ্ঞ বালকের বা সন্নিপাত বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়। বালক ধূলামাটী মাখিয়া সুখ বোধ করে—ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া কালসর্পের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আনন্দ পায়। আমরাও ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ময়লা মাটি গায়ে মাখিয়া সুখবোধ করি। ক্রীড়ার সামগ্রী—আনন্দের পুতুল বলিয়া কালসাপিনী রমণীর পশ্চাৎ ধাবিত হই। বালক যেমন মা ধূলামাটী ঝাড়িয়া কোলে লইতে গেলে মাকে শত্রু মনে করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়—ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে সর্পের পশ্চাৎ ধাবিত বালক

নিবৃত্তকারী ব্যক্তিকে যেমন আপন সুখভঙ্গকারী শত্রু মনে করিয়া তাহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে চায়, আমরাও ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দা প্রভৃতি মলিনতাদূরকারী গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশকে দুঃখকর মনে করিয়া তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিতে ইচ্ছা করি। কাম, ভোগাদি ক্রীড়াকৌতুকের অনিষ্টতা-প্রতিপাদক শাস্ত্র বা তদুপদেষ্টা সাধুদিগকে নিজ-সুখোচ্ছেদক বৈরি মনে করিয়া তৎসঙ্গত্যাগে ইচ্ছা করিয়া থাকি। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন পিপাসায় কাতর হইয়া জল প্রার্থনা করিলে সদ্বৈদ্য বা আত্মীয়গণ জল না দেওয়ায় সে তাহাদিগকে নিষ্ঠুর মূর্খ মনে করে, আমরাও সেইরূপ নিজ ইষ্টানিষ্ট না বুঝিয়া ভগবানের নিকট যাহা তাহা চাহি; কিন্তু তিনি না দিলেই তাঁহার বাঞ্ছাকল্পতরু নামে অযোগ্যতা ও পক্ষপাতিত্ব আরোপ করিয়া থাকি। আজ যদি এই মহামারী ব্যাপার উপস্থিত না হইত, তবে কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ ভুবনমঙ্গল নামসংকীর্ত্তনের বিরাট আয়োজন হওয়া কি সম্ভব ছিল? এই সালিখা স্থানটী তোমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছ, আজও দেখিতেছ। দেখ কি মনোহর শোভা! প্রতি রাস্তার উভয় পার্শ্বে কত কত নানাবর্ণের নিশান উড়িতেছে। শত সহস্র কদলীবৃক্ষ প্রোথিত হইয়াছে। প্রতি গৃহদ্বার কেমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে। দেখ দেখ, সংকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিদিগের শ্রান্তিদূর করিবার মানসে এক এক স্থানে কত ডাব নারিকেল, বরফ, গোলাপজল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই মহাবিপদের সময় যাঁহারা অন্য চেষ্টা বা অনুষ্ঠান না করিয়া ভুবনমঙ্গল নামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দেই। আজ এই আনন্দময় ব্যাপার দর্শনে কুন্তীদেবীর প্রার্থনাটীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন :—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌॥

এইরূপে নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নানাদিক হইতে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। কত কত কীর্ত্তনের দল আসিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল, কে তাহার সংখ্যা করে? দুঃখের দিনের কান্না, বিপদ সময়ের ডাক স্বভাবতই অনুরাগমাখান হইয়া থাকে; সুতরাং প্রভুর শ্রুতিগোচর হইতেও বোধ হয় বেশী বিলম্ব হয় না। আজ এ ডাকও যেন কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য-বৈষ্ণব-ব্রাহ্ম বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডাল ভেদাভেদ নাই। সকলেই সমস্বরে প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতায় প্রাণের আবেগে এমনই উচ্চকণ্ঠে "হরিবোল" ধ্বনি করিতেছে যে, আনন্দময়ের আনন্দময় নামধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করিয়া বিরজার পার গোলক বৈকুণ্ঠে আনন্দময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণ চুম্বন করতঃ দয়াময়ের আদেশে জগবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রতিধ্বনিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যেন আবালবৃদ্ধবনিতা, স্থাবর জঙ্গম পশুপক্ষীকে দ্বিগুণতর আনন্দিত করিতেছে। কাহারই দেহ-স্মৃতি নাই—সকলেই যেন নামরসে মাতোয়ারা। অসংখ্য লোক—জাতি, কুল, বিদ্যা ও মানের গৌরব তৃণতুল্য পরিত্যাগ করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত-কলেবরে গলদশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে "হরিবোল হরিবোল" বলিতে বলিতে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। বিলাসী যুবকবৃন্দের বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধূলিধূসরিত হইতেছে। বাবাজী মহাশয় যেন আনন্দ-সাগরের অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত। ঊর্দ্ধনেত্রে চরণে চরণ রাখিয়া দুইটী বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

আর এক একবার ভাবভরে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। অঙ্গের ধূলিসকল ঘর্ম্মজলে কর্দ্দমাকার ধারণ করিতেছে। কর্দ্দমাক্ত শরীরে ক্ষণে ক্ষণে এরূপ পুলকোদ্গম হইতেছে যে, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক একবার হুঙ্কারধ্বনিতে সর্ব্বংসহা পৃথিবীও যেন কম্পিতা হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল দেহযষ্টিখানি এরূপভাবে বিকম্পিত হইতেছে যে, দর্শকবৃন্দের মনে সমকালীন আনন্দ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইতেছে। সহস্র সহস্র লোকের কেন্দ্রীভূত হইলেও ইঁহার মস্তকটী সকলের মস্তকোপরি বিতস্তি-প্রমাণ উর্দ্ধে থাকা হেতু সমভাবে সকলেরই নয়ন-গোচর হইতেছে।

এইরূপভাবে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ হইবার পর ইঁহারা সকলে কোন একটী স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সালিখাবাসী বহু ভদ্রলোক ঠাকুরের প্রসাদী ডাব, সরবত ও নানারকম মিষ্টান্ন দ্বারা ইঁহাদের শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। প্লেগ উপলক্ষে নির্দ্দিষ্টভাবে যেদিন যেস্থানে সংকীর্ত্তন হইতেছে, সেদিন সেস্থানের লক্ষ লক্ষ লোক যেন প্রেমানন্দ-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কাহার সাধ্য এই মহাসংকীর্ত্তনানন্দ-ব্যাপার ভাষায় প্রকাশ করে? কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে সকলেই বাবু বটু মল্লিকের বাগান বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

মুকুন্দ ঘোষের বাড়ীতে আম খাওয়া।

আজ মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সদলে বাবাজী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ। মুকুন্দ ঘোষ মহাশয় ইঁহাদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বটুবাবুর বাগানবাড়ীতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইঁহাদের উপর সস্ত্রীক ঘোষ মহাশয়ের সন্তান-বাৎসল্য। আজ পুত্রগণের

উপর পিতার অভিমান জন্মিয়াছে। কতদিন হইল ছেলেরা একবার বাড়ীতে যায় না বা কোন জিনিষ চাহিয়া খায় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আজ আমি নিশ্চয়ই যাইব। আপনি বাড়ী গিয়া মাকে ভাল ভাল খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বলুন। আজ অনেক দিনের খাওয়া একদিনে খাইয়া আসিব।" ঘোষ মহাশয় সে কথায় স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন, "বাবা! আমি তোমার ওসব কথা শুনিতে চাহি না; আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে।" তখন সকলে অগত্যা তাঁহার সঙ্গেই চলিলেন। রসময়তনু পরম কৌতুকী বাবাজী মহাশয় ঘোষ মহাশয়ের মনঃকষ্ট দূর করিবার জন্য গাড়ীতে বসিয়া বালকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আজ আমাদিগকে কি কি খাওয়াইবেন? আমার কিন্তু আজ বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে। বাসায় পৌঁছিবামাত্রই আমাকে কিছু খাইতে দেওয়া চাই। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। আম দুধ ত আছেই, তা ছাড়া আরও অনেক রকম খাবার দিতে হইবে" ইত্যাদি। ঘোষ মহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! সকলই ত তোমাদের, আমি ত নিমিত্তমাত্র। তোমার মার কাছে চল, যাহা হয় হইবে।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে বাৎসল্যময়ী ঘোষ মহাশয়ের পত্নী অভিমানভরে বাবাজী মহাশয় আসিলে সহজে তাঁহার সহিত কথা বলিবেন না স্থির করিয়া আছেন। মা (ঘোষ মহাশয়ের পত্নী) অভিমান করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়াই যেন বাবাজী মহাশয় আগেই তাহার প্রতিবিধান করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই বালকের ন্যায় আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কৈ গো মা কৈ? আমার বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে, শীঘ্র কিছু খেতে দাও।" শুনিবামাত্রই বাৎসল্যরসের

অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। আস্তে ব্যস্তে ঠাকুরের প্রসাদী রাবড়ী, সন্দেশ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সকলকে বাঁটিয়া দিতে লাগিলেন। ঘোষ পত্নী যেন আজ নন্দঘোষপত্নী হইলেন। প্রত্যেককে এক একটী দ্রব্য জেদ করিয়া করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় ও ইঁহার সঙ্গিগণ যেন মায়ের নিকট বালকের ন্যায় খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরমানন্দে বাল্যভোগ প্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

এদিকে ভোগরাগের আয়োজন হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঘোষ মহাশয় বাজার হইতে কয়েকটি বড় বড় ফজলী আম আনিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তখন ছেলেদের আম খাওয়া হয় নাই। অতএব এই আম কয়েকটি এখনই অমানিয়া করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হউক।" শুনিয়া ঘোষ-পত্নী হৃষ্টচিত্তে আম কয়টী ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ঘোষ মহাশয় প্রফুল্লমনে যে ঘরে বাবাজী মহাশয় বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘোষপত্নী প্রসাদী আমগুলি একখানি পাথরের থালায় করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন এবং বাৎসল্য প্রেমে গরগর হইয়া একখানি আম বাবাজী মহাশয়ের মুখে তুলিয়া দিলেন। সঙ্গিগণ পাশের ঘরে বসিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের মুখে আমখানি দেখিবামাত্র রামদাসের মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অমনি ছুটিয়া আসিয়া বামহাতে বাবাজী মহাশয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ইঁহার মুখস্থিত আমখানির অর্দ্ধাংশ কামড়াইয়া ধরিলে সখ্যরসের মূর্ত্তি বাবাজী মহাশয়ও প্রেমভরে রামকে কোলে ধরিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অনির্ব্বচনীয় সখ্যরসের খেলা! কি মধুর ভ্রাতৃ-বাৎসল্য! একখানি আম দুইজনে মুখে ধরিয়া আছেন। উভয়েরই চোখে জল—উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গে পুলক—উভয়েই যেন কোন এক অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে চলিয়া

গিয়াছেন। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। তখন ঘোষ মহাশয় প্রেমানন্দ-ভরে বন-ভোজনের একটি পদ ধরিলেন :—

শ্রীনন্দনন্দন, করি গোচারণ,
মলিন ও মুখশশী।
সঙ্গে হলধর, সব সহচর,
তারা মাঝে যনু শশী॥
করি নানা কেলি, হইয়া বিকলি,
বসিলা তরুর তলে।
মলয় পবন, বহে ঘন ঘন,
শীতল যমুনাকূলে॥
সকল রাখাল, ক্ষুধায় ব্যাকুল,
কহয়ে ত্যজিয়া লাজ।
মোরা সবে চাই, বনফল খাই,
শুনহে রাখালরাজ॥
সবশিশু মেলি, করিয়া ধামালি,
বনফল তুলি নিল।
খাইতে খাইতে, বড় মিঠ বলি,
কানুর বদনে দিল॥
কোন শিশু যাইয়া, মুখে মুখ দিয়া,
সে ফল কাড়িয়া খায়।
হাসির হিল্লোলে, ভাসিল সকলে,
এ দাস উদ্ধব গায়॥

গানের ভাব এবং হৃদয়ের ভাব এক হইল। আর সামালে কে? বাবাজী মহাশয় ভাবভরে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। দাঁতে দাঁত

লাগিয়া গেল। দেহখানি ধনুকের মত বাঁকা হইয়া পড়িল। মুকুন্দ ঘোষ মহাশয় পুনঃপুনঃ পূর্ব্বোক্ত পদটী গান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ আসিয়াও ঐ গানে যোগ দিতে লাগিলেন। আনন্দের অবধি নাই। হঠাৎ কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবনে প্রতিবেশীগণ আসিয়া অঙ্গনে সমবেত হইয়াছে। বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীপুরুষ সকলেই বাবাজী মহাশয়ের ঈদৃশ অবস্থাদর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সেই ধনু আকারের দেহখানিতে কখন কম্প, কখন পুলক, কখন স্বেদ, কখন বৈবর্ণ উপস্থিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় বহু সন্তর্পণে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ সখ্যরসের পদ গান করিতে লাগিলেন। রস মূর্ত্তিমান্ এবং লীলা যেন প্রকট হইল। আবাল-বৃদ্ধ-যুবা যাঁহারাই সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। সকলেই যেন সেই যমুনার কূলে বৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বনভোজনলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় সেই আমের থালাখানি হাতে করিয়া এক একখানি আম উপস্থিত ভক্তগণের মুখে দিয়া তাহাদের অধরামৃত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কখনও বা একখানি আম নিজমুখে দিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ কোন কোন ভক্তের মুখে দিতে লাগিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গেল। তখন ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর অনুরোধে কীর্ত্তনসমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ণে বহু ভক্তগণ সঙ্গে নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় সন্ধ্যা হইল। ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তনে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। এইরূপ পরমানন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে রওনা হইবেন, এই সময়ে ঘোষ মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী অগত্যা সেদিন সেখানে থাকিবার

জন্য বিশেষভাবে জেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্নেহানুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা সে বেলা সেখানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। যথাসময়ে স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

সিতিতে কীর্ত্তন।

বেলা অনুমান দুটার সময় বাবাজী মহাশয় বিশ্রামান্তে হাত মুখ ধুইয়া যেন কোথাও যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় গমনোদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া হইবে ?"

বাবাজী। একবার সিতি যাইব মনে করিয়াছি; এখন নিতাই-চাঁদের ইচ্ছা।

রাম। সিতি কাহাদের বাড়ীতে যাইবেন ?

বাবাজী। নীলরতনদের বাড়ীতে।

রাম। নীলরতনের সঙ্গে আপনার পরিচয় হইল কিরূপে ?

বাবাজী। গত মাঘমাসে ধুলটের সময় সে নবদ্বীপ গিয়াছিল। সেই সময় তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়। ছেলেটী বেশ শান্তশিষ্ট ও নম্রস্বভাব। তাহার বিশেষ অনুরোধে একবার তাদের বাড়ী যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি।

শুনিয়া সঙ্গিগণ ব্যস্তসমস্তভাবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাবাজী মহাশয় কোথায় যাইতে হইলে প্রায় কাহাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য বলিতেন না। এমন কি বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও গন্তব্য স্থানের নামও বলিতেন না। এটী ইঁহার চিরন্তন স্বভাব। সঙ্গিগণেরও অভ্যাস আছে, বাবাজী মহাশয় কাহারও

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলে কোনও একজন একাগ্রমনে ঐ কথোপকথন শুনিতে থাকেন। আজও তাহাই হইল। একজন বাবাজী মহাশয়ের সহিত রামদাসের কথোপকথন শুনিয়াছিল, সে সকলকে চৈতন্য করিয়া দিল। কাজেকাজেই কথাটা ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর শুনিতে বাকি রহিল না। তখন উভয়েই বাবাজী মহাশয়কে অন্ততঃ সেই দিনটী সেস্থানে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বাবাজী মহাশয় সেদিন তাঁহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। ইঁনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, নামে রুচি ও জীবে দয়া হউক। নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হইলে সময়ে আবার আসিয়া আনন্দ করিব। সিতির একটী ছেলেকে শ্রীধাম নবদ্বীপে বসিয়া কথা দিয়াছিলাম যে, কলিকাতা আসিলেই তাহাদের বাড়ী যাইব। তাই আজ সিতি যাইবার জন্য মনটা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।" এই বলিয়া উভয়কে প্রণামপূর্ব্বক "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম করিতে করিতে বাহির হইলেন। ঘোষ মহাশয় গাড়ী করিয়া দিবার জন্য উদ্যোগী হইলে তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা! প্রভু হাত পা দিয়াছেন। তাহারও ত একটা সার্থকতা চাই। আপনি দুঃখ করিবেন না। আমরা নাম করিতে করিতে পরমানন্দে হাঁটিয়া যাইব।" শুনিয়া ঘোষ মহাশয় একেবারে নিরুত্তর। ইঁহারা প্রেমানন্দে নাম করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুলোক রাস্তার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া মধুর নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে

চলিয়াছেন। সঙ্গিগণও খোল করতাল যোগে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে করিতে ইঁহার অনুগমন করিতেছেন। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা নাই—কত কালের সুপরিচিতের ন্যায় একেবারে সিতি বড় হরিসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে হরিসভায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় এক একবার এরূপ হুঙ্কার দিতেছেন যে, আগন্তুক লোকসকল মনে করিতেছে যেন ভূমিকম্প হইতেছে। কীর্ত্তনের মূলসূত্রটী "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" পদটী অতি সরল ও সরস; বালক-বৃদ্ধ-যুবা, মূর্খ, ইতর, ভদ্র, পাষণ্ড—যে কেহ একবার ঐ নাম শুনিতেছে, সেই প্রেমানন্দভরে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছে। এমনই নামের রোল উঠিয়াছে যে, চারিদিক হইতে গ্রামবাসী লোকসকল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া হরিসভায় নামকীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। অতি অল্পকাল মধ্যেই চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়িল যে, নবদ্বীপ হইতে একটী মহাপুরুষ আসিয়া হরিসভায় সংকীর্ত্তন করিতেছেন। আজ বাবাজী মহাশয়ের যেন স্বপ্রকাশ মূর্ত্তি। যে কেহ একবার ইঁহাকে দর্শন বা ইঁহার নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছে, সেই যেন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ঘোর পাষণ্ড হইলেও চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। একবার যাহার কর্ণে সেই শ্রীমুখের "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম প্রবেশ করিতেছে. সেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাম করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গৃহকার্য্যের অনুরোধে যাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, "আহা মরি কি মধুর কণ্ঠ! কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তন! কি হাসিমাখান মুখখানি! কিবা সুধামাখান নামের

আখরগুলি! দেখিয়া শুনিয়া যেন আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। অষ্টসাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত দেহখানির কি সুন্দর বলনী! দেখিলে যেন মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায়।" আবার কেহ বলিতেছে, "আপনিও যেইমত প্রভু নিত্যানন্দ। সেই মত করিলেন সব ভক্তবৃন্দ॥ এই মহাবাক্যটী আজ আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম।" এইরূপভাবে যাহার যেমন মনোভাব, সে সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। হরিসভাগৃহে তিলার্দ্ধ স্থান নাই—লোকে লোকারণ্য। সংকীর্ত্তনধ্বনি এবং হরি-ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। এক একবার প্রেমোন্মত্ত বাবাজী মহাশয়ের হুঙ্কার-ধ্বনিতে পৃথিবী যেন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, "আমরা কখনও এরূপ কীর্ত্তন শুনি নাই। এরূপ অলৌকিক ভাব, অমানুষিক শক্তি জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।" এইরূপ পরমানন্দে দিবা অবসান হইয়া আসিল।

এদিকে নীলরতন নামক যে ছেলেটীকে উপলক্ষ করিয়া বাবাজী মহাশয় সিতিতে আসিয়াছেন, তাহার ভয়ানক জ্বর। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে বাড়ীর বাহিরে বসিয়া আছে, এই সময়ে একজন লোক আসিয়া তাহাকে বলিল। "ভাই! নবদ্বীপ হইতে কয়েকজন বাবাজী হরিসভায় কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা কখনও এরূপ কীর্ত্তন শ্রবণ বা এরূপ নৃত্য দর্শন করি নাই। এরূপ অপূর্ব্ব ভাবাবলি মানবদেহে সম্ভবে বলিয়া এতদিন আমাদের ধারণা ছিলনা।" শুনিবামাত্র নীলরতন বুঝিতে পারিল যে, নিশ্চয়ই বাবাজী মহাশয় সগণে নবদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন। তখন সে জ্বরের কথা ভুলিয়া দ্রুতগতি হরিসভার দিকে ছুটিল। হরিসভায় উপস্থিত হইয়া দেখে যে যথার্থই সদলে বাবাজী মহাশয় আগমন করিয়াছেন। অমনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইঁহার

চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। বাবাজী মহাশয়ও কৃপাপরবশ হইয়া "কিরে নীলু আসিয়াছিস্? ভাল আছিস্ ত?" বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্পর্শমাত্র নীলরতনের দেহ সুস্থ হইল। অত বড় জ্বর—জ্বালাযন্ত্রণা কোথায় পলাইয়া গেল, ভগবান্ জানেন। নীলরতনের বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় তাহাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ছোট হরিসভায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

হরিসভার পার্শ্ববর্ত্তী ছোট খোলা ঘরে বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় নামক যশোহর জেলা নিবাসী জনৈক বৈষ্ণবাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দ্বারা পুরী, মোহনভোগ, তরকারী প্রভৃতি নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। আরতি-কীর্ত্তনান্তে বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলে মহাপ্রসাদ পাইয়া সেই হরিসভায়ই বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। দলে দলে লোক আসিয়া হরিসভা-গৃহে সমবেত হইতে লাগিল। ক্রমে কীর্ত্তন বেশ জমাট বাঁধিল। পুলিন বাবু প্রভৃতি কলিকাতাবাসী অনেক ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল যে, বাবাজী মহাশয়কে লইয়া সকাল বেলায়ই কলিকাতায় ফিরিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। নীলরতন এবং সিতিবাসী অনেক ভক্তের অনুরোধে সে বেলা সেই স্থানে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ভক্তগণ মালসাভোগ ও অন্নমহোৎসবের যোগাড় করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিনোদ ঠাকুরের দ্বারাই ভোগরাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় বেলা অনুমান দশটার সময় কীর্ত্তনসমাপ্তি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। স্থানীয় বহু ভক্তমণ্ডলী আসিয়া নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে

বিনীত বাক্যে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বেলা অনুমান তিনটার সময় তথা হইতে রওনা হইয়া বেলঘরিয়া বটুবাবুর বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডমহোৎসব।

আজ **শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর** দণ্ড মহোৎসব। পাণিহাটীতে খুব ধূমধাম। বাবাজী মহাশয় কুঞ্জবাবুকে বলিলেন, "নিতাইএর ইচ্ছায় আজ আমরা পাণিহাটী যাইব মনে করিয়াছি।" কুঞ্জবাবু বলিলেন, "প্রভুর কৃপায় আজ রবিবার পড়িয়াছে। সকলেরই ছুটী আছে। চলুন, নৌকা করিয়া সকলেই এক সঙ্গে যাওয়া যাক্।" তাহাই হইল। নামকীর্ত্তণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া একখানি বজ্‌রা ভাড়া করতঃ সকলেই উহাতে আরোহণ করিলেন। বাবাজী মহাশয় নৌকায় উঠিয়াই উচ্চৈঃস্বরে প্রেমানন্দে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম ধরিলেন। বাবুভায়াগণ সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতেছেন। নামের ধ্বনিতে তীর নীর যেন বিকম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দময়ী মা গঙ্গা যেন তাঁহার প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গলাভে কুল্‌কুল্‌ ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। যিনি যেস্থানে আছেন, তিনি সেই স্থানে থাকিয়াই নাচিতেছেন আর নাম করিতেছেন। কেহ কেহ হাতে তালি দিয়া গা দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতেছেন। মাঝি নামের তালে তালে মাথা ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া হা'লে পাক দিতেছে। দাঁড়িগণ আনন্দে বিভোর হইয়া মুখে নাম করিতেছে আর তালে তালে সজোরে দাঁড় ফেলিতেছে। উভয় তীরবর্ত্তী লোকসকল অবাক্ হইয়া নাম শুনিতেছে। বড় বড় অফিসারগণ আজ যেন বালকবৎ হইয়া গিয়াছেন। যিনি কখনও

নিতাই গৌর নাম মুখে আনেন নাই, তিনিও আজ নামরসে মগ্ন হইয়া কখন হাসিতেছেন. কখন কাঁদিতেছেন, আবার কখন বা প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের অপূর্ব্বরঙ্গ। সকলেই মাতোয়ারা—সকলেই আত্মহারা। দ্রবময়ী মা ভাগীরথী আজ প্রেমোন্মত্ত সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া উত্তাল তরঙ্গমালাচ্ছলে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। নৌকাখানি বৃহৎ হইলেও আত্মহারা পাগলপারা ভক্তগণের প্রেমের তরঙ্গে এবং আনন্দময়ী মা সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে যেন একটু অপ্রকৃতিস্থের ন্যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিতে লাগিল।

সুখের সময়টা যেন শীঘ্রই চলিয়া যায়। মাঝিগণ আনন্দভরে ডাকিয়া বলিল, "ঐ যে পাণিহাটী গ্রাম—ঐ যে গাছতলায় অনেক লোকসংঘট্ট হইয়াছে।" শুনিবামাত্র সকলে একসঙ্গে বাহিরে আসিতে উদ্যত হইলে মাঝি বলিল, "আজ্ঞে, আর একটু দেরী করুন, নৌকা তীরে লাগাইয়া দেই ; নৌকা ডুবিয়া যাইবে যে।" বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! এ যে নামের নৌকা। ইহা কি ডুবিতে পারে?" বলিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাঝি ইঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনিমেষনয়নে চাহিয়া আছে, আর অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছে। নৌকা ক্রমে ঘাটে আসিয়া লাগিল। সকলেই পরমানন্দে তীরে উঠিলেন। বাবাজী মহাশয়ের চক্ষু দুইটী আরক্তবর্ণ ; গদগদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন ;—

আহা মরি কি মধুর পাণিহাটী গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান॥
এই না তরুর তলে প্রভু দয়াময়।
রঘুনাথে কৃপা কৈলা হইয়া সদয়॥

সেই তরুবর এই সেই গঙ্গাতীর।
সেই পাণিহাটী এই সেই গঙ্গানীর॥
কাঁহা নিত্যানন্দ রাম কাঁহা তার গণ।
কাঁহা দাস রঘুনাথ দেহ দরশন॥
ওহে পাণিহাটীবাসী যত নরনারী।
দেখাও নিতাইচাঁদে করুণা বিতরি॥
তোমাদের প্রেমে বাঁধা নিতাই রঙ্গিয়া।
বিহরিছে গণসহ নাচিয়া গাহিয়া॥
তোমাদের কৃপা বিনা কে দেখিতে পারে।
দেখাইয়া সেই লীলা কিনে লহ মোরে॥
নয়নে দেখিব তারে লইয়া না যাব।
প্রেমহীন মোরা তারে রাখিতে নারিব॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ করুণা-বারিধি।
ভক্তসঙ্গে তব লীলার নাহিক অবধি॥
বড় সাধ সেই লীলা দেখিব নয়নে।
বঞ্চিত ক'রনা প্রভু ভক্তিহীন জনে॥
অদ্যাপিহ সেই লীলা করিছ হেথাই।
অভাগিয়া জন মোরা দেখিতে না পাই॥
আজ সেই রঘুনাথের কৃপাদণ্ড দিন।
আসিয়াছি দেখিবারে মোরা দীনহীন॥
ভক্তসঙ্গে সেই লীলা করি আস্বাদন।
শীতল করিব সবার তাপিত জীবন॥

বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর দাস গোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব লীলাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য। সকলেরই মুখে গৌর হরিবোল ধ্বনি—সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর। সকলেই বাহ্যস্মৃতি-রহিত। যেন প্রেমের সাগর উথলিয়া উঠিল। পাণিহাটী বৃক্ষমূলে সমবেত ভক্তবৃন্দের তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে বোধ হইতেছে যেন রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদ পুনঃ প্রকট হইয়া লীলা করিতেছেন। আহা মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রেমময় নিতাচাঁদের কি অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা! সকলেরই এক ভাব! "আপনিও যেই মত প্রভু নিত্যানন্দ। সেইমত করিলেন সব ভক্তবৃন্দ॥" এই কথাটী যেন আজ প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে লাগিল। পদে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, দাসগোস্বামীর দণ্ডমহোৎসবের সময় তীরে স্থান না হওয়ায় লোকসকল জলে নামিয়া চিঁড়া প্রসাদ পাইয়াছিল; কিন্তু আজ যেন লোকসংখ্যা তদপেক্ষাও অধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ আজ জলে স্থলে কোথাও স্থান নাই। এমন কি শেষে নৌকার উপরে উঠিয়া অনেকে মহোৎসব দর্শন, কীর্ত্তন শ্রবণ ও চিঁড়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। গঙ্গায় এত নৌকা একত্রিত হইয়াছে যে, গণিয়া সংখ্যা করা কঠিন।

এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তণের পর হঠাৎ রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মনের গতির সঙ্গে অমনি দেহেরও গতি হইতে লাগিল। সকলেই রাঘব পণ্ডিতের বাটীস্থ মাধবীতলার দিকে ছুটিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের একেবারে দেহস্মৃতি রহিত। দেখিলে বোধ হইতেছে যেন কেহ একটী ভাবের পুতুলকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। দেহখানি একেবারে স্ববশে নাই। এইরূপ পরমানন্দে কীর্ত্তন নর্ত্তন করিতে করিতে সকলে রাঘব পণ্ডিতের মাধবীতলায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা। জনৈক ভক্ত বাবাজী মহাশয়ের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন :—

কভু হর্ষ কভু রোষ, কভু উৎকণ্ঠা সন্তোষ,
উদ্বেগ বিষাদ কভু আর্ত্তি।
কভু দৈন্য প্রলাপন, কভু হাস্য রোদন,
এত ভাব এককালে স্ফূর্ত্তি॥
ভাবের বিকার যত, আপন সময় মত,
এক দেহে করিছে উদয়।
অশ্রু কম্প পুলকাদি, স্বেদ বৈবর্ণ নিরবধি,
দেখি সবার হইল বিস্ময়॥
কভু ভাবে কণ্ঠরোধ, কভু হয় আত্মবোধ,
কভু বলে গদগদ বাণী।
বিরহে ব্যাকুল হিয়া, কাঁদে কভু ফুকরিয়া
আপনাকে অভাগিয়া মানি॥

বাবাজী মহাশয়ের দেহখানি যেন ভাবসমূহের পেষণে পিষ্ট হইয়া একেবারে অন্যরূপ ধারণ করিল। এইরূপে অনেকক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ হইবার পর কোন কৌশলী ভক্ত কৌশল করিয়া আবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী সেনেদের ঠাকুর বাড়ীর বাগানে কীর্ত্তন লইয়া গেলেন। বাগানটীর শোভা অতি মনোরম। দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয়ের বৃন্দাবন ভ্রম জন্মিল। তখন ভাবাবেশে মধুর মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহু লোক-সমাগম হইয়াছে। একটী ভক্ত প্রাণের আবেগে কীর্ত্তনের মধ্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে ইঁহার দুইখানি চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। কাজে কাজেই ইঁনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই ভক্তের মনে কি ভাব উদয় হইয়াছে, ভগবানই জানেন। দেখিতে দেখিতে একেবারে অচৈতন্য হইয়া গেলেন—দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল। সঙ্গিগণ ভক্তটীর হাত হইতে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ছাড়াইয়া উঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে

গিয়া দেখেন যে বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উঁহার মুখের মধ্যে রহিয়াছে এবং মুখের দুই পার্শ্ব দিয়া রক্ত পড়িতেছে। সকলেই অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে ভক্তটীর মুখ হইতে অঙ্গুলিটি বাহির করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না; কারণ যাঁহার আঙ্গুল তিনিও ভাবাবিষ্ট, যাঁহার মুখের মধ্যে তিনিও ভাবাবিষ্ট। যত দুঃখ কষ্ট তটস্থ ব্যক্তির। ভক্তদের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। শেষে অগত্যা একটা লোহার চাবি ভক্তের মুখের মধ্যে দিয়া আঙ্গুলটী বাহির করা হইল। ভক্তটী কিন্তু তখনও সঙ্গাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। উঁহার দেহে অশ্রু-কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল এরূপভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। ক্ষণকাল পরে ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তুলিলে বাবাজী মহাশয় আলিঙ্গনদানে উঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বিশ্রাম করিবার মানসে নিকটস্থ শ্বেতপাথরের চবুতারার উপর উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে কয়েকজন ভক্ত কতকগুলি প্রসাদী আম আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে ধরিলেন। ইঁনিও সেই আমের হরিরলুট দিতে লাগিলেন। ক্রমে এত লোকসংঘট্ট হইল যে, সামলান কষ্টকর হইয়া পড়িল। আনন্দের সময় যাহা কিছু করা হয় সবই আনন্দ। আম লইয়া কাড়াকাড়ি ব্যাপারটা আজ যেন পরমানন্দময় হইয়া উঠিল। লঘু গুরু, ছোট-বড়, বালক-বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নাই। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। যিনি হরির লুটের একটী আম পাইতেছেন, তিনিই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। এইরূপে কিছু-ক্ষণ বাগান বাড়ীতে আনন্দ করিয়া বাবাজী মহাশয় ও অন্যান্য সকলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় বৃক্ষমূলে আসিলেন। বৃক্ষরাজকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক চবুতারার তলানে বহুক্ষণ কীর্ত্তন নর্ত্তন করিয়া নাম

করিতে করিতে বজ্‌রায় উঠিলেন। বজ্‌রার মধ্যেই মালসাভোগের ব্যবস্থা করা হইল। ভোগ-আরতি কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে পরমানন্দে চিঁড়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক নাম ধরিলেন। সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা। আনন্দসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। বজ্‌রার মধ্যে সকলে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সুরতরঙ্গিণী যেন প্রেমতরঙ্গিণী হইলেন। বজ্‌রা খানিও যেন নামের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্দভাবে চলিতে লাগিল। যথাসময়ে বজ্‌রাখানি বরাহনগরের ঘাটে পৌঁছিলে সকলে তীরে অবতরণ পূর্ব্বক বটুবাবুর বাগানবাড়ীতে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন।

জাহাজে শ্রীধাম পুরীযাত্রা।

বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় নানাস্থানে প্লেগ উপলক্ষে সংকীর্ত্তনানন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া একদিন শ্রীধাম পুরী যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কথাটা শুনিবামাত্র কলিকাতানিবাসী অনেক ভক্তবৃন্দের মন অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িল। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে এমন মহাপুরুষের সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছিলাম। প্রভু যে এত অল্পকালের মধ্যেই আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিবেন, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।" মহাপুরুষগণ স্বেচ্ছাময়; বিশেষতঃ বাবাজী মহাশয়। ইচ্ছা হইল ত বালকের অনুগত হইয়া চলিলেন; আর ইচ্ছা না হইলে কার সাধ্য তাঁহাকে চালায়? কুঞ্জবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি কলিকাতানিবাসী অনেক ভদ্রলোক আর কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সবই বিফল হইল। ইঁনি হাসিমুখে বলিলেন, "ভাই! আমি পরাধীন; নিতাইচাঁদ এ অধমের দ্বারা যখন যাহা করাইবেন, বাধ্য হইয়া তাহাই করিতে হইবে। তোমরা কেহ

দুঃখিত হইও না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে আবার লইয়া আসিবেন।" এই বলিয়া রওনা হইলেন। বাবাজী মহাশয় একান্তই যখন পুরী যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখন কুঞ্জবাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিনবাবুকে বলিলেন, "তুমি ইঁহাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আইস এবং যতটা রাস্তা রেলে যাইতে হইবে, তাহার পাথেয় খরচটাও উঁহাদের মধ্যে কাহারও হাতে দিয়া আসিবে।" শুনিয়া পুলিনবাবু অতি আগ্রহের সহিত ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তখন পুরী যাইবার রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, কেবল উদ্যোগ হইতেছে। পুলিনবাবু ষ্টীমারঘাটে গিয়া টিকিট করিয়া দিলে ইঁহারা উনিশজন শ্রীধাম পুরী রওনা হইলেন। পুলিনবাবুও অতি দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরিলেন।

জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল, ইঁহারাও নাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন জাহাজের সারেঙ্গ একটা কুলিদ্বারা ইঁহাদিগকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! গোলমাল নয় ত, আমরা ভগবানের নাম করিতেছি। ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না।" কিন্তু মুসলমান সারেঙ্গ কিছুতেই সে কথা শুনিল না। আরও কয়েকটী হিন্দু কর্ম্মচারী সারঙ্গের সঙ্গে যোগ দিলে বাবাজী মহাশয় আর তাহাদের কথায় প্রতিবাদ না করিয়া মৌনভাবে রহিলেন। ক্রমে জাহাজখানি যতই সমুদ্রপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, বাতাসও ততই বাড়িতে লাগিল। এক একবার তরঙ্গের জল জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরোহীদিগের বস্ত্রাদি ভিজাইয়া দিতে লাগিল। উত্তালতরঙ্গমালা দর্শনে সকলের প্রাণে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ইঁহারা যেমন গগনভেদী স্বরে "জয় নিত্যানন্দ রাম" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, অমনি সেই তরঙ্গগুলি জলে মিশিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া সারেঙ্গ ইঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ

নাম করিতে বলিয়া পাঠাইলে বাবাজী মহাশয় সেই কুলিকে বলিলেন, "তুমি গিয়া সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর, এইরূপ তরঙ্গের সময় সারেঙ্গ সাহেবের গোলমাল ভাল লাগিবে কি? এ সময় ওটা বাদ দিলে ভাল হয় না?" কুলির মুখে এই কথা শুনিয়া সারেঙ্গ বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়! আমি বুঝিতে না পারিয়া তখন আপনাদিগকে ভগবানের নাম করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। বোধ হয় সেই পাপেই আমাদের এরূপ শাস্তি হইতেছে। আপনারা সে কথায় কিছু মনে না করিয়া ঈশ্বরের নাম করুন। এই প্রাণসংশয়ের সময় আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা করিব।" এই বলিয়া দ্রুতগতি স্বস্থানে গমন করিল। বাবাজী মহাশয় দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং নিতাইচাঁদকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত হিন্দু নামধারী বাবু মহাশয়গণ এক একবার প্রাণের ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে জাহাজখানি যেমন কালাপানির মধ্যে গিয়া পড়িল, অমনি অনেকেই কালাপানির দুর্গন্ধে বমি করিতে লাগিল। এক একবার জাহাজখানা তরঙ্গাঘাতে প্রায় জলমগ্ন হইতেছে। আরোহীদের কণ্ঠ পর্য্যন্ত জল; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই প্রাণের ভয়ে উচ্চকণ্ঠে নাম করিতেছে। প্রায় চারিঘণ্টাকাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। তৎপরে প্রভু যেন প্রসন্ন হইলেন। বাতাস থামিয়া গেল—আকাশ নির্ম্মল হইল। আরোহিগণ যেন নবজীবন লাভ করিল। তখন সারেঙ্গ আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, "আজ আপনাদের নামের গুণে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে; নতুবা এরূপ

অবস্থায় কখনই জাহাজ রক্ষা পাইবার আশা ছিল না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ বাবা! ভগবৎ-নামের অপার ক্ষমতা। নামও যে, ভগবান্ নিজেও সে; নামে আর ভগবানে কোনই প্রভেদ নাই। দ্বেষাদ্বেষিভাব অতি ঘৃণিত। ভগবানের অনন্ত নাম। আল্লা, খোদা, যিশু, মহম্মদ, কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নিতাই, গৌর ইহার মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। তুমি হয় ত আমার নিতাই গৌর নাম করিতে কুণ্ঠিত হইতে পার; আমি কিন্তু আল্লা, খোদা, যিশু প্রভৃতি যে কোন নাম করিতে কুণ্ঠিত হইব না; কারণ ভগবান্ পূর্ণ পূর্ণতম। বাবা! ধর্ম্মশব্দ সার্ব্বজনীন; কোন ব্যক্তিগত নহে।" শুনিয়া সারেঙ্গ অশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমাদের কোরাণ সরিপের ঠিক্ এই মত; তবে আমাদের বুদ্ধির ভ্রম। কোরাণ সরিপে বলিয়াছেন, কাহারও ধর্ম্ম বা কর্ম্মকে নিন্দা করিলে খোদার নিকট দোষী হইতে হয়।" ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। ক্রমে কালাপানি পার হইয়া রাত্রি অধিক হওয়ায় জাহাজ নঙ্গর করা হইল। সে রাত্রি জাহাজেই কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িয়া বেলা এগারটার সময় সকলে চাঁদবালী পৌঁছিলেন।

আরোহিগণ চাঁদবালী ষ্টেশনে নামিয়া স্নান করিতে লাগিল। ইঁহারাও তীরে নামিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন একটী সাহেব আসিয়া ইঁহাদের কীর্ত্তনে বাধা দিতে প্রস্তুত হওয়ায় জাহাজের সারেঙ্গ এবং জাহাজস্থ আর কয়েকটী ভদ্রলোক সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গতকল্য যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে জাহাজ রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই মহাপুরুষ অতি ব্যাকুলপ্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন বলিয়া রক্ষা পাইয়াছে। শুনিয়া সাহেব আর কিছু বলিলেন না; ইঁহারাও প্রাণখুলিয়া নাম করিতে লাগিলেন। তখন

রমানাথ বাবু, শরৎবাবু, রামপ্রসাদবাবু, রঘুনাথবাবু প্রভৃতি অনেক উড়িষ্যাবাসী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে চাঁদবালীতে বাস করিতেন। তাঁহারা বাবাজী মহাশয়ের মুখে সুমধুর নামকীর্ত্তন শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং অপরাপর কয়েকজনের মুখে পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্ত শ্রবণে বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। তখন সকলে ইঁহাকে দুই একদিন চাঁদবালীতে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রথযাত্রা অতি সন্নিকট বলিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইঁহাদের সেদিনকার আহারাদির ব্যবস্থা শরৎবাবুর বাসাতেই হইল।

আহারাদির পর রঘুনাথবাবু সদলে বাবাজী মহাশয়কে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করায় ইঁহারা নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রঘুনাথবাবুর বাসার দিকে রওনা হইলেন। রঘুনাথ বাবুর বাড়ী যাইতে হইলে একটী সাহেবের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। স্থানীয় অনেকেই মনে করিলেন যে, সাহেবের বাসার সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তন করিয়া যাইবার সময় নিশ্চয়ই কীর্ত্তনে বাধা দিবেন; কিন্তু কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে সাহেব বাহিরে আসিয়া ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মাথার টুপি খুলিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহারা তখন কীর্ত্তনে মাতোয়ারা। সাহেব বাবাজী মহাশয়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বাবুভায়াগণ যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল মধ্যে ইঁহারা সাহেবের বাসা অতিক্রম করিলেন। গগনভেদী মধুর কীর্ত্তনধ্বনিতে দশদিক্ আনন্দময় হইল। সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। এক একবার অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ বাবাজী মহাশয়ের দেহে

স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি হিন্দু, মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই অতি বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এই বাবাজীটী নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ; নতুবা এরূপ অবস্থা কি সামান্য মানুষে সম্ভবে? মুখখানি যেন সর্ব্বদার তরে আনন্দময়। ইঁহার আর একটী গুণ এই যে, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সহাস্যবদনে তাহার যথাযথ উত্তর দিতেছেন। আহা মরি কি অপূর্ব্ব ভাব! আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ মহাত্মা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আবার এরূপ সরলভাবে মধুর নাম কীর্ত্তন করিতেছেন যে, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া অনায়াসে সেই নাম উচ্চারণ করিতেছে। যেন কত-কালের অভ্যস্ত নাম। ইঁহাকে দেখিবামাত্রই বহুদিনের সুপরিচিত বলিয়া মনে হয়।" ইত্যাদি যাহার যেমন মনের গতি, সে সেইরূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। ইঁহারা প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথ বাবুর বাসায় গিয়া পৌঁছিতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিল। সেস্থানেও বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হইল। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় পুরী যাইবার মানসে কটকের বোটে উঠিলেন। বোট ক্যানালে প্রবেশ করিলে শরৎবাবু কটকের পোষ্ট মাষ্টারবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন যে, "একটী মহাপুরুষ নবদ্বীপ হইতে কটক হইয়া পুরী যাইতেছেন। তাঁহার অলৌকিক ভাব দেখিয়া এবং সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া এস্থানের হিন্দুমুসলমান সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কালা-পানিতে জাহাজখানি ভয়ানক তুফানে পতিত হইয়া একেবারে জলমগ্ন হইতেছিল। এমন কি, সারেঙ্গ ও আরোহিগণ প্রাণের আশা ছাড়িয়া

দিয়াছিল। সংকীর্ত্তন করিয়া সেই তুফান নিবৃত্তি করার দরুণ অনেক সাহেব এবং সারেঙ্গ ইঁহার উপর বিশেষ ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন।" শরৎবাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া কটকের টেলিগ্রাফ মাষ্টার, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি সকলে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং স্থানীয় অনেক ভদ্র-লোকের নিকট এই সংবাদটী প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিতচিত্তে মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপভাবে সেদিন কাটিয়া গেল। পুরী পোষ্ট অফিসের হেড্‌ক্লার্ক বাবু গোপালপ্রসাদ দত্ত কটকের পোষ্টমাষ্টার বাবুকে পূর্ব্ব হইতেই জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, "বড়বাবাজী মহাশয় কটকে আসিবামাত্র যেন আমাকে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হয়।" আজ তিনি সংবাদ দিলেন যে, "গতকল্য চাঁদবালীর টেলিগ্রাম পাইলাম যে, একটী মহাপুরুষ নবদ্বীপ হইতে পুরী যাইতেছেন। সেই মহাত্মার সংকীর্ত্তনে এবং অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে চাঁদবালীস্থিত হিন্দু, মুসলমান ও সাহেবগণ বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। সম্ভব আজ তিনি কটক পৌঁছিবেন। পুরী রওনা হইবার পূর্ব্বে আপনাকে জানাইব।" পুরীবাসী ভক্তবৃন্দ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় যেমন কটকে পৌঁছিয়া বোট হইতে নামিলেন, অমনি কয়েকজন ভদ্র-লোক আসিয়া বলিলেন, "আমরা গতকল্য আপনার আসিবার সংবাদ পাইয়াছি। শরৎবাবু চাঁদবালী হইতে আমাদের পোষ্টমাষ্টার বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। আমাদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছা যে, কিছুদিন কটকে থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদ কতদিন রাখিবেন, তিনিই জানেন। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নাই। তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আগতপ্রায়। বেশীদিন এখানে রাখিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যদি

ভবিষ্যতে আবার কখনও নিতাইচাঁদ আনেন, তবে সেই সময় আপনা-দিগকে লইয়া আনন্দ করিবার আশা রহিল।

এইরূপ কথোপকথনে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া নাম করিতে করিতে সহরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ব্রহ্মের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়কে দেখিবামাত্র আনন্দবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক বৈঠকখানায় বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নানাপ্রকার কথোপকথনে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। এদিকে ঠাকুরের ভোগরাগের যোগাড় হইতে লাগিল। যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসহ স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে বহু ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহাদের সহিত নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনায় দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যার সময় আরতি-কীর্ত্তন করিয়া ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলনকীর্ত্তনান্তে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে আনন্দব্রহ্মের বাড়ীতে দুইদিন কাটিয়া গেল। তিন দিনের দিন প্রভাতে কাটজুড়ি নদীতে স্নান করিবার জন্য নাম করিতে করিতে বাহির হইলেন। ক্রমে নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাটজুড়ি নদীতে স্নান করিয়া আনন্দব্রহ্মের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন, এই সময়ে পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত নামক জনৈক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্যারীবাবু খুব ধনী না হইলেও সদ্‌ব্যয়ী এবং পরমভক্ত। বাড়ীতে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবা আছে। ইঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বাৎসল্যরসের উপাসক। প্যারীবাবুর তিনটী পুত্র। তাহারাও পরম ভক্তিমান্। কোন সাধুবৈষ্ণব বা ভক্ত দর্শন করিবামাত্র ইঁহারা সগোষ্ঠী আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। বাজারে

কোন নূতন বা উপাদেয় দ্রব্য পাইলেই উহা পরম যত্নে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউকে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে কোন সাধুবৈষ্ণব বা ভক্তকে সেবা করান ইঁহাদের পরিবারস্থ সকলের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। প্যারীবাবুর পত্নীর নির্হেতুক বিশুদ্ধ-ভাবদর্শনে মহাপাষণ্ডের হৃদয়েও বাৎসল্যময়ী মা যশোমতীর কথা উদয় হয়। তিনি যেন জগতের মা ; কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ কাহারও শুষ্কমুখ দেখিলে তাহাকে কিঞ্চিৎ গোবিন্দের প্রসাদ না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। আজ মায়াপাশমুক্ত, নিষ্কিঞ্চন, নবানুরাগী বাবাজীগণ অপ্রাকৃতস্নেহময়ী মায়ের স্নেহপাশে বদ্ধ হইলেন। ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মা আনন্দে অধীরা হইলেন। বাবাজী মহাশয় দ্রুতগতি যাইয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিবামাত্র বাৎসল্যময়ীর বাৎসল্যরস মূর্ত্তিমান্ হইল। অমনি মা নিজের বাম চরণের ধূলি বাম হস্তে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের মস্তকে অর্পণ করতঃ চিবুক ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা! সুখে থাক। তোমরা আমার গোবিন্দের সঙ্গী ; তোমাদের আনন্দেই আমার গোবিন্দের আনন্দ। গোবিন্দ জীউর প্রতি তোমাদের অক্ষুণ্ণা প্রীতি থাকুক। তোমরা চিরজীবী হও, ভগবানের চরণে আমার এই প্রার্থনা।" বাৎসল্যরসের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই মুখের উপর পতিত হয় ; তাই মা বাবাজী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আহা বাবাসকল! কীর্ত্তন-পরিশ্রমে তোমাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কিঞ্চিৎ গোবিন্দজীউর প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া নানাবিধ দ্রব্য গোবিন্দ-জীউকে ভোগ দিয়া সকলকে নিজ হাতে খাওয়াইতে লাগিলেন। প্যারীবাবু ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহাশয় সদলে সে বেলা তথায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। আনন্দব্রহ্মের বাড়ী হইতে ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ লোক আসিতে

লাগিল। কিন্তু বাৎসল্য প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইঁহাদিগকে লইয়া যাইবার সাধ্য হইল না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আনন্দকে বলিও যে আজ আর আমাদের সেখানে যাওয়া হইবে না।" এদিকে গোবিন্দজীউর নানাবিধ ভোগের যোগাড় হইতে লাগিল। ভোগের পর প্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে সহরবাসী অনেক ভদ্রলোক আসিয়া নগরকীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য বাবাজী মহাশয়কে অনুরোধ করিতে লাগিলে প্যারীবাবু বলিলেন, "বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজ বিশ্রাম করুন। আগামী কল্য সকালবেলা কীর্ত্তন বাহির করিলেই ভাল হইবে।" সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন। জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। "বাবা! ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ও আমাদের অবলম্বনীয়?

বাবাজী। বাবা! শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "যার যেই ভাব সেই হয় সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥ যিনি যে রসের উপাসক, তাঁহার নিকট সেই রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রসান্তরের আলোচনা পর্য্যন্তও তাহার উপাসনা পথের অন্তরায়। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে রসসকলের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে মাধুর্য্যই শ্রেষ্ঠ। কবিরাজ গোস্বামী মাধুর্য্য রসের উপাসক অর্থাৎ রাগানুগ ভক্তদিগকে বলিয়াছেন, "গোপী-অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥" অন্যত্র বলিয়াছেন, "ঐশ্বর্য্য থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে।" অন্যত্র "দেখিলেও নাহি মানে কেবলার গণে।" ব্রজবাসীদিগের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যরস পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া যোগমায়া নানারূপ ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রকাশ করিলেও তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে সেই ঐশ্বর্য্যলীলা

আরোপ করিতে পারেন নাই। ব্রজগোপীগণ কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ভূষিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নারায়ণজ্ঞানে তাঁহার নিকট দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিকামনা ভিন্ন কখনও তাঁহাকে নন্দনন্দন জ্ঞান করিতে পারেন নাই। ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ, কালিয়দমন প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি দেখিয়াও রাখালরাজ বা ভাইকানাই ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞান আসে নাই। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও গ্রহবৈগুণ্য জ্ঞানে নানারূপ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করা ভিন্ন কখনই ভগবৎশক্তি বলিয়া মনে করেন নাই। যে কৃষ্ণচন্দ্রকে শান্তরসের ভক্তগণ "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্" সর্ব্বনিয়ন্তা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পূর্ণপূর্ণতম ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন, সেই কৃষ্ণই যশোদা প্রভৃতি মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের নিকট তিরস্কৃত ও শাসিত হইতেছেন। এমন কি তাহারা সময়ে বন্ধনাদি পর্য্যন্ত করিতেছেন। এখন বুঝিয়া দেখুন, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। স্থূল কথা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভক্তগণকে ভগবান্ হইতে দূরে সরাইয়া তাঁহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়; আর মাধুর্য্যজ্ঞান ভক্তগণকে ভগবাণের নিকটবর্ত্তী করিয়া সম্বন্ধবোধে অন্তরে নিঃসঙ্কোচতা জন্মাইয়া দেয়। প্রাকৃতরাজ্যের একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী আরও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছি :—

মনে করুন, দাশরথি মহাপাত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক কোনও বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি। যখন তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন তাঁহার নাম হুজুর বা ধর্ম্মাবতার। বিখ্যাত উকিল ব্যারিষ্টারগণ নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া ভীতভীতচিত্তে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন। জজবাবু বাড়ীতে আসিয়া বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক

আসিয়া বলিলেন, "হা রে দাসু! এখন পর্য্যন্ত বাহিরে বসিয়া আছিস্! তুই এত বড় হইলি, তবু কি তোর হিতাহিত জ্ঞান হইল না? যা, বাড়ীর ভিতর গিয়া একটু জল খা।" জজবাবু অবনতমস্তকে বৃদ্ধাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ গৃহে যাইবামাত্র চাকরাণী আসিয়া দুই চারিটি রসভর্ৎসনাসূচক বাক্য বলিতে লাগিল। জজবাবু হাসিতে হাসিতে গিন্নির নিকট গিয়া দেখেন, তিনি অভিমানে বিষণ্ণ-বদনা। তখন জজবাবু হাতে পায় ধরিয়া নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। তবেই ভাবিয়া দেখুন, যাঁহার নিকট উকীল ব্যারিষ্টারগণ কথা কহিতে ভীত হইতেছিলেন, বিচারালয়ে যাঁহার নাম ধর্ম্মাবতার বা হুজুর বাহাদুর ছিল, তিনিই কি একটি বৃদ্ধার নিকট বালকের ন্যায় তিরস্কৃত নন? আবার তিনিই কি অন্তঃপুরনিবাসিনী একটী স্ত্রীলোকের নিকট নানারূপ লাঞ্ছিত বা পরাভূত নন? অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল যে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এবং উপস্থিত লোকসকল বাবাজী মহাশয়ের মুখে সরল ভাষায় এই প্রকার সুসিদ্ধান্ত শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। সন্ধ্যার পর আরতি-কীর্ত্তনান্তে ক্রমে রূপ, অভিসার ও মিলন কীর্ত্তন করতঃ মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সঙ্গিগণসহ কীর্ত্তন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কটকবাসী অনেক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদ ধরিয়া নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। ভক্তির দৃষ্টিতে কটক সহরের তাৎকালিক অবস্থা তত উন্নত নহে; কারণ সহরবাসী প্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোকই আধুনিক সভ্যতার অনুরোধে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি

বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি প্রায় কাহারও একেবারেই আস্থা ছিল না। এমন কি, বৈষ্ণব শব্দ শুনিবা-মাত্রই তাঁহারা চরিত্রহীন, অশিক্ষিত অসভ্য বলিয়া ধারণা করিতেন। আজ বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শ্রবণে এবং নানাবিধ ভাববিকার-সম্বলিত সেই সুবিশাল দেহখানি দর্শনে অনেকেরই মনে যেন ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুদাকারে কিঞ্চিৎ ভক্তির সঞ্চার হইল। কেহ কেহ আসিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতেও লাগিলেন। কেহ কেহ বা ইচ্ছাস্বত্বেও পদমর্য্যাদার অনুরোধে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন।

এইরূপভাবে বেলা প্রায় সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত নগর কীর্ত্তন করিয়া প্যারীবাবুর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্তি করতঃ ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে স্নান করিবার জন্য কাঠজুড়ি নদীতে গমন করিলেন। কাঠজুড়ি নদীর জল এবং তীরের শোভা অবলোকন করিয়া বাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভা! স্থানটী দেখিবামাত্র যেন মা গঙ্গা বলিয়া ভ্রম হয়। জলে নামিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। তীরবর্ত্তী বৃক্ষসকলের শোভাদর্শনে যেন ঠিক নবদ্বীপ বলিয়া মনে হয়।" এই বলিয়া জলে অবগাহনপূর্ব্বক দুইখানি হাত উপরে তুলিয়া কেবল পায়ের সাহায্যে সাঁতার দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে জলক্রীড়া করিয়া বাসায় ফিরিলেন। এ দিকে স্নেহময়ী মা নানাবিধ দ্রব্য ঠাকুরের ভোগ দিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহারা আসিবামাত্র অতি যত্নাগ্রহের সহিত সকলকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে সকলেই কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্নে সহরবাসী অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইঁনিও হাসিমুখে সরল ভাষায় সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানে তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ পরমানন্দে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পাঁচ ছয় দিন মাত্র বাকী থাকিতে একদিন বাবাজী মহাশয় পুরী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্নেহময়ী মা আর কয়েক-দিন থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইঁনি নানারূপ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ সেই দিনই সেখান হইতে রওনা হওয়া স্থির করিলেন। প্যারীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসাদ বারং ষ্টেশনে যাইয়া জানিয়া আসিল যে, সন্ধ্যা ছয়টার সময় পুরীর গাড়ী ছাড়িবে। কটকের পোষ্ট মাষ্টারবাবু পুরী পোষ্ট অফিসের হেড্ ক্লার্ক গোপাল বাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন যে, "বড় বাবাজী মহাশয় সন্ধ্যা ছয়টায় কটক হইতে পুরী রওনা হইবেন।" গোপালবাবু টেলিগ্রাম পাইয়া হৃষ্টচিত্তে বলরাম বাবুকে এই সংবাদ দিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয়ের পুরী আগমনবার্ত্তা সহরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় সগণে নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। তখন কটকের অপর পারে বারং পর্য্যন্ত রেল হইয়াছে। বেলা পাঁচটার সময় বারং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশনের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এদিকে বড়বাবাজী মহাশয় পুরী রওনা হইয়াছেন শুনিয়া কটকবাসী অনেক ভদ্রলোক ইঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বাবাজী মহাশয়ের বিচ্ছেদজনিত দুঃখে দুঃখিত। যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে মিষ্টবাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করতঃ ইঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন।

এদিকে শ্রীধাম পুরীতে বাবাজী মহাশয়ের অভিন্নকলেবর নবদ্বীপ দাদার মনে আজ আনন্দ আর ধরে না। এক একবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাইতেছেন, আর প্রসাদী মালা ও চরণতুলসী লইয়া আসিতেছেন। পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় এবং কুঞ্জবিহারী

রায়, বলরাম পট্টনায়ক, ভুবনমোহন সাউ, গোপালপ্রসাদ দত্ত, বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতি বাবাজী মহাশয়ের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রসাদী মালা, চরণতুলসী এবং কিছু মিষ্টী মহাপ্রসাদ লইয়া ষ্টেশনে যাইতে প্রস্তুত হইলে, নবদ্বীপ দাদা নিজ সংগৃহীত প্রসাদী মালা ও চরণতুলসী প্রভৃতি দিয়া তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র **জয়গোপাল দাস** নামক একটী আঠার উনিশ বৎসরের ছেলেকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। নবদ্বীপ দাদা ও গোকুল দাদা প্রণয়াভিমানে বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলেন না বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ জয়গোপালকে বলিয়া দিলেন, "তুমি একটু আড়ালে থাকিবে। দাদা যদি তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন, তবে তাঁহাকে এই বড় মালাগাছটী এবং এই ছোট ছোট মালা কয়গাছ কিশোরী গোপাল, রাধাবিনোদ, গোবিন্দদাদা প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে দিবে।" সকলে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে তখনও ট্রেণ আসে নাই। জয়গোপাল কিন্তু মনে মনে ভাবিতেছে, "কি করিয়া তাঁহাকে চিনিব? তিনি মহাপুরুষ; কখনও আমাকে দেখেন নাই বা চেনেন না। কি করিয়াই বা আমার নাম ধরিয়া ডাকিবেন? দাদা বলিয়াছেন, 'না ডাকিলে তাঁহার নিকট যাইবে না।' সে কথাই বা কিরূপে লঙ্ঘন করিব?" দেখিতে দেখিতে মদমত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। পুরীবাসিগণ করতাল যোগে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামকীর্ত্তন করিতেছেন। গাড়ীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর খোল করতালের শব্দ এবং কর্ণরসায়ন কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সকলেরই প্রাণে প্রবলবেগে আনন্দ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। গাড়ী থামিলে আরোহিগণ নামিতে লাগিল।

গোপালবাবু, বলরামবাবু প্রভৃতি রেলিংএর বাহিরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে সঙ্গিগণ একে একে বাহিরে যাইতে লাগিলেন। বলরামবাবু প্রভৃতি ঘেরার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। যেমন এক এক মূর্ত্তি আসিতেছেন, অমনি তাঁহার গলায় প্রসাদী মালা দিতেছেন। সকলেই বাহিরে আসিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বশেষে বড় বাবাজী মহাশয় ঢুলিতে ঢুলিতে আসিতেছেন। দেখিবামাত্র বলরামবাবু প্রভৃতি আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রসাদী মালা গলায় দিবামাত্র ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল। কম্পিতকলেবরে সকলকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক একটু অগ্রসর হইয়াঁ বলিলেন, "জয়গোপাল! তুমিও আসিয়াছ? এস, প্রসাদী মালা দাও।" শুনিবামাত্র জয়গোপাল প্রেমার্দ্রহৃদয়ে প্রসাদী মালা লইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার নিকটে গমন করিল। মহাপুরুষ সুদীর্ঘকায়। ইঁহার মস্তক স্পর্শ করা জয়গোপালের পক্ষে কষ্টকর হইবে বুঝিয়াই যেন কৃপাপূর্ব্বক উহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। জয়গোপাল কোলে উঠিয়া গলায় মালা দিলে অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণ বুঝিলেন যে, মালাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে চিরজীবনের মত অঙ্গীকার করিলেন। আমাদের বিশ্বাস, জয়গোপালও জগন্নাথদেবের প্রসাদী মালার সহিত ইঁহাকে আত্মসমর্পণ করিল। বাবাজী মহাশয় উহাকে কোলে লইয়াই সঙ্গিগণ যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গিয়া মধুর সম্ভাষণে উপস্থিত পুরীবাসী ভক্তমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি বিধান করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় নানাবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া সকলের মুখে দিতে লাগিলেন।

পুরীবাসী ভক্তবৃন্দের আজ আনন্দের সীমা নাই। বহুদিনের পর তাহাদের প্রাণের প্রাণ হৃদয়সর্ব্বস্ব বড় বাবাজী মহাশয়কে

পাইয়া যেন মৃতদেহে নবজীবন লাভ করিল। সংসারের কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। কাহারই বাহ্যজ্ঞান নাই। বড় বাবাজী মহাশয়ের সুখময় সঙ্গে সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ অপূর্ব্ব মিলনসুখ অনুভব করিয়া সহরের মধ্যে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে চারিদিকে মশাল ও লণ্ঠন জ্বালা হইল। বড় বাবাজী মহাশয় নাম ধরিয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সঙ্গিগণও প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া ইঁহার অনুগমন করিলেন। ক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহির পরিক্রমা করিয়া কুণ্ডাই-বেণ্টসাহি পণ্ডিত মঠে উপস্থিত হইলেন। বলরামবাবু প্রভৃতি সকলে ইতিপূর্ব্বেই ইঁহাদের ঐ স্থানে মহাপ্রসাদ পাইবার এবং রাত্রে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের শুভাগমন উপলক্ষে প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহার আদেশমতে সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভক্তগণ উৎফুল্লচিত্তে নানারূপ ধ্বনি দিতে লাগিলেন। এইরূপ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলেই আত্মবিস্মৃত—সকলেই আনন্দে বিভোর! কাহারই ইচ্ছা নয় যে, এই অননুভূতপূর্ব্ব মধুর মিলনানন্দ ভঙ্গ হয় বা এই অপূর্ব্বা মধুময়ী রজনী প্রভাতা হয়। সকলেই যেন আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় চিন্ময় রাজ্যের নিত্যসুখ অনুভব করিতেছিলেন। হঠাৎ হৃদয়ের চমক ভাঙ্গিল। অমনি বিচার আসিল, 'রাত্র অধিক হইয়াছে; বাবাজী মহাশয়ের কষ্ট হইবে।' আহা মরি ভক্তহৃদয়ের কি অপূর্ব্ব ভাব! কি মধুর আত্মসুখ-বিবর্জ্জিত আশয়! ভক্তগণ হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে রাত্র অধিক হইয়াছে। একটু বিশ্রাম না করিলে শরীর খারাপ হইবে যে!" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু

প্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিজভাব সম্বরণ করিলেন। ক্রমে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও সে রাত্রে ঐ স্থানেই শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই অনেক ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ও গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান করিবার উদ্দেশ্যে নাম করিতে করিতে নরেন্দ্র-অভিমুখে রওনা হইলেন। সুমধুর কীর্ত্তনধ্বনি একবার যাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সকলেই স্বস্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। সকলেই যেন কি এক অভিনব আনন্দসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় হাবুডুবু খাইতেছে। কি মধুর প্রেমরাজ্য! ছোট বড় ভেদ নাই—উচ্চনীচ বিচার নাই; যে একবার বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতেছে, তাহাকেই ইনি হাসিতে হাসিতে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছেন।

এইরূপে বেলা প্রায় আটটার সময় নরেন্দ্রসরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ নরেন্দ্রতীরে প্রেমের হাট বসিয়াছে। যেন চারিশত বৎসর পরে আজ গৌরলীলা পুনঃ প্রকট হইল। মহাপ্রভু যেন ভক্তগণসহ রসালাপ, কুশলপ্রশ্ন, নরেন্দ্রস্নান, জলকেলি প্রভৃতি দ্বারা সুখের পাথারে ভাসিতেছেন ও ভাসাইতেছেন। ক্রমে নরেন্দ্রস্নান শেষ করিয়া যেমন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, অমনি ভক্তগণ মদমত্ত সিংহের ন্যায় আনন্দভরে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সকলে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম ধরিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে অরুণস্তম্ভের নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জগমোহনে কীর্ত্তন।

ক্রমে বড় বাবাজী মহাশয় জগমোহনে উপস্থিত হইয়াই দেখেন যে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ; জগন্নাথ অনবসরে আছেন। কেবল চিত্রপট দর্শন হয় মাত্র। তাহাও সম্প্রতি সেবার অনুরোধে বন্ধ আছে। সুতরাং ইঁহার মনে বড় অভিমান হইল। চোখে জল নাই ; কিন্তু রক্তবর্ণ। মুখে কথা নাই ; কিন্তু অধরোষ্ঠ বিকম্পিত। গণ্ডদ্বয় ঈষদ্ রক্তিম। ভাবে গরগর হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছেন, হঠাৎ কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সঙ্গিগণ যেন কেমন একরকম হইয়া ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গান ধরিলেন :—

ভাবের আবেশে, গৌরাঙ্গ আমার,
প্রাণনাথে না দেখিয়া।
বিরহের ভরে, ডাকিয়া বঁধুরে,
কহে বেয়াকুল হৈয়া॥
বহুদিন পরে, দেখিতে তোমারে,
আইনু তোমার ঠাঁই।
তুয়া ব্যবহার, বুঝিতে এবার,
আমার শকতি নাই॥
গৃহ ছাড়াইয়া বনবাসী কৈলে,
রূপে গুণে ভুলাইয়া।
ওহে মনোচোর, এবে হৈনু পর,
নিজে রৈলে লুকাইয়া॥

মনের বেদন, কাহারে কহিব,
কে বুঝিবে মোর দুখ।
ও চাঁদবদনে, না হেরি সঘনে,
বিদরিয়া যায় বুক ॥
আশায় আশায়, এসেছিনু বঁধু,
তুয়া দেখিবার তরে।
কি দোষে বিধাতা, এ বাদ সাধিল,
এ দুঃখ বলিব কারে ॥
অচল বলিয়া, উচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদে ঘেরল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
রসময় বলি, কে বলে তোমারে,
শুনহ নাগরচাঁদা।
ছাড়িয়া স্বজন, গৃহ পরিজন,
হইনু তোমারই বাঁধা ॥
জাতি কুলশীল, কিছু না গণিনু,
গুরুজন গৃহকাজ।
ধরম করম, সব তেয়াগিনু,
সতী কুলবতী লাজ ॥
দিবস রজনী গুণ গুনি গুনি,
হইনু বাউলি পারা।
তবু রসময়, বুঝিতে নারিনু,
তোমার প্রেমের ধারা ॥

দয়াময় বলি, যাহারে ভজিনু,
তার এত নিঠুরতা
রমণী লম্পট, নাগরশেখর,
তার মুখে নাহি কথা ॥
অলপে অলপে, মু যদি জানিতাম,
তবে কি এমন করি।
সুখের লাগিয়া, পীরিতি করিয়া,
(এখন) ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
স্বপনেও কভু, ভাবি নাই যাহা,
তাহাই ঘটিল কালে।
নিদারুণ বিধি, এ হেন অবধি,
লিখেছিল মোর ভালে ॥
ভাল হৈল কান, দিলা সমাধান,
আর বা বলিব কি।
জমুনার জলে, এ তনু ত্যজিব,
নিচয় করিয়াছি ॥

বলিতে বলিতে একেবারে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গিগণ সকলেই অধীর; মহাপুরুষের শক্তিপ্রভাবে সকলেরই হৃদয়ে একভাব। সকলেরই চোখে জল—কাহারই যেন দেহস্মৃতি নাই—সকলেরই কণ্ঠ গদগদ—কেহই যেন এ রাজ্যে নাই। সকলেরই মনে হইতেছে, যেন শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে না দেখিয়া বিরহিণী, মহাভাব-স্বরূপিণী রসময়ী শ্রীরাধিকার ভাবে বিভোর হইয়া প্রণয়রোষভরে প্রাণনাথকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কত কি বলিতেছেন। পাণ্ডা পূজারীগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্!

বহুদিন পরে কোথা হইতে এক প্রেমের বন্যা আসিয়া আপামর সাধারণ স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ সকলকেই বিরহসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় একবার ভাসাইতেছে, একবার ডুবাইতেছে—সকলেই যেন বিবশ। আহা মরি কি মধুর প্রেমের খেলা! হঠাৎ শ্রীমন্দিরের কবাট খোলা হইল। সকলেই উৎকণ্ঠাভরে দর্শনের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া দর্শনে চলিলেন। জগন্নাথ চিত্রপটে দর্শন দিলেন। বিরহব্যথা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপশমিত হইল। জনৈক দয়িতা পাণ্ডা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী মালা আনিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিলেন। মালার স্পর্শ পাইয়া ইঁহার দেহখানি পুলকে পরিব্যাপ্ত হইল—অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অন্তরে অন্তরে কি বুঝিলেন, অন্তর্য্যামীই জানেন, আর নিতাইচাঁদ জানেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা! মোদের যা হয় হবে, তুমি কেন দুঃখ পাবে, সুখে থাক ওহে সুখময়।" এই ধুয়া গান করিতে করিতে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। প্রিয় বলরাম বাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, চলুন স্নানবেদী দর্শন করিবেন।" শুনিবামাত্র সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্নানবেদীর দিকে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, নানাবিধ পিঠাপানা মহাপ্রসাদ রহিয়াছে। বলরাম নিজের উড়ানী দ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া সকলকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলে ভক্তহৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া বড় বাবাজী মহাশয় সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। নূতন নূতন অনেক ভক্ত আসিয়া ইঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলে সকলের সঙ্গে রসালাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বলরাম সমস্ত মহাপ্রসাদ একত্র করিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ হাতে করিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের মুখে

দিলেন। ইনিও কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার মুখে অর্পণ করিলেন। এই ভাবে ভক্তগণ প্রায় সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখে মহাপ্রসাদ দিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। কেহ বা নূতন করিয়া মহাপ্রসাদ আনিতেছেন। আবার সেই মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হইতেছে। এইরূপভাবে মহাপ্রসাদসেবানন্দে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা প্রায় এগারটার সময় ইঁহার ঝোঁক হইল, একবার সমুদ্রস্নানে যাইবেন। কাহার সাধ্য যে ইঁহার গতিরোধ করে? একজন পাণ্ডা বলিলেন, "আজ্ঞে, কালি নবযৌবন দর্শন হেব টিকিয়ে সকাল করি আসিবা হেবে।"

বাবাজী। আজ্ঞে কত বেলা হইবে?

পাণ্ডা। দশটার সময় হেবার সম্ভব।

বাবাজী। আচ্ছা আশা রহিল। এখন আপনাদের আকর্ষণ এবং শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছা।

এই সময়ে মাধব পশুপালক নামক জনৈক শিঙ্গারী পাণ্ডা বলিলেন, "দেখুন, আপনি পুরীতে না থাকিলে জগন্নাথদেব যেন নিরানন্দে থাকেন। আমার বিশ্বাস, আপনি জগন্নাথদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শাস্ত্রে যেরূপ পাওয়া যায়, আপনার কীর্ত্তন শুনিয়া বোধ হয় যেন তিনিই আবার আমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।" অনেকেই এই কথায় সায় দিলেন। বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"নিতাই নিতাই! অমন কথা বলিতে নাই; আমি তাঁহাদের দাসানুদাস।" এইরূপভাবে নানা কথোপকথনের পর নাম করিতে করিতে সকলেই সমুদ্রস্নানে চলিলেন। সমুদ্রস্নান শেষ করিয়া বাসায় ফিরিবার সময় মহাত্মা শ্রীবিহারীদাস পূজারী মহাশয় ইঁহাদিগকে গঙ্গামাতা মঠে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য

লইয়া গেলেন। ইঁহার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। সকলেই অতি আনন্দ সহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বসিয়া নানারূপ ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় সকলে বলরাম মহান্তির বাড়ীতে রওনা হইলেন। এ দিকে বলরাম পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদিগের থাকিবার জন্য শ্রীহরিশ্চন্দ্র বসু (বড় হরিশ বাবু) মহাশয়ের নিজ বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। হরিশ বাবু সম্প্রতি পুরীতে নাই, তিনি কলিকাতায় আছেন। কাজে কাজেই তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার বিশেষ সুবিধা হইল। ইঁহারা পরমানন্দে সেই দোতলা বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয়বার নবযৌবনদর্শন ও হরিবল্লভ বাবুর বাড়ীতে কীর্ত্তন।

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবন দর্শন। ভক্তগণ যে জগন্নাথদেবকে একদিন না দেখিলে ব্যাকুল হন, লীলাময় ভক্তবৎসল সেই জগন্নাথ জানি না কেন যেন ভক্তের দুঃখ দেখিয়াও এতদিন নীরবে লুকাইয়া ছিলেন। আজ আবার যেন প্রিয় ভক্তগণের কথা মনে পড়িল—ভক্তের দুঃখে প্রাণ কাঁদিল। ভক্তবৎসল প্রভু আর কি থাকিতে পারেন? বেলা প্রায় এগারটা বাজিল। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য! সকলেই উৎকণ্ঠিত; সকলেরই সতৃষ্ণ নয়ন শ্রীমন্দিরের কবাটের উপর। দিনকরের কিরণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীর অনুরাগের তীব্রতাও যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় শান্তিময় শ্রীজগন্নাথদেব মৃদুমধুর হাসিমাখান প্রেমে ঢল ঢল মুখচন্দ্রখানি

দর্শনদানে জীবের সকল তাপ বিদূরিত করিয়া বাঁকা নয়নে কুটিল কটাক্ষে আপামর সাধারণকে প্রেমসাগরে ভাসাইয়া দিলেন। জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ভেরী-তুরী প্রভৃতির ধ্বনিতে এবং ভক্তগণের গগনভেদী হরিধ্বনিতে ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত হইল। সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ সগনে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চাঁদবদন দর্শন করিবামাত্র ইঁহার মন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিল। অমনি গান ধরিলেন:—

জগন্নাথের মুখ হেরি গৌর কিশোর।
রাধিকার ভাবাবেশে হইল বিভোর॥
স্বরূপের করে ধরি কহে ধীরি ধীরি।
কি মোহন ভঙ্গি চেয়ে দেখ সহচরি॥
কালিয়া বরণখানি কেবা নিরমিল।
অলকা তিলকা দিয়া কেবা সাজাইল॥
ভুরুযুগ নহে যেন কামের কামান।
আঁখিঠারে অবলার নিল কুলমান॥
নাসায় মুকুতা দোলে মুখে মৃদুহাসি।
হেরি সতী কুলবতী হ'তে চায় দাসী॥
কহিতে কহিতে গোরার ভাবান্তর হইল।
রাজবেশ নিরখিয়া ব্যাকুল হইল॥
চল বৃন্দাবনে বঁধু চল বৃন্দাবনে।
গোপীসনে রাসলীলা কর কুঞ্জবনে॥
ব্রজবাসীর দুখ হেরি বিদরয়ে হিয়া।
পশুপাখী কাঁদে নাথ তোমা না দেখিয়া॥

তৃণ নাহি খায় গাভী বৎস নাহি হেরে।
অধোমুখে নিরবধি তুয়া লাগি ঝুরে॥
কাঁদিয়া হইল অন্ধ যশোমতী মাই।
তুয়া নাম বিনু তার আন কথা নাই॥
কানু কানু ব'লে কাঁদে যত সখাগণ।
সান্ত্বনা করয়ে ব্রজে নাহি হেন জন॥
ব্রজবাসিগণ তুয়া পরান সমান।
কেমনে ভুলিয়া রইলে কঠিন পরাণ॥
বৃন্দাবনে যে আনন্দ-সিন্ধু উথলয়।
ইঁহা একবিন্দু নাহি মোর মনে হয়॥
বৃন্দাবনে গোপসঙ্গে নটবরবেশ।
ইঁহা হাতী ঘোড়া রথ দেখি রাজবেশ॥
ব্রজে বংশীধারী ইঁহা সদা দণ্ডধর।
পাত্র মিত্র ভৃত্য, ভয়ে কাঁপে নিরন্তর॥
প্রেমহীন স্থানে ভয় মর্য্যাদা সঙ্কোচ।
প্রেমের স্বভাব সাম্যভাব নিঃসঙ্কোচ॥
তাই বলি যাঁহা নাহি ভয়ের সঞ্চার।
তাঁহা চল উথলিবে প্রেমের পাথার॥
এত বলি মুখপানে চাহিয়া রহিল।
আশ্বাস পাইয়া গোরা নাচিতে লাগিল॥

বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় আনন্দে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগমোহন আনন্দে টলমল করিতে লাগিল। এ এক অপূর্ব্বভাব; হাসি কান্না মিশামিশি। হাসির হিল্লোলে আনন্দের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতেই চোখে জল—প্রাণে হা হুতাশ—বিরহযন্ত্রণায়

"কাঁহা করো কাঁহা যাও, কাঁহা গেলে তোমা পাও" ইত্যাদি। আবার চোখের জল মুছিতে অবকাশ নাই; অমনি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি—মুখে হাসি—আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য। বিরহ ও মিলন এই দুইটী ভাবের একত্র মিশামিশি অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন ইঁহাতে প্রায় সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত।

এইরূপে কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া কোইল বৈকুণ্ঠ নামক মন্দিরাভ্যন্তরস্থ নির্জন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বহুভক্তগণ নানাপ্রকার মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বলরামবাবু ক্ষিপ্রহস্তে যথাযোগ্য বস্তুর যোগাযোগ করিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত মহাপ্রসাদে সকলেরই উদরপূরণ হইয়া গেল। সে বেলা ইঁহারা সেই স্থানেই বিশ্রাম করিলেন। অপরাহ্ণে সকলে নরেন্দ্র সরোবরে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন রাত্রে উকিল হরিবল্লভ বাবুর বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ইঁহারা "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে হরিবল্লভ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানায় বহুভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্প্রদায়ী কয়েক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীও তথায় উপস্থিত আছেন। সকলেরই ইচ্ছা, বড়বাবাজী মহাশয়ের সংকীর্ত্তন শুনেন। কাহার বা মনে মনে অনেক প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। কেহ বা বাবাজী মহাশয় বেদান্ত মানেন কি না জানিবার অভিপ্রায়ে হৃদয়ে অনেক প্রশ্ন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার কোনও ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিকের প্রতি বিদ্বেষভাব আছে কিনা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া হরিবল্লভ বাবু মনে মনে সংকল্প করিয়াছেন। এইরূপ

সকলের নিজ নিজ মনোভাব নিজে ভিন্ন অপর কেহই জানেন না। সকলেরই মনোভাব—সংকীর্ত্তন সমাপ্তি হইলে নিজ নিজ প্রশ্ন করিবেন।

বাবাজী মহাশয় প্রায় আধ ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্য ও নামকীর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরেই আর কাহারও বলাবলির অপেক্ষা না করিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোনরূপ পদ পদাবলী মুখস্থ করিয়া কীর্ত্তন করা ইঁহার প্রায়ই অভ্যাস ছিল না। যখন যাহা মনে স্ফূর্ত্তি হইত, তখন তাহাই কীর্ত্তন করিতেন। আজ আর রসকীর্ত্তন নাই; প্রথমেই বেদান্তবিচার। ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবানের ভেদাভেদ, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য, জ্ঞান কাহাকে বলে, জ্ঞান কত প্রকার, প্রকৃত জ্ঞানীর আচরণ কি, কীর্ত্তনে এইসকল সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল। বৈদান্তিক মহাত্মারা এতক্ষণ দূরে ছিলেন, ক্রমে নিকটে আসিলেন। প্রশ্নের অবকাশ নাই বা প্রয়োজনও হইতেছে না। বাবাজী মহাশয় ত্রিপদী, চৌপদী ও পয়ার ছন্দে নিজেই প্রশ্ন করিতেছেন, নিজেই উত্তর করিতেছেন। প্রথম প্রথম কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, এই ভাবের কোন পদ্যগ্রন্থ বোধ হয় ইঁহার কণ্ঠস্থ আছে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সকলেই বুঝিলেন, তাহা নয়। এটী ইঁহার ভগবদ্দত্ত শক্তিপ্রভাব। সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন। এক একবার এক এক সন্ন্যাসী বা বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন। কারণ তাঁহারা বহুবহু শাস্ত্রপ্রমাণাদি অনুসন্ধানে যে প্রশ্নসকল জিজ্ঞাস্য এবং অতি কঠিন মনে করিয়াছিলেন, সাদা কথায় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তনের সুরে তালে মিশ্রিত হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইতেছে। 'বলিহারি', 'বাহবা' ও হরিধ্বনির আর বিরাম নাই। একে একে সকলের প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। অবশেষে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়, 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতেষু', 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ', 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ-

মিতি মন্যতে', 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু,' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মহাবাক্য লইয়া কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এবার হরিবল্লভ বাবু এবং তাঁহার বন্ধু কয়েকটী উকীল বাবুর সন্দেহ মিটিয়া গেল। কেবল সন্দেহ মিটা নহে; চোখের জলে কাহারও কাহারও রুমাল ভিজিয়া যাইতেও লাগিল। কেহ কেহ বা নিজের শিক্ষাভিমানকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া সকলে আবার পূর্ব্ববৎ "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবার আর কেহ বাকী রহিল না। বাবুভায়া, সন্ন্যাসী, বৈরাগী সকলেই একসঙ্গে নাম করিতেছেন, আর হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল, তবু কাহারও কীর্ত্তন শেষ করিবার ইচ্ছা নাই। বাবাজী মহাশয় ভক্তগণের শ্রম জানিয়াই যেন অগত্যা কীর্ত্তনসমাপ্তি করিলেন। সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিতমনে বাবাজী মহাশয়কে প্রণামপূর্ব্বক নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু সেই একভাব। তিনি প্রত্যেক কথাতেই নিতাইচাঁদের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া নিজের দীনদৈন্য ভাব পোষণ করিতেছেন। এইরূপ পরমানন্দ সহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলের নিকট বিদায় লইয়া নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয়বার গুণ্ডিচামার্জ্জন।

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা। বাবাজী মহাশয় অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সদলে নরেন্দ্র সরোবরে গমন

করিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে রওনা হইলেন। সকলেই যেন অভিনব ভাবে বিভাবিত। বাবাজী মহাশয় যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই গুণ্ডিচামার্জ্জনে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। বহুক্ষণ মন্দিরে কীর্ত্তন করিয়া যেমন কীর্ত্তনসমাপ্তি করিলেন, অমনি লালাবাবু ও চিন্তামণিবাবুর ছত্রের ম্যানেজার প্যারীবাবু মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগকে ছত্রে লইয়া গেলেন। এদিকে ঝাড়ু কলসী প্রভৃতি গুণ্ডিচামার্জ্জনের দ্রব্যাদি যোগাড় হইতে লাগিল। বেলা দুইটা বাজিতে না বাজিতেই চারিদিক হইতে বহু বহু ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। গম্ভীরা হইতে শ্রীহরিভজন দাস অধিকারী মহাশয় বহু বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথবল্লভে আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় নিজহস্তে সকলকে মালাচন্দন পরাইয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক নাম ধরিয়া গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখে রওনা হইলেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। আহা মরি কি অপূর্ব্বশোভা! সকলেরই অঙ্গে চন্দন—গলায় মালা—হাতে একমুঠি ঝাড়ু—কাঁখে এক একটী কলসী। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা—সকলেরই মনে একভাব।

সর্ব্বাগ্রে গম্ভীরার সংকীর্ত্তনের দল রওনা করাইয়া দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত প্রভুপাদ শ্রীরঘুনাথ দেব গোস্বামী, প্রেমে মাতা নিতাইচাঁদের মত ঢুলিতে ঢুলিতে আগে আগে চলিয়াছেন, আর পাছে পাছে গণসহ বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। কে বলিবে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অপ্রকট? "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়" এই মহাবাক্য সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসগম্য করিবার জন্যই যেন বহুদিন হইতে বিলুপ্তপ্রায় গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলা আজ পুনরুজ্জীবিত হইল। বাবাজী মহাশয় প্রেমাশ্রুগদগদ কণ্ঠে পদ ধরিলেন :—

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ নাচি নাচি চলে।
স্বরূপের করে ধরি কত কি না বলে॥
চল যাই সহচরি চল ত্বরা ক'রে।
কাল আসিবেন প্রাণবঁধু নিকুঞ্জ মন্দিরে॥
গোকুলচাঁদ গোকুলেতে উদিত হইলে।
বিরহ আঁধার দূরে যাবে অবহেলে॥
দুখিনী গোপিনীগণের নয়ন চকোরী।
তিরপিত হবে মুখ-সুধাপান করি॥
বিরহ নিদাঘতপ্তা চাতকী গোপিনী।
নবজলধর আশে সদা ব্যাকুলিনী॥
রস বরিষণে তারা জীবন পাইবে।
পশুপাখী তরুলতা প্রফুল্লিত হবে॥
চল যাই সবে মেলি কুঞ্জ সাজাইব।
মনসাধে কালাচাঁদে তাহাতে বসাব॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য নিকুঞ্জ কানন।
সাজাইব সযতনে মনের মতন॥
হেনরূপে যায় গোরা রাধা ভাবাবেশে।
স্বরূপ রামানন্দ দুহুঁ রহে দুই পাশে॥
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর মুরারি মুকুন্দ।
বাণীনাথ বক্রেশ্বর সেন শিবানন্দ॥
নিত্যানন্দ নাচে যত ভক্তগণ সঙ্গে।
হরিবলি হরিদাস নাচে মনোরঙ্গে॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত শ্রীগোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥

শ্রীমান্ পণ্ডিত গঙ্গাদাস শুভানন্দ।
শ্রীরামপণ্ডিত কাশীশ্বর ব্রহ্মানন্দ॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন রাঘব বিষ্ণুদাস।
শ্রীকংসারী সেন বাসু জগন্নাথ দাস॥
চারিদিকে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
রাধাভাবে মাঝে নাচে শচীর নন্দন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ব্যাপিত শরীর।
কভু দ্রুতগতি চলে কভু চলে ধীর॥
এই মতে ভক্ত সঙ্গে গৌরাঙ্গসুন্দর।
প্রবেশিলা শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির ভিতর॥

এই পদ গান করিতে করিতে গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ভিতর হইতে কবাট বন্ধ। মনে মনে কি ভাবিলেন তিনিই জানেন। এত আনন্দের মধ্যে হঠাৎ ঘোরতর বিষাদ উপস্থিত হইল। আমরা প্রাকৃতচক্ষে বাহিরের জিনিষ যেরূপভাবে দেখিয়া থাকি, ভাবুকের দৃষ্টিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা বাহিরের খোসা লইয়া সমালোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু ভাবুকের প্রাণ ভাবে মাতোয়ারা। আমরা সহজেই বুঝিয়া লইলাম যে, প্রহরীর অনুপস্থিতিই কবাট বন্ধের প্রতি কারণ। বাবাজী মহাশয়ের মনের ভাব এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণ তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ গৌরাঙ্গচাঁদকে লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কবাট বন্ধ করিয়াছে। তাই বিরহ-বিহ্বলচিত্তে 'হা গৌরাঙ্গ' বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দু'টী চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন :—

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়ানের কোণে।
কে মোর আপন আছে তোমা প্রভু বিনে॥
প্রেমরসে ঢল ঢল ও চাঁদ বয়ান।
না হেরি বিরহানলে দহিছে পরাণ॥
কে মোর আপন আছে কহিব কাহারে।
পরাণ গৌরাঙ্গ বিনে যে দুঃখ অন্তরে॥
ও গো নীলাচলবাসী করি নিবেদন।
ব'লে দাও কে হরিল মোর প্রাণধন॥
পরাণ গৌরাঙ্গ আমার কেবা হ'রে নিল।
নিদারুণ বিধি কেন এ বাদ সাধিল॥
এই ত দেখিনু স্বরূপ রামানন্দ সনে।
ভাবাবেশে ছিল গোরা রস আলাপনে॥
সেই খোল করতাল সেই ত কীর্ত্তন।
সেই নীলাচলবাসী সেই ভক্তগণ॥
সেই তরুলতা সেই গুণ্ডিচা মন্দির।
না হেরি গৌরাঙ্গ চাঁদে পরাণ অথির॥
কাঁহা স্বরূপ রামরায় কাঁহা সীতানাথ।
কাঁহা শ্রীবাস গদাধর কাঁহা বাণীনাথ॥
অনাথা করিয়া মোদের ফেলাইয়া দুখে।
গৌরাঙ্গ লইয়া কোথা বিহরিছ সুখে॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
গৌরাঙ্গ বিরহে কেন না গেল মরিয়া॥

বলিতে বলিতে ঠিক্ বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই রোদন—সেই আর্ত্তির তুলনায় পতিবিরহিণী সতীরমণীর

রোদন অতি যৎসামান্য। কি যেন বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না—কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। "হায় কি হইল" বলিয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। ভাবে গড়া তনুখানি বিরহতাপে যেন শ্লথসন্ধি হইয়া গেল। ইঁহার এইরূপ অবস্থাদর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কি করিলে স্থির হইবেন, কিছুই ঠিক্ করিতে না পারিয়া সঙ্গিগণ বড়ই চিন্তিত হইলেন। ইত্যবসরে প্রহরী দ্রুতগতি আসিয়া শশব্যস্তে দরজা খুলিয়া দিল। তখন শ্রীরঘুনাথ দেব গোস্বামী প্রভু বাবাজী মহাশয়ের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই যে সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। আসুন আমরাও তাঁহার অনুসরণ করি।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। ক্রমে বহু সন্তর্পণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গিগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না—প্রত্যেকের হাতে এক এক মুষ্টি ঝাড়ু। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দেব গোস্বামী রত্নবেদীর উপর উঠিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে উপর নীচ চারিধার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কেহ বা অপর একজনকে কাঁধে চড়াইয়া তাহাদ্বারা মন্দিরের উপরিভাগ পরিষ্কার করাইতেছেন। বাবাজী মহাশয় নিজের চাদরে করিয়া ধূলি কাঁকর প্রভৃতি বাহিরে ফেলিয়া সকলকে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার নিত্যপ্রকটত্ব অনুভব করাইতেছেন। ক্ষণকাল পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আহা মরি! পরমদয়াল গৌরাঙ্গচাঁদ আমার নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন।" বলিয়াই ভাবগদগদকণ্ঠে পদ ধরিলেন :—

প্রেমোল্লাসে গৃহশোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥
ধূলিধূসরিত তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহো কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া॥
এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে॥
প্রভু কহে কেবা কত করিয়াছ মার্জ্জন।
তৃণ ধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
সবার ঝাঁটিনাবোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এই মতে অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥

এইরূপে বাবাজী মহাশয় গৌরাঙ্গলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে মন্দিরের ভিতর, বাহির, জগমোহন, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি পরিষ্কার করতঃ যেমন "জল আন" বলিয়া ডাক দিলেন, অমনি শত শত কলসী জল আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি ও

হরিধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। একদল হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছে এবং অপর একদল ঐরূপভাবে জল লইয়া আসিতেছে। উভয় দলের পরস্পর সম্মিলনে যেন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিতেছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা— সকলেই আত্মবিস্মৃত। বিলাসী যুবকগণ বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া কৌতুক দেখিতে গিয়াছে; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। কেহ বা বিহ্বলভাবে পরিধেয় বসনাঞ্চলে কেহ বা উত্তরীয় দ্বারা জলাপসরণ করিতেছে। কেহ কেহ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে। কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে। কোন কোন ভদ্রমহিলা স্বামী কিংবা কোনও গুরুজনের সঙ্গে দর্শন করিতে গিয়াছেন। কিন্তু অভূতপূর্ব্ব আনন্দময় ব্যাপার দর্শনে বিভোর ভাবে কলসী কাঁখে লইয়া জল আনিতে যাইতেছেন। কেহ কেহ বা মন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিতেছেন। কেহ বা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুটী চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। যেন প্রেমানন্দের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। এ সকল আনন্দের কথা ভাষায় ব্যক্ত বা লেখনীতে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সকল ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতীগণ প্রভুর কৃপায় সাক্ষাৎ দর্শন বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ক্রমে ধোয়াপাখ্‌লা লীলা শেষ করিয়া সকলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমনপূর্ব্বক জলকেলি আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর যেন আনন্দ-সরোবর হইয়া উঠিল। সরোবরের জলস্পর্শ করা মাত্র সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ জলকেলি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর সকলে ঘাটের উপর বসিলেন। এই সময় সিদ্ধবকুলমঠের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে

আলিঙ্গনপূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদিগ্রন্থে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীহস্তে এই গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালপ্রভাবে সেই লীলা প্রায় লুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। কেবল গুণ্ডিচামার্জ্জন নাম মাত্র ছিল। এই পাঁচবৎসর হইতে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পারিষদ তোমাকে প্রেরণ করিয়া তোমাদ্বারা সেই লীলা পুনঃপ্রকট করিয়াছেন। উত্তরোত্তর আনন্দের বৃদ্ধিই হইতেছে এবং প্রতিবৎসরেই যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি আজ যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিলাম, আমার অশীতি বৎসর বয়সের মধ্যে এরূপ আনন্দ আর কখনও অনুভব করি নাই। তোমার সঙ্গসুখ এবং কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া এদেহে জীবিতাশা যেন ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। বাবা! আমি বৃদ্ধ; তোমায় আর কি দিব? তবে সরলপ্রাণে মহাপ্রভুকে জানাইতেছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর। তিনি তোমার দ্বারা লুপ্তসেবা, বিলুপ্তলীলা এবং লুপ্ত তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি পুনঃ প্রকাশ করুন। তোমাদ্বারা তাঁহার অনেক কার্য্য সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আমি চিরদিন তোমাকে বাৎসল্য করিয়া আসিতেছি; কিন্তু আজ আর আমার মনোভাব গোপন রাখিতে পারিতেছি না। তোমার ক্রিয়াকলাপ দর্শনে তোমাকে আমাদের ন্যায় সামান্য মনুষ্য বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না। আমার বিশ্বাস, তোমার দেহে পরম কারুণিক লীলাময় নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। নতুবা এরূপ অলৌকিক লীলা কখনও সামান্য মানবে সম্ভবে না। আমি এজীবনে অনেক সাধুবৈষ্ণবসঙ্গ ও মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এমন মাধুর্য্যমাখান ঐশ্বর্য্য আমি অন্য কোথাও দেখি নাই বা দেখিব বলিয়া বিশ্বাসও নাই।" এই কথা শুনিয়া গঙ্গা-মাতামঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী এবং শ্রীবিহারী পূজারী,

শ্রীহরিভজন দাস অধিকারী, এবং সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি আট দশজন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অধিকারী মহাশয়! ঠিক কথা বলিয়াছেন। এরূপ কীর্ত্তনানন্দ, ভাবপ্রেম ও অসাধারণ শক্তি কখনই সামান্য মানবে সম্ভবে না। ইহা নিশ্চয়ই রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদের খেলা বুঝিতে হইবে।"

বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ করযোড়ে দীনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা শেষ হইলে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমি আপনাদের দাসানুদাস। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সর্ব্বদা আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি।" বলিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। অধিকারী মহাশয় ইঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। অন্যান্য সকলেও প্রতিদণ্ডবৎ ও প্রেমালিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ইঁহারা সকলে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" নাম করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন এবং অন্যান্য সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে অনেক লোক। সুতরাং ইঁহাদের থাকিবার জন্য তিনটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে জগন্নাথবল্লভের একটী কুঠরীতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জনিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র দাস নামক জনৈক ভক্ত একখানি মহাপ্রভুর চিত্রপট জগন্নাথ-বল্লভে রাখিয়া আসেন। কৃষ্ণানন্দদাস, শীতলদাস, গোকুলদাস প্রভৃতি কয়েকজন সেই স্থানে থাকিয়া সেই চিত্রপট সেবা করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস মহান্ত বাবাজী মহাশয় বড় হরিশ বাবুর বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য কয়েকজন সেস্থানে

থাকিতেন। বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় পারিষদ চৈতন্যদাস পীড়িত হইয়া প্রায় মাসাবধি কাল ইঁহার নিকট হইতে শ্রীধামে আসেন। তাঁহাকে বড় হরিশবাবুর বাড়ীর সংলগ্ন পুরাতন ডাকঘর বাড়ীর একটী কুঠরীতে রাখা হয়। তাহার শুশ্রূষার জন্য জয়গোপাল দাস ও নবদ্বীপ দাস এই দুইজন সেই বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। বাবাজী মহাশয়ের পুরী আগমনের পর ইঁহার গুরুদেবকেও ঐ ডাকঘর বাড়ীর একটী কুঠরীতে বাসা দিয়া ইঁহারা সকলে হরিশবাবুর নিজ বাড়ীতে থাকিতেন।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা ও চৈতন্যদাসের অপ্রকট।

আজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। চারিদিকে মহা হুলুস্থুল ব্যাপার। বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক গণসহ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ জগমোহনে কীর্ত্তন হইবার পর বলভদ্রদেবের পহণ্ডীবিজয় আরম্ভ হইল। ক্রমে সুভদ্রাদেবী ও সুদর্শনচক্র রথে বিজয় করিলেন। ক্ষণকাল পরে রসময় জগন্নাথদেব সহাস্যবদনে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে জগবাসী নরনারীর মনপ্রাণ বিমুগ্ধ করতঃ রথে বিজয় করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। যেমন জগন্নাথদেবের চাঁদবদনখানি নয়নপথে পতিত হইল, অমনি ভাবাবেশে মধুর নৃত্য করিতে করিতে পদ ধরিলেন :—

ভাবেতে বিভোর, গৌর কিশোর,
নব নটবর রায়।
স্বরূপেরে ধরি, কহে ধীরি ধীরি,
দেখ্‌বি সজনী আয়॥

আসিছে কালিয়া, হেলিয়া দুলিয়া,
রসময় গুণধাম।
চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর,
নবীন নাটুয়া ঠাম ॥
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজে কিনি কিনি
পীতবাস পরিধান।
গলে বন মালা, করিয়াছে আলা,
রসিক নাগর কান ॥
বহুদিন পরে, যাবে ব্রজপুরে,
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি।
পাই রসরাজ, গোপিনী সমাজ,
রাখিবে হৃদয় ভরি ॥

আনন্দের অবধি নাই। লোকে লোকারণ্য। জগন্নাথদেব হেলিয়া দুলিয়া এক তুলিকা হইতে অপর তুলিকায় যাইতেছেন, আর উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে। ক্রমে জগন্নাথদেব রথে শুভ বিজয় করিলেন। আহা মরি! কি অপরূপ রথের সাজনি! রথের উপর মণিমাণিক্য-জড়িত চন্দ্রাতপ বাঁধা হইয়াছে। নানাবর্ণের পতাকাসকল উড়িতেছে। চারিদিকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি শোভা পাইতেছে। ঝাঁজ, কাঁশর, ভেরী, তুরী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, ঘষাবাদ্য * শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি কত যে বাজিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? পুরী রাজার প্রতিনিধি পাণ্ডা সুবর্ণসম্মার্জ্জনীহস্তে রথের সম্মুখে ঝাড়ু করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কালাবেঠিয়াগণ

* উড়িষ্যায় প্রচলিত দুইখানি কাটি দ্বারা ঢোলকের বাদ্য বিশেষ।

আসিয়া রথরজ্জু ধারণ করিল। এদিকে যাত্রিকগণ রথ টানিবার জন্য মহাব্যতিব্যস্ত। চতুর্দ্দিক্ লোকে লোকারণ্য। জগন্নাথের মুখপানে চাহিয়া কেহ বা হাসিতেছে, কেহ বা অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছে, কেহ বা আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা হইতে ব্রজে যাইবার জন্য রথে আরোহণ করিয়াছেন ; তাই দ্বারকাপুরবাসী-বাসিনীগণ ভাবী বিরহচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ব্রজরাজ-প্রেরিত কর্ম্মচারিস্বরূপ রাজকর্ম্মচারিগণ বহু চেষ্টা দ্বারা রথের অগ্রবর্ত্তী স্থান হইতে লোকসকলকে কিঞ্চিৎ অপসারণ করিলে রথটান আরম্ভ হইল। দাউজী যেন আমার সদাশিব ভোলানাথ; নন্দব্রজে যাইবার জন্য পরম উৎসাহী। যেমন রথরজ্জু ধরা, অমনি হড়হড় করিয়া রথ চলিতে লাগিল। আনন্দবিহ্বলভাবে কাহারও প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলভদ্রদেব একেবারে বলগণ্ডী উপস্থিত হইবামাত্র যেন ভায়ার কথা মনে হওয়ায় থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বড় দাদাকে যাইতে দেখিয়া, সুভদ্রাদেবীও অতি ব্যগ্রভাবে উধাও হইয়া ছুটিলেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন বিদায়কালে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিশেষ কোনও গুপ্ত কথা বলিবার মানসে জগন্নাথজিউ সুদর্শনকে সঙ্গে দিয়া ভগিনীকে দাদার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভগিনীও দ্রুতগতি বড় দাদার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় গণসহ জগন্নাথদেবের রথাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন। লক্ষ্মীদেবীর যেন কিছুতেই অনুমতি হইতেছে না ; তাই জগন্নাথ যাইতে পারিতেছেন না। সরলা ব্রজগোপীগণের মনোবেদনা অনুভব করিয়া বাবাজী মহাশয় সাশ্রুনয়নে গোপীভাবাবেশে পদ ধরিলেন :—

জগন্নাথে হেরি আমার গোরা গুণমণি।
ভাবাবেশে বলে যেন রাই কমলিনী ॥

বৃন্দাবনে চল বঁধু বিলম্ব না কর।
ব্রজবাসীর দশা যাই নয়নে নেহার॥
অন্ন নাহি খায় কেহ পাণি নাহি পিয়ে।
আশায় আছয়ে প্রাণ পথ নিরখিয়ে॥
তৃণ নাহি খায় গাভী নাহি যায় দূরে।
ঊর্দ্ধ মুখে তুয়া লাগি দিবানিশি ঝুরে॥
না চরায় গাভী কেহ না করে দোহন।
দুহিলেও দুগ্ধ নাহি করে আবর্ত্তন॥
আবর্ত্তিত দুগ্ধ কেহ দধি নাহি করে।
দধি করিলেও কেহ না যায় নগরে॥
দধি করি ব্রজনারী না করে মন্থন।
মথিলেও ননী লেই করয়ে রোদন॥
ব্রজভূমি হইল বঁধু শোকের আগার।
হাসি বিনিময়ে সদা শুনি হাহাকার॥
তুয়া বিনু ব্রজে কারো না রবে জীবন!
একবার ব্রজে চল ব্রজের জীবন॥

বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে কান্নার রোল উঠিল। এতক্ষণে যেন জগন্নাথদেবের চমক ভাঙ্গিল—বৃন্দাবনে যাইবার মন হইল। তখন ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। আনন্দ-সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ভেরী-তুরী প্রভৃতির ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইল। আজ বৃন্দাবনচাঁদ বৃন্দাবনে উদয় হইবেন—ব্রজের বিরহ-অন্ধকার দূরে যাইবে ভাবিয়া ব্রজপ্রাণ ভক্তগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। এক একবার জগন্নাথের মুখপানে তাকাইয়া কতই কি না

বলিতেছেন। জগন্নাথদেবও হেলিয়া ঢুলিয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যাইতেছেন। আজ যেন সকলেই অভিনব ভাবে বিভাবিত—সকলেই যেন নূতন আনন্দে উন্মত্ত। সকলেই মধুর নৃত্য করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় এক একবার গানে সপার্ষদে গৌরাঙ্গদেবকে নাচাইতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ রাধারাণী। গৌরাঙ্গগণ যেন ব্রজপরিকরগণ। আজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন, আর ভাবভরে প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। বাবাজী মহাশয় পদ ধরিলেন :—

নাচি নাচি যায়, গোরা নটরায়,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি।
চারিদিকে কত, ভক্ত শত শত
নাচে হরি হরি বলি॥
নাচে নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দ কন্দ,
গোরামুখ নিরখিয়া।
নাচয়ে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি যত,
আনন্দে বিভোর হইয়া॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ, স্বরূপ রামানন্দ,
নাচে মুকুন্দ মুরারি।
রায়-ভবানন্দ, সেন শিবানন্দ,
কাশী মিশ্র আদি করি॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে, নাচে মনোরঙ্গে,
বাসুদেব বক্রেশ্বর।
নাচে হরিদাস, কালা কৃষ্ণদাস,
বাণীনাথ গদাধর॥

শ্রীকমলাকর, দাস গদাধর
নাচে উদ্ধারণ দত্ত।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস, শ্রীগোপাল দাস
নাচে প্রেমে হৈয়া মত্ত॥
নাচে রামদাস, আর গৌরীদাস,
অভিরাম আদি করি।
নাচে নরহরি, গোরামুখ হেরি,
ভাবাবেশে ঘুরিফিরি॥
জগন্নাথে হেরি, আপনা পাশরি,
নাচয়ে ভকতগণ।
হরিবোল ধ্বনি, বিনু নাহি শুনি।
সবে আনন্দে মগন॥

আনন্দের আর অবধি নাই। স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ সকলেই যেন সেই আনন্দতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। জগন্নাথও যেন আনন্দে হেলিয়া ছুলিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন। যেন আনন্দের বাজার বসিয়াছে। ক্রমে জগন্নাথদেব রাজবাড়ীর সম্মুখে আসিলে পংক্তিভোগ লাগিল। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের মনে কি ভাবের উদয় হইল। সঙ্গিগণের অজ্ঞাতসারে পাশ কাটিয়া ধীরে ধীরে উদাসপ্রাণে রামচণ্ডী গলির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের হেড্ক্লার্ক বাবু গোপাল প্রসাদ দত্ত মহাশয়ের বারান্দায় গিয়া বসিলেন। মুখে হাসি নাই— কাহারও সহিত বাক্যালাপও নাই। অতি গম্ভীর ভাব। মুখখানি দেখিলে বোধ হয় যেন গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। যাহারা রাস্তা দিয়া যাইতেছে, তাহারা ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছে না।

আজ আট মাস হইল, বাবাজী মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গী চৈতন্যদাস শুরপ হইতে ইঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পীড়িত অবস্থায় পুরীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে বড় হরিশবাবুর পুরাতন ডাকঘরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী কুঠরীতে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করা হইতেছে। ইনি সর্ব্বদার জন্য নিজেকে দাসী মনে করিয়া গোপীভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। গুরুগতপ্রাণ—গুরুসেবাই ইঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গুরু ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না। এরূপ গুরুনিষ্ঠা জগতে অতি বিরল। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের যেরূপ নিষ্ঠা ও ভাব ছিল, চৈতন্যদাসেরও ঠিক সেইরূপ ভাব ও গুরুনিষ্ঠা। শয়নে, স্বপনে, আহারে, ব্যবহারে, আলাপে, বিলাপে তাঁহার মুখে গুরু ভিন্ন অন্য বুলি শুনা যায় না। তাঁহার সেবার জন্য নবদ্বীপ দাদা জয়গোপাল দাসকে নিযুক্ত করিয়াছেন। জয়গোপালও নবদ্বীপ দাদার আদেশে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতেছে। এই চৈতন্য-দাসের কৃপাই জয়গোপালের একমাত্র অবলম্বন। চৈতন্যদাস হইতেই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীদিগের মধ্যে গোপীভাবে উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আজ চৈতন্যদাসের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এমন কি জীবনের আশাও খুব কম। জয়গোপাল উঁহাকে পথ্য দিবার জন্য নিকটে গিয়া দেখে অবস্থা খুব খারাপ। জয়গোপাল ছেলেমানুষ; কাজেই চৈতন্যদাসের অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। তখন চৈতন্যদাস তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার কোনও ভয় নাই ভাই! তুমি একবার আমার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করাইয়া আমার পরম বন্ধুর কার্য্য কর। আমার মনে বড়ই সাধ যে, অন্তিম সময়ে শ্রীগুরুদেবের চরণ

দর্শন করিতে করিতে এ দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি প্রভুর চরণে প্রার্থনা করি, তিনি অচিরে তোমাকে তোমার স্বপ্নের অগোচর অপ্রাকৃত বস্তু প্রদান করুন। আমি আর তোমাকে কি দিব? গুরুদেব কৃপা করিয়া আমাকে যে ভাবরত্নটুকু দিয়াছিলেন, আমি অকপট হৃদয়ে তাহা তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি এই মধুর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুদিন প্রাকৃত জগতে থাকিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যের পরম সুখময় বস্তু আস্বাদন কর। এই বলিতে বলিতে নীরব হইলেন।

এদিকে নবদ্বীপ দাদা রথাগ্রে বাবাজী মহাশয়কে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিতমনে বাসায় আসিলেন। কিন্তু তথায়ও ইঁহাকে না পাইয়া ত্রস্তগতি চৈতন্যদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। তখন জয়গোপালের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া পুনরায় বাবাজী মহাশয়কে অন্বেষণ করিতে চলিলেন। কিছুদুর যাইতে না যাইতে দেখেন যে, মহাপুরুষ গোপালবাবুর বারান্দায় উদাস প্রাণে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তখন নিকটে গিয়া বলিলেন, "চৈতন্যের অবস্থা বড় ভাল নয়। সে তোমাকে একবার দেখিতে চায়।" বাবাজী মহাশয় নিরুত্তর। নবদ্বীপ দাদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পুনরায় বাসায় ফিরিয়া জয়গোপালকে বাবাজী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন এবং চৈতন্যের সর্ব্বাঙ্গে দ্বাদশ তিলক ও নামাঙ্কিত ছাপা দ্বারা ভূষিত করিয়া দিলেন। জয়গোপাল বালক, তাহাতে আবার বাবাজী মহাশয়কে একটু ভয়ের চোখে দেখিত; সুতরাং ইঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কখনই বাক্যালাপ করিবার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আজ সে নবদ্বীপদাদার আদেশের সঙ্গে কি এক শক্তি পাইল যে, একেবারে বাবাজী মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি কেমন মহাপুরুষ? এক ব্যক্তি অন্তিমকালে আপনাকে দেখিতে চায়, আর আপনি কি না নিশ্চিন্তমনে

এখানে বসিয়া আছেন! শীঘ্র চলুন।" এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ কি ভাবিলেন; একটু মৃদু হাসিয়া উঁহার সঙ্গে আস্তে আস্তে আসিয়া চৈতন্যের মাথার নিকট দাঁড়াইলে নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "চৈতন্য! এই যে দাদা আসিয়াছেন।" চৈতন্যদাস কোনও কথা না বলিয়া চোখের ভঙ্গিতে বাবাজী মহাশয়কে নিজের পায়ের দিকে দাঁড়াইতে বলিলেন। বাবাজী মহাশয়ও কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চৈতন্যের পায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। চৈতন্যদাস আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে একবার বাবাজী মহাশয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক একদৃষ্টে মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। তখন নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চরণ ধারণপূর্ব্বক চৈতন্যের বুকের উপর দিতে গিয়া দেখেন যে, কয়েকখানা কাগজ চাদর-ঢাকা রহিয়াছে। তখন কাগজ কয়খানা সরাইয়া বুকের উপর চরণখানি রাখিলেন। চৈতন্যদাস সজল নয়নে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চিরবিদায় মাগিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয় এ পর্য্যন্ত নিশ্চল, নিস্পন্দ, স্থির ধীরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এতক্ষণে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল—প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "চৈতন্য রে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চির শান্তিময় রাজ্যে গমন করিতেছিস্! আমি আর কি বলিব? তোমার জন্মজন্মার্জ্জিত যত কিছু পাপ তাপ অপরাধাদি সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম। তুমি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরম দয়াল নিতাইচাঁদের গণে গণ্য হইয়া তোমার অভিলষিতভাবে প্রার্থিত বস্তু আস্বাদন কর।" এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথ কুণ্ডাইবেণ্টসাহির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য রামদাস সদলে রথের অগ্রে কীর্ত্তন করিতেছিলেন হঠাৎ এরূপভাবে আকর্ষণ হইল যে, উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সকলে

একেবারে চৈতন্যদাসের নিকট গিয়া দেখেন অপূর্ব্ব দৃশ্য! " চৈতন্যের আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন-ভৃঙ্গযুগল বাবাজী মহাশয়ের মুখকমল মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। নিজহৃৎপদ্মে বাবাজী মহাশয়ের চরণ-পদ্ম রাখিয়া প্রেমানন্দসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। মুখখানি মৃদুমধুর হাসিমাখা এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ। এক একবার চমকিয়া চমকিয়া যেন মনুষ্যজীবনের শেষ প্রার্থিত বস্তু লাভ—সাধনের চরম অবস্থা প্রাপ্তি —পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতেছে। সকলেই উচ্চকণ্ঠে "হা নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হা হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতেছে, আর অঝোরে ঝুরিতেছে। হঠাৎ চৈতন্যের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল—নয়ন যুগল বিস্ফারিত হইল—মুখের মৃদুহাসি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইল। একটু বিস্মিতভাবে স্থির নেত্রে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। আর শ্বাস নাই—দেহের স্পন্দন নাই—হৃদয়ের আবেগ নাই—প্রাণের ব্যাকুলতা নাই—চোখের ভঙ্গি নাই। জয়গোপাল উহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃ স্বরে শ্রীগুরুদেবের নাম শুনাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আহা মরি কি অপরূপ দৃশ্য! আমরা ইহাকে কি বলিব? মৃত্যু না নবজীবন প্রাপ্তি? দেহত্যাগ? না দেহ-ধারণ? অভাব? না ভাবে প্রবেশ? অপ্রকট? না নির্ব্বিকল্প সমাধি? অশান্তি? না চিরশান্তি? নিরানন্দ? না পরমানন্দ? উপেক্ষণীয়? না বাঞ্ছনীয়? অন্তিমকাল? না প্রথম কাল? অশুচি? না পরম পবিত্র? সকলেই অনিমেষনয়নে চৈতন্যের মুখপানে চাহিয়া আছেন এবং তাঁহার আনন্দময় অবস্থা দর্শনে একবাক্যে তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। ক্রমে চৈতন্যের হাসিমাখা মুখখানি যেন উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সকলেরই চোখে জল—কণ্ঠ গদগদ—মুখে "হা নিতাই

গৌর রাঙে শ্যাম। হা হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এইরূপ ভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। নবদ্বীপ দাদা চৈতন্যের বুকের চাদর সরাইয়া দেখেন দুইখানি কাগজ রহিয়াছে। একখানিতে শ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীগুরু-প্রণাম আর একখানিতে লক্ষ গুরুর নাম। সকলে দেখিয়া অবাক্। এরূপ গুরুনিষ্ঠা— এরূপ গুরুভক্তি এ জগতে অতি বিরল। বাবাজী মহাশয় একপার্শ্বে বসিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ কণ্ঠে চৈতন্যের গুণের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৃপাময় নিতাইচাঁদ আমাকে এমন নিষ্ঠাবান্ ভক্তের সঙ্গ দিয়া আবার কেন যে ইহাকে অঙ্গীকার করতঃ আমাকে সে আনন্দময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিলেন তিনিই জানেন।"

ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া সুচতুর গোবিন্দ দাদা চৈতন্যের দেহখানি বাহিরে আনিয়া একখানি চৌকির উপর শয়ন করাইলেন। এই সময় জনৈক ভক্ত একগাছি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদীমালা, চরণতুলসী ও কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদহস্তে আসিয়া প্রসাদী মালাগাছটী বাবাজী মহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয়ও সেই মালাগাছটী চৈতন্যের গলায় পরাইয়া দিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ 'জয় নিতাই' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল। এদিকে রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ ও চরণতুলসী সকলের মুখে দিয়া সেই অংরামৃত চৈতন্যদাসের মুখে দিলেন। বাবাজী মহাশয় চৈতন্যের প্রতি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা দেখিয়া তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলে চৈতন্যকে লইয়া নাম করিতে করিতে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় নিজ হস্তে উঁহাকে সমুদ্রের জলে স্নান করাইলেন। পরে প্রসাদী ডোর-কৌপিন ও বহির্ব্বাস পরাইয়া তাহাকে বুকে ধরিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। আহা মরি মরি কি অপূর্ব্ব বাৎসল্য! চৈতন্যের মস্তকটী

বাবাজী মহাশয়ের কাঁধের উপর রহিয়াছে। হাতদুখানি ইঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। হাসিমাখা মুখখানি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি চিরঅভিলষিত দেবদুর্লভ শ্রীগুরুদেবের প্রেমালিঙ্গনে চিরশান্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। বাবাজী মহাশয় এইরূপ প্রেমোন্মত্তভাবে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে চৈতন্যের দেহখানি ইঁহার বুক হইতে নামায়। ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের কথা সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হইলে গোবিন্দ দাদা চৈতন্যের দেহখানি ইঁহার বুক হইতে লইয়া কাষ্ঠশয্যায় শয়ন করাইলেন। সকলেরই চোখে জল—মুখে হাহাকার! যথাসময়ে সৎকার-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সকলেই সাশ্রুগদগদকণ্ঠে 'হা নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হা হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' এই নাম করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব চন্দন গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। উপস্থিত জনসাধারণ এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। জনৈক ভক্ত চৈতন্যদাসের বিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রাণের আবেগে একটী পদ গান করিয়াছিলেন। সেইটী এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল :—

শ্রীচৈতন্য দাস গৌর ভক্ত শিরোমণি।
গোপীভাবাবেশে মগ্ন দিবস রজনী ॥
কি মোহিনী মূর্ত্তিখানি কিবা ভাবাবেশ।
হৃদয়ে ছিল না যাঁর কভু হিংসা দ্বেষ ॥
গুরুনিষ্ঠা গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
গুরু সর্ব্বেশ্বর জগৎ গুরুর প্রকাশ ॥
গুরুসেবাগত প্রাণ বৈষ্ণবেতে রতি।
গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান গুরুগতি মুক্তি ॥

অকপট সরলতা আছিল যাঁহার।
জগজনে ছিল যাঁর মিষ্ট ব্যবহার ॥
অন্তরে বাহিরে যাঁর ছিল গোপীভাব।
সেবাপ্রীতি প্রেমোল্লাস উদার স্বভাব ॥
এক মুখে তাঁর গুণ কে বর্ণিতে পারে।
শ্রীগুরু করুণা যারে সে জানিবে তাঁরে ॥
কৃপা করি নিতাইচাঁদ দিয়াছিলে সঙ্গ।
আকর্ষিয়া তারে মোদের কৈলে সঙ্গভঙ্গ ॥
আশীর্ব্বাদ কর ভাই! চরণে প্রণতি।
তোমার প্রভুর পদে থাকে যেন মতি ॥

এইরূপে চৈতন্যদাসের তাৎকালিক ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সকলে সমুদ্রস্নান করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে দিন বাবাজী মহাশয় যাহাকে দেখিতেছেন, তাহারই নিকটে শতমুখে চৈতন্যদাসের গুণ-বর্ণনা করিতেছেন।

এবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গতি কিছু মন্থর। বাবাজী মহাশয় গণসহ প্রতিদিনই রথাগ্রে কীর্ত্তন নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ভক্তের মান রক্ষার জন্য ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে অষ্টমীর দিবস সন্ধ্যার সময় গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আজপুরীবাসী আপামর সাধারণের আনন্দের আর সীমা নাই। নানাবিধ ভোগরাগের ধূম পড়িয়া গেল। কেহ বা বৈষ্ণবসেবা উদ্দেশ্যে, কেহ বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য, কেহ বা দুখী কাঙ্গালির জন্য নানারূপ দ্রব্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিতেছে। আজ সাত-আট দিন পরে অন্নমহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে পরমানন্দিত হইলেন। ক্রমে জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ কয়েকদিনে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন।

সঙ্গিগণের প্রতি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ—প্রাতে সমুদ্রস্নান এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে সংকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে লালাবাবুর ছত্রে এবং অন্যান্য ছত্রে দুই চারিজন করিয়া মহাপ্রসাদসেবা, বৈকালে আশ্রমে নামসংকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরতি কীর্ত্তন ইত্যাদি। আনন্দময়ের সঙ্গে সকলেই আনন্দময়। বহু পরিশ্রমেও কাহার আনন্দের অভাব নাই। এইরূপ পরমানন্দে দিন কাটিতে লাগিল।

প্রেমানন্দ-সংবাদ।

একদিন বেলা অনুমান তিনটার সময় বাবাজী মহাশয় কয়েকজন সঙ্গিসহ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে লালাবাবুর ছত্রের দিকে যাইতেছেন, এই সময় ঐ ছত্রের নিকটবর্ত্তী একটী বাড়ী হইতে জনৈক ভদ্রলোক এবং একমূর্ত্তি বৈষ্ণব বাহির হইয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে ইঁহাদিগকে তাহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সকলে বাবুটীর বিশেষ অনুরোধে একটী ঘরের মধ্যে বসিলে বাবুটী সকলের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের কোথায় যাওয়া হইতেছিল ?

বাবাজী। বাবা! আমরা কাঙ্গাল, লালাবাবুর ছত্রে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য যাইতেছিলাম।

বাবু। আজ্ঞে, যদি দাসের প্রতি আদেশ হয়, তবে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ আনাইয়া সেবার জোগাড় করিয়া কৃতার্থ হই।

বাবাজী। আমরা ত "উদর পূরণ আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে" আমাদের আর আপত্তি কি বাবা! "এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ" আমরা চৌষট্টি অঙ্গের অন্য কোনও অঙ্গ যাজন করিতে পারি আর নাই পারি মহাপ্রসাদ সেবন অঙ্গটী যাজনে

আমাদের বিশেষ নিষ্ঠা। এমন কি উহাতে অশ্রুকম্প পুলকাদিও হইয়া থাকে।

বাবুটী বাবাজী মহাশয়ের মুখে ঐরূপ রসে মাখা আত্মদৈন্যতার কথাশ্রবণে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবমূর্ত্তিকে মহাপ্রসাদ আনিবার জন্য মন্দিরে প্রেরণ করিলে বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! তোমাদের নিবাস কোথায়?"

বাবু। আজ্ঞে দাসের নিবাস রংপুর জেলা—নাম প্যারীমোহন দাস।

বাবাজী। নামটী ত বেশ মধুর, কি কাজ করা হয়?

বাবু। আজ্ঞে আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি দিয়াছেন, তদ্দারা একরূপ চলে। আর কার্য্য করিবার শক্তিও আপনি দেন নাই। এখন শ্রীচরণে এই প্রার্থনা যে বিষয়রোগ হইতে দাসকে মুক্তিপ্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। আর কেন প্রভু? অনেক হইয়াছে!

বাবাজী। স্ত্রী পুত্রাদি সব কি দেশেই আছে?

বাবু। আজ্ঞে ও বিষয়ে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছেন, কেবল একটীমাত্র ভগিনী আছে। তাহাকে কোনও ধামে ফেলিয়া রাখিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত।

বাবাজী। বাবা! প্রভু যাহাকে করুণা করেন, তাহার ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, কতদিন শ্যামে আসা হইয়াছে?

বাবু। এই তিন চারি মাস মাত্র। রথের সময় আপনার দর্শন পাইয়াছি; কিন্তু আলাপ করার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। আজ আপনি কৃপা করিয়া সুযোগ দিয়াছেন এবং নিজে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাই কথা বলিবার সাহস পাইয়াছি। আমি ঘোর পাপী পাষণ্ডী; আমার ন্যায় লোকের পক্ষে আপনার দর্শনলাভই সম্পূর্ণ

বাবাজী। বাবা! ওসব কিছু নয়, সবই নিতাইচাঁদের খেলা। আমরা তাঁহার পুতুল মাত্র। তিনি যখন যেমন ভাবে নাচাইতেছেন ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক সেইরূপ ভাবে নাচিতেছি। তিনি আমাদের পরস্পর মিলনের জন্য আজিকার দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিলে কি হইবে?

ইত্যবসরে মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া আবার সেই ঘরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। প্যারী বাবুও মহাপ্রসাদ পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিলেন। তাঁহার মনে মনে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু সাহস পাইতেছেন না। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় উঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। স্বচ্ছন্দে বল, কোনই বাধা নাই।" শুনিয়া প্যারীবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "আজ্ঞে! আমাদের ন্যায় পতিত জীব কি উপায় অবলম্বন করিলে সহজে ভগবৎ-পথে অগ্রসর হইতে পারে? অনেকেই অনেক উপায় বলিয়া থাকেন; কিন্তু কিছুতেই আমার মনের ভ্রম ঘুচিল না। আপনি কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ের সন্দেহ দুর করিয়া দিন।

বাবাজী। কলিহত পাপাসক্ত মায়ামুগ্ধ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের একমাত্র নামসংকীর্ত্তন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এবিষয়ে গোস্বামিগণ বহু বহু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অতি সহজভাবে গুরুদেব যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, শ্রবণ কর—দ্বাপরাবসানে প্রবল-পরাক্রম দুর্দ্দান্ত কলিরাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াই দেখিলেন যে, প্রজাসকল রাজবিদ্রোহী। এদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অধর্ম্ম, পাপলিপ্সা, অজ্ঞান, হিংসা, পরনিন্দা,

প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই প্রজাদের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করিতে লাগিল। সুতরাং কলিরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগের উপর আদেশ করিলেন, "তোমরা যে কোনও উপায়েই পার প্রজাদিগকে আমার বশে আনিয়া দিতেই হইবে।" রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার এইরূপ কঠোর আদেশ পাইয়া প্রজাগণের উপর তীব্র শাসন আরম্ভ করিল। বলিতে কি, উহাদের উৎপীড়নে প্রজাগণের কেবল প্রাণমাত্র অবশেষ রহিল। কাজেই জীবগণ কলিভয়ে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানারূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। উহাদের পদভরে প্রপীড়িতা পৃথিবী ধর্ম্মের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে বৃষরূপী ধর্ম্ম ত্রিপদ-ভগ্ন-অবস্থায় মুমুর্ষুভাবে অবস্থান করিতেছেন। তখন উভয়ে নিজ নিজ দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া উহা দূর করিবার মানসে জীবের বিরুদ্ধে শ্রীবিষ্ণুর নিকট ফৌজদারী কোর্টে অভিযোগ করিলেন।

আসামী জীবগণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া জবাব দিল যে—"ধর্ম্মাবতার! এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ মাত্রও দোষ নাই; কারণ আমরা কলিরাজের ভীষণ উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার আদিষ্ট পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। কলিশাসনাধীনে থাকিয়া আমাদের দ্বারা কোনওরূপ ধর্ম্মাচরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব হুজুরে প্রার্থনা যে, আমাদের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।" বিচারপতি উভয় পক্ষের যথাযথ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী ভক্তপ্রবর রাজা পরীক্ষিতের উপর কলিরাজের শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং জীবগণের প্রতি কাম্যকর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, ব্রত, নিয়মনিষ্ঠা, তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি যাজনের হুকুম দিলেন। রাজা পরীক্ষিত সুযোগ পাইয়া কলিরাজের নিগ্রহকরতঃ জীবগণের উপর অত্যাচার না

হয়, এইরূপ আদেশ করিলেন।

জীবগণ পুনরায় ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তখন পরাভূত কলিরাজ অনন্তোপায় হইয়া সূক্ষ্মভাবে নানারূপ কৌশলে আবার নিজ অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বল জীবগণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কলিরাজের ছলনায় প্রতারিত হইয়া পুনরায় পাপপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুতরাং পৃথিবী পূর্ব্ববৎ পাপভারে কাতরা এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি দ্বারা জীর্ণশীর্ণা হইয়া ইন্দ্রদেবের নিকট এইরূপ ব্যতিক্রমের যথাযথ কারণ জিজ্ঞাসা করায় দেবরাজ বলিলেন—"জীবগণ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের প্রাপ্য অংশ না দেওয়াই এইরূপ অনর্থের মূল কারণ।" শুনিয়া পৃথিবী জজ্‌কোর্ট দ্বারকায় জীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। জজ্‌সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র জীবগণকে যথাযথ কারণ জিজ্ঞাসা করায় উহারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমাদের কোনই অপরাধ নাই; কারণ বিশুদ্ধ ঘৃতাদি ও উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে যজ্ঞাদীর, কলিরাজের উৎপীড়নে হৃদয়ের দুর্ব্বলতাবশতঃ ব্রতোপবাসাদির, মন্ত্র ও মান্ত্রিকের অসংস্থান হেতু কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব আমাদের অবস্থা বুঝিয়া হুজুরের বিচারে যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন।" জজসাহেব জীবগণের জবানবন্দি যথার্থবোধে তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক রায় দিলেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

জীবগণ! তোমাদের ভয় নাই; যেহেতু তোমরা যজ্ঞাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে অসমর্থ; অতএব বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাদিগকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তিপ্রদান

করিব।” রায় শুনিয়া বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষই পরম আনন্দলাভ করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মূঢ় জীবগণ ভগবদ্‌বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িল। স্থূল কথা—ভগবদ্‌বাক্যের একাংশ অর্থাৎ “সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক” এই অংশটী বিশেষরূপে যাজন করিতে লাগিল। এমন কি, দেব-দ্বিজ-গুরু বৈষ্ণবাদির প্রতি অবিশ্বাস, তীর্থাদিতে অশ্রদ্ধা, বেদাদিতে অবজ্ঞা হেতু ঘোরতর পাষণ্ডভাব ধারণ করিল। কিন্তু ভগবদ্বাক্যের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ একান্তমনে শরণাপন্ন হওয়া কথাটি একবারে বাদ পড়িয়া গেল। কাজে কাজেই অধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় পৃথিবীর পাপভার পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া পড়িল। পৃথিবী দেখিলেন বড়ই বেগতিক; কিছুতেই জীবকে ধর্ম্মপথে আনিতে পারিতেছেন না। জীবসকল পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে বহু অর্থব্যয় করিয়া বৃথা আমোদপ্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল। দান, ব্রত, জপ, তপ, নিয়মাদির অনুষ্ঠান একেবারেই লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। যদিও কেহ কেহ কিছু অনুষ্ঠান করে, সেও দম্ভ-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ; কাজেই বিপরীত ফললাভ হইতে লাগিল। তখন পৃথিবী অত্যন্ত কাতরা হইয়া কি উপায়ে কোথায় কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপভার লাঘব হইবে ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞানাবলম্বী মহাপুরুষগণকে মধ্যস্থপদে নিযুক্ত করিয়া জীবগণ যাহাতে অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হওতঃ সৎপথে অগ্রসর হইতে পারে, এবিষয়ের ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন জ্ঞানাবলম্বী মহাত্মাগণ পৃথিবীকে বিশেষভাবে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য-কৃত ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির ভাষ্যে নিরাকারবাদ প্রচার করিয়া জগৎ প্লাবিত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। লোকসকল আচরণ করুক আর নাই করুক “তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “সোঽহম্” প্রভৃতি মহাবাক্য মুখস্থ

করিয়া রাখিল। রীতিমত সংসারভোগ বিলাসাদি করিতেছে; কিন্তু লোককে বুঝাইবার জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবীর পাপভার অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িলে পৃথিবী আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া পরম কারুণিক প্রেমদাতা দয়াল প্রভু ব্রজবিলাসসুখ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। পৃথিবী দেখিলেন, এইবার আমার দুঃখ দুর হইবার উপায় হইল। এইবার বিশেষভাবে এই হাকিমের নিকট আপিল করিতে হইবে ভাবিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টারগণের সাহায্যে জীবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট আপিল করিলেন। এবার জীবগণ দেখিল, এই শেষ কোর্টে যদি আমাদের উপর তেমনি কঠোর আদেশ হয়, তবে বড়ই অসুবিধা হইবে; কাজেই এবার একটু বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক; বুঝিয়া শ্রীনিতাই, অদ্বৈত এবং হরিদাস এই তিনজনকে ব্যারিষ্টার দিল। স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায় এই দুইজন সরকারী উকীল। ক্রমে বিচার চলিতে লাগিল। ফরিয়াদির পক্ষের ব্যারিষ্টারগণ জীবের বিরুদ্ধে অনেক নজীর দেখাইতে লাগিলেন। বিচারক উভয় কোর্টের নথি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সরকারী উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সরকারী উকীলগণ ফরিয়াদির ব্যারিষ্টারের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন। সুকৌশলী বিচারক কাহারও মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া জুরীর উপর বিচারের ভার ন্যস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীনিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সাতজন জুরীতে বসিলেন। কিন্তু জুরিগণ আপত্তি করিলেন যে, "হুজুর! আমরা বিচার করিলেও শেষ মীমাংসার ভার আপনার উপরই রহিল।"

হাকিম ঐই কথায় স্বীকৃত হইলে বিচার আরম্ভ হইল। উভয় দলে অনেক বাদানুবাদের পর অধিকাংশের মত লইয়া বিচারক একেবারে শেষ রায় লিখিয়া অতি আনন্দের সহিত সরকারী উকীলদিগকে লক্ষ্য করিয়া রায় প্রকাশ করিলেন :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
*   •   •
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কালদেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

রায় শুনিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন :—

"পতিত পাষণ্ডী স্ত্রী যবন এ জগতে।
উদ্ধার হইল শ্রীচৈতন্য-কৃপা হইতে॥
আচণ্ডালে নাম প্রেম দিয়া কৈল ধন্য।
ঐছে দাতা দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥"

আহামরি! এই বিচারালয়টী যেন করুণানির্ম্মিত! বিচারকের মুখখানি যেন করুণা-পীযুষস্রাবী অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, বা ভক্তভৃঙ্গ-চিত্তবিনোদনকারী মকরন্দপূর্ণ হেমকমল, কিংবা পাষণ্ডস্বভাব-বিকারনাশী সুতীব্র ভৈষজ্য, অথবা ভক্তহৃদয়ের চিন্তামণি। উঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালী প্রেমময় মূর্ত্তিখানির দর্শন ত দূরের কথা; একবার মাত্র মনোমধ্যে উদয় হইলেই আসামী মুক্তিলাভ করে—ফরিয়াদি শান্তিরস-প্লাবিত, উকীলগণ প্রেমে বিহ্বল এবং সাক্ষীগণ নির্ভীক ও আনন্দময় হইয়া যায়। আবার বিচারটীও কি অনির্ব্বচনীয় কৃপার পরিচয়! বিচারক সরকারী উকীলগণকে কহিলেন,—"দেখ, আসামী জীবগণ ত অনাদিকাল হইতে মোহকারাগারে বন্দী হইয়াই রহিয়াছে। আবার তাহাদিগকে কি শাসন করিব বা শাস্তি দিব? আমার মতে বরং সেই চিরকারাগার হইতে তাহারা কিরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা তাহাদিগকে বল, তাহারা একবার মাত্র হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করুক, আমি তাহাদিগকে চিরমুক্তি প্রদান করিব।" বিচারকের অপূর্ব্ব করুণাপূর্ণ আদেশশ্রবণে উকীলগণ প্রেমপুলকিত হইয়া উৎফুল্লহৃদয়ে মোহকারাগারগ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবগণকে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন; "দেখ জীবগণ! তোমরা একবার হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ কর। পরম কারুণিক বিচারক শ্রীগৌরাঙ্গদেব অশেষ যন্ত্রণাদায়ক এই মোহকারাগার হইতে তোমাদিগকে চিরমুক্তি প্রদান করিবেন।" এই শুভ সংবাদ শ্রবণে কেহ আনন্দবিহ্বলহৃদয়ে মনে প্রাণে নাম করিতে লাগিল; কেহ বা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া মুখে বলিল বটে; কিন্তু মনপ্রাণ মজিল না—হৃদয় দ্রবিল না; কাজেই ভজিতেও শিখিল না। কেহ বা শুনিয়াও শুনিল না; অবজ্ঞা সহকারে বলিল:—"বেশ আছি বাবা! আবার ওসব নামটাম করা বা ভজাভজি

কেন? হরি বলিলে আবার এর চেয়ে বেশী কি সুখ হবে? কেহ বা বলিল "হরি বলিতে আপত্তি নাই বটে; কিন্তু সময় কৈ? সারাদিন-রাত খেটে খেটে সংসার চালান ভার; আবার হরি বলি কখন্ বাবা? ওসব যাদের কোনও কাজকর্ম্ম নাই, তাদেরই সাজে। ভগবান্ হাত পা দিয়াছেন, সংসারে খাটিয়া খাই। সকলেই যদি সাধু হইবে, তবে সংসার করে কে?" নিতাইচাঁদ দেখিলেন, বহুদিনের কারাবাসী জীব কারাগারকেই সুখের আগার মনে করিতেছে। এসময় ইহাদিগকে কারামুক্তির কথা বলিলে শুনিবে কেন? ইহারা ত বলিবেই "আমরা বেশ আছি। সময় মত খাওয়া পরা পাইতেছি। বেশ অট্টালিকায় বাস করিতেছি, ইহা ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব? আবার কোথায় গিয়া আহার অন্বেষণ ও গৃহনির্ম্মাণাদি করিব?" এ অবস্থায় ইহাদিগের জন্য উপায়ান্তর উদ্ভাবন না করিলে চলিবে না। ইহাদিগকে ভালবাসা না দিলে—ইহারা যতটা সুখ অনুভব করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ দেখাইতে না পারিলে মোহকারাগার ছাড়িবে কেন? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করতঃ জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, "জীবগণ! তোমরা ভাবিয়া দেখ দেখি, কুসুমসুকোমল-তনু, মনোহরকান্তি, বাৎসল্যমূর্ত্তিমতী অসহায়া শচীদেবীর বক্ষোনিধি শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ আমার কাহাদের জন্য বৃক্ষতলবাসী হইলেন? কাহাদের জন্য সতীকুলশিরোমণি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে চিরবিরহসাগরে ভাসাইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন? কাহাদের জন্য নদীয়ার চাঁদ নবদ্বীপ আঁধার করিয়া আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম বিতরণ করিতেছেন? ইহা অপেক্ষা জগতে আর স্নেহভালবাসার পরিচয় আর কি হইতে পারে? ভাইসকল! ভাবিয়া দেখ, যেজন অবিচারে তোমাদিগকে এত ভাল বাসিলেন—তোমাদের জন্য সর্ব্বস্ব

নিজসুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী সাজিলেন, তোমরা কিন্তু তাঁহাকে একবারও ভালবাসার চোখে দেখিলে না—একদিনের জন্যও আদরযত্ন করিলে না—একমুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সেই অহৈতুকী করুণার কথা ভাবিলে না! তোমাদের সেই স্বার্থপূর্ণ নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া থাকিতেই প্রবৃত্তি রহিয়া গেল। মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে খাইতে জীবন বহিয়া গেল। এত করুণা-বিস্তারেও যদি তোমাদের চৈতন্য হইল না—চোখ ফুটিল না—দুঃখ ঘুচিল না, তবে তোমাদের আর উপায় কি? এমন দয়াল অবতার আর কোনও যুগে হয় নাই বা হইবে না। ভাই! তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা যেমন আছ, তেমনি থাক; কেবল দিনান্তে বা নিশান্তে একবার 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাক; তোমাদের কোনই অভাব থাকিবে না—প্রেমধনে ধনী হইবে। এমন কি, চিরদিনের জন্য আমি তোমাদের নিকট বিনামূল্যে বাঁধা থাকিব। এই অবস্থাতেই নিতাই বলিয়াছিলেন:—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে॥"

এখন বুঝিলে? নামসংকীর্ত্তন ভিন্ন কলিকালে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই।

প্যারী। নামসংকীর্ত্তন যে আমাদের পরম উপায়, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। কারণ নিতাই বলিতেছেন—"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম॥" আবার গৌরাঙ্গদেব বলিতেছেন—"হরে কৃষ্ণ বল" আমরা এখন কাহার কথা শুনিব?

বাবাজী। তুমি বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরেকৃষ্ণ বল" আবার অন্যত্র নিতাই বলিয়াছেন,—"জনম ধরিয়া হেলায় শ্রদ্ধায় যে লয় নিতাইএর নাম। আমি বিকাই তারে দেখাই যুগল রাধাশ্যাম॥"

আবার গুরুদেব বলিলেন—"নিতাই গৌর ভজ।" বল, তুমি কাহার কথা অবজ্ঞা করিবে?

প্যারী। আজ্ঞে, আমি যে মহাসন্দেহের মধ্যে পড়িলাম। আপনি কৃপা করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

বাবাজী। ইহার মধ্যে কোন বাক্যই পরিত্যাজ্য নহে। ইঁহাদের কাহারই বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। তবে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুবাক্য পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গুরুবাক্য পালন করিলেই সকলের বাক্য পালন করা হইল। শ্রীগুরু-দেব বলিয়াছেন—"ভজ নিতাই গৌর, পাবে রাধাশ্যাম।" অবলম্বন কি? "হরেকৃষ্ণ হরে রাম।" ভাবিয়া দেখ, শ্রীগুরুর কৃপায় নিতাইকে আশ্রয় না করিলে গৌরাঙ্গ পাওয়া যায় না। কাজেই নিতাই আশ্রয়, গৌরাঙ্গ বিষয়। নিতাইএর কৃপাতে যেমন গৌরাঙ্গ পাইলাম, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ আদেশ করিলেন, ভজ রাধেশ্যাম; উপায়—জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম। আরও দেখ, স্বাভাবিক জগতে তোমাকে যদি কোন লোক সামান্য উপকার করে বা কিছু দেয়, তুমি আজীবন তাহার প্রশংসা করিয়া থাক। আর যাঁহার কৃপায় গোলকের গোপনীয় চির-অনর্পিত ধন অনায়াসে লাভ করিলে, আগে তাঁহাকে না ভজিয়া তাঁহার গুণ-গান না করিয়া কাহার গুণ গাইবে? গাইতে গেলেও নেমকহারামী হয় না কি? অতএব সর্ব্বাগ্রে নিতাই গৌর ভজ, কোনও অভাব থাকিবে না—মনের সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।

প্যারী। প্রভো! এতক্ষণে আমার সন্দেহ দূর হইল। আর একটী কথা—শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু নাম রহিয়াছে। উহার মধ্যে কোনও তারতম্য আছে কি?

বাবাজী। নাম নামী অভিন্ন; নামীর যখন তারতম্য রহিয়াছে,

তখন নামের তারতম্য আছে বৈ কি? বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীপতি বলিলে যাঁহাকে বুঝাইবে, ব্রজনাথ গোপীবল্লভ বলিলে তাঁহাকে বুঝাইবে কি? মদগর্ব্বিত দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ সময় দ্রৌপদী অতি ব্যাকুলভাবে "হা দ্বারকানাথ! হা রুক্মিণীবল্লভ! হা বৈকুণ্ঠনায়ক! হে কালীয়-নিসূদন কৃষ্ণ! এই ঘোর বিপদে রক্ষা কর।" বলিয়া যতই ডাকিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ ততই সেই স্থান হইতে হস্তিনায় যাইবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন না দেখিয়া দ্রৌপদী ব্যাকুলপ্রাণে করযোড়ে "হা হৃদয়নাথ! হা প্রাণ-বল্লভ! হে পাণ্ডবের সখা! হে দ্রৌপদীর প্রাণসর্ব্বস্ব! একবার আসিয়া দাসীর দশা দেখ।" বলিতে না বলিতে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "ভয় কি সখি! এই যে আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি। কার সাধ্য তোমার অপমান করে?" বলিয়া বস্ত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। তখন দ্রৌপদী বলিলেন,—"কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বদা বলিয়া থাক, বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিলেই আমি উপস্থিত হইব।" কিন্তু আজ এমন ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে কতই ডাকিলাম; তুমি এমনি নিষ্ঠুর যে, দেখা দিতে এত বিলম্ব করিলে।" কৃষ্ণ বলিলেন,"দেখ দ্রৌপদি! আমি ত বিলম্ব করি নাই। তুমি আমাকে যখন যেখানে পাঠাইয়াছ আমি সেইখান হইতেই আসিবার উপায় চেষ্টা করিতেছিলাম। আর যেমন তুমি 'প্রাণবল্লভ, হৃদয়নাথ!' বলিয়া ডাকিয়াছ অমনি আমি তোমার কাছেই রহিয়াছি। তোমার কথাত আর আমি অবহেলা করিতে পারি না। তুমি আমাকে দ্বারকানাথ বলিয়াছ, আমি তখন দ্বারকাপুরে। তুমি বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া ডাকিয়াছ, আমি তখন বৈকুণ্ঠে রহিয়াছি।"

তবেই দেখ নামের তারতম্য আছে কি না।

প্যারী। যদি তাহাই হইল। তবে এরূপ বহু নামের প্রচার করিয়া জীবের উপাসনার ব্যাঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

বাবাজী। বাবা! "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" সকলের রুচি একরূপ নহে; তাই বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন ধাম এবং বিভিন্ন রূপ হইয়াছে। মোট কথা লক্ষ্য স্থির করিয়া ডাকিতে পারিলেই লক্ষিত অভীষ্টদেব সন্নিকটবর্ত্তী হইবেন, কোন সন্দেহ নাই।

প্যারী। লক্ষ্য স্থির হইবার উপায় কি ?

বাবাজী। একমাত্র প্রেমানুরাগ।

প্যারী। প্রেম জন্মিবার উপায় কি ?

বাবাজী। প্রেম নিত্যসিদ্ধ জিনিষ; সাধনাদির দ্বারা কখনও সাধ্য নহে। তবে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রকাশ পায় মাত্র। মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্য শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

আরও বলিয়াছেন,—

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপরামরায়॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ—উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারেও পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

এই উপজয় শব্দের অর্থ প্রকাশ পাওয়া।

প্যারী। মনুষ্যজন্মই যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করা কপটতা নয় কি? কারণ বাহিরে যতই নীচতা দেখান যাক্ না কেন, অন্তরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকে নাকি?

বাবাজী। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, লতা অপেক্ষা মনুষ্য কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে; কারণ বৃক্ষাদিও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট; মানবও তাই। বৃক্ষ জীবিত অবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে অপর প্রাণীর আশ্রয়দাতা, পত্র পুষ্প ফলাদি দ্বারা পোষণকারী, নিজদেহপুষ্টি বা উদরভরনের জন্য অপরের নিকট প্রার্থী নহে, পরের অনিষ্টচেষ্টা কাহাকে বলে, সে জানে না। আর মনুষ্য কোন প্রাণীকে আশ্রয় প্রদান বা পোষণ করিলেও তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে। এমন কি নিজের স্ত্রীপুত্রাদির পালন পোষণের মধ্যেও স্বার্থপরতা আছে। মানব নিজদেহপুষ্টি বা উদরপূরণের জ অপর প্রাণীর প্রাণবধটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এমন কি দশ বিশজন মিলিয়া ঢাকে ঢোলে উৎসব আনন্দের সহিত নিরীহ প্রাণীদিগের প্রাণবধ করিয়া থাকে। মৎস্যাদির প্রাণ ত প্রাণই নয়। বড় বড়

মৎস্যাদি ছেদনসময় হৃদয় যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং ছেদন-কারীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করা হয়। মানুষের অত বড় দেহে অসংখ্য রোমকূপ; তাহার একটী রোমকূপের মধ্যস্থ এক বিন্দু জলীয় রক্ত পানেচ্ছু মশকটী যেমন দৃষ্টিগোচর হইল, অমনি তাহার প্রাণবধ। এখন ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ না বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ? তৎপর মানবদেহখানি এত আদরের যে, দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও আরাম পাওয়া যাইতেছে না। কত সুগন্ধি এসেন্স গোলাপজল প্রভৃতি ব্যবহার করা হইতেছে। বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর রক্ত-মাংসে পরিপুষ্ট এই শরীর হইতে যেমন প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হয়, অমনি পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাইভগিনী, আত্মীয়স্বজন সকলেই কি করিয়া বাহির করা হইবে বলিয়া শশব্যস্ত। বাহির করিয়াও কি নিশ্চিন্ত? গোময় দ্বারা সে স্থান উপস্কার, হোমযজ্ঞাদি দ্বারা দোষাপ-নোদন, জাত্যনুসারে দশ পনের দিন বা একমাস কাল অশৌচ ভোগ করা হয়। মৃত শব যে স্থানে প্রোথিত বা দাহ করা হয়, সে স্থানের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে গঙ্গাস্নান প্রশস্ত। এই ত তোমার মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব। আর বৃক্ষের মৃতদেহ উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পড়িলে রথ, সিংহাসন, চতুর্দ্দোলা, খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, দরজা, জানালা ইত্যাদি কার্য্যে লাগিয়া অবশিষ্ট অংশ দ্বারা মনুষ্যদেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী খাদ্যদ্রব্য রন্ধনের সাহায্য হইয়া থাকে। এমন কি ঐ বৃক্ষের মৃতদেহ না হইলে মনুষ্যের মৃতদেহ সৎকার পর্য্যন্ত হইতে পারে না। এ ত গেল স্থাবর দেহের কথা, এখন জঙ্গম দেহের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা যদি কোথাও একটুকু খাদ্যদ্রব্য পায়, অমনি অতি দ্রুতবেগে নিজের স্বজাতিবর্গকে ডাকিয়া সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করে। মনুষ্য যদি কোথাও কোন ভাল দ্রব্য পায়, তবে কেহ দেখিবে মনে

করিয়া সশঙ্কিতভাবে অতিসন্তর্পণে উহা ঘরে লইয়া যায়। এমন কি নিজভ্রাতৃবর্গকে পর্য্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ আইসে। এই ত মনুষ্যজাতির উচ্চতা। আবার ক্ষমতা দেখ, তুমি কোনও বস্তু বহু আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ; পিপীলিকা নিজবুদ্ধি-কৌশলে ঠিক্ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। আর তুমি হয়ত ভুলক্রমে নানাস্থানে খুঁজিয়া হয়রান হইতেছ; এমন কি খুঁজিবার জন্য অপরের সাহায্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছ। তবে দেখ পিপীলিকা বড় কি মনুষ্য বড়? পশুপক্ষী প্রভৃতির মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ম্যাথরের দরকার হয় না—স্পর্শ করিলেও কেহ অপবিত্র হয় না। গরুর মলমূত্র পবিত্রকারী; কিন্তু মনুষ্যের মলমূত্র স্পর্শ ত দূরের কথা; যে পরিষ্কার করে, সেই জাতিকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, মনুষ্য বড় কি পশুপক্ষী বড়।

প্যারী। এতদিনে আমার মনের ভ্রম দূর হইল—এতদিনে আমি তৃণাদপি শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলাম—এতদিনে মনুষ্যজাতি যে সর্ব্বপ্রকারে হীন, এইটী আমার ধারণা হইল।

বাবাজী। মনুষ্যজাতির নিকৃষ্টতার কথা আর কত বলিব? দেখ গো, মহিষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল কুক্কুরাদি নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত সর্ব্বদা নির্ব্বিকারচিত্তে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বসবাস এবং শয়নভোজনাদি করিয়া থাকে। আর মনুষ্য জাতির স্থান, অস্থান, সময়, অসময়, ধর্ম্মাধর্ম্ম এমন কি সম্বন্ধ বিচার পর্য্যন্ত নাই; স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিলেই পুরুষ কামাতুর, পুরুষ-মূর্ত্তি দেখিলেই স্ত্রী কামাতুরা। অধিক কি বলিব? অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রত্যেক বিষয়েই মনুষ্যজাতির নিকৃষ্টতা ভিন্ন উৎকৃষ্টতার প্রমাণ পাওয়া দুরূহ। তবে ভগবৎনাম, রূপ, গুণাদি অবলম্বনে ভগবৎ-আরাধনা করিলেই ভগবৎকৃপার ভাজন বলিয়া সেই মনুষ্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতা

লাভ করিয়া থাকে। জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে আমি হীন এইটী যাহার ধারণা হইয়াছে, সেই মনুষ্যপদবাচ্য। শাস্ত্রাদিতেও সেই মনুষ্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদনুগ্রহের পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নীতি-শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

যে মনুষ্য মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া ভগবদারাধনা না করে, তাহাকে শাস্ত্রকার আত্মঘাতী বলিয়াছেন। যথা—

"নৃদেহমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
মায়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

প্যারী। আজ্ঞে, আপনি বলিলেন, "ভক্তই ভগবানের অনুগ্রহ-পাত্র।" তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ন্তা; তাঁহার কি নিগ্রহের পাত্র কেহ আছে? যদি ভগবানেরই নিগ্রহানুগ্রহের পাত্র থাকে, তবে তাঁহাতে বৈষম্য দোষ ঘটিল না কি? তিনি জগতের মাতাপিতা; সন্তান অযোগ্যই হউক, আর যোগ্যই হউক, রূপবান্ বা কুরূপই হউক, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিকই হউক, পিতামাতার স্নেহভালবাসার কি তারতম্য হইয়া থাকে?

বাবাজী। ভগবানে কখনই বৈষম্য দোষ থাকিতে পারে না। তবে যে বৈষম্য দেখা যায়, সেটী ভগবানের নয়; তত্তৎপাত্রবিশেষের গুণদোষমাত্র। এ বিষয়ে সামান্য একটী দৃষ্টান্ত শুন—একদিন বেলা

দ্বিতীয় প্রহরের সময় একটী পাহাড়ের উপর উঠিলাম। ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপ। একটু ছায়া অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিলাম, একটী সমতল স্থানে দুইখানি প্রস্তর রহিয়াছে। এক একখানি অনুমান একহস্ত পরিমিত। ঠিক এক আকার—একবর্ণ। অনেক অনুসন্ধানেও উভয়ের কোন পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। কেবলমাত্র দেখিলাম, একখানি প্রস্তর হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। শুষ্কতৃণ, লতাপাতা উহার উপর পতিত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠিতেছে। তৎপার্শ্বস্থ প্রস্তর-খানি হইতে ঘর্ম্মবিন্দু বাহির হইতেছে। উহাতে হাত দিয়া দেখিলাম, অতি সুশীতল। তখন জনৈক সাধুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কিরকম ব্যাপার? একস্থানে এক অবস্থাপন্ন এক জাতীয় দুইটী বস্তুর ক্রিয়ার পার্থক্য কেন? ঐ প্রস্তরখানায় কি সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় নাই?' তিনি বলিলেন,—"বাবা! সূর্য্যের উত্তাপ সর্ব্বত্রই সমান। ঐ খানা সূর্য্যকান্তমণি; উহাতে অতি যৎসামান্য সূর্য্যের কিরণ পড়িবামাত্রই অগ্নি বাহির হইয়া থাকে। আর এইখানা চন্দ্রকান্তমণি; ইহাতে যতই সূর্য্যের কিরণ পতিত হউক না কেন, ততই শীতল, স্নিগ্ধ ও ঘর্ম্মাক্ত হইবে। আরও দেখ, একটী পুষ্করিণীতে দুইটী ফুল ফুটিয়াছে। একটী কমল, একটী কুমুদ। প্রভাত হইবামাত্র সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে না হইতেই কমলটি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। এমন কি সূর্য্যের কিরণ যতই প্রখর হইতে লাগিল, কমলটীর শোভাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অভাগিনী কুমুদিনী প্রভাত হইতে না হইতেই পতি-বিরহিণী পত্নীর ন্যায় ম্লানমুখে অধোমুখী হইতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যদেব যতই উগ্রভাব ধারণ করিতে লাগিলেন, কুমুদিনীও ততই মলিন হইতে লাগিল। এই সকল স্থানে তুমি কি সূর্য্যের বৈষম্য বলিতে চাও? ভগবানের কৃপাও এইরূপ সর্ব্বত্র সমান, কিন্তু গ্রহণের তারতম্য

অনুসারে ফলাফলের তারতম্য দেখা যায়। যেমন পিতা এক স্কুলে দুইটী ছেলেকে পড়িতে দিয়াছেন। একটী পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল, অপরটী ফেল হইল। ক্লাসে গিয়া একটী মনোযোগপূর্ব্বক পড়াশুনা করে; কাজেই সে পাশ হইল। আর একটী খেলা বা অসৎচিন্তা করিয়া থাকে; কাজেই সে ফেল হইল। ইহাতে কি পিতামাতার দোষ বলিবে? ভক্ত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া কাতরপ্রাণে কৃপাপ্রার্থনা করিতেছে; ভগবান্‌ও শক্তিসঞ্চার করিতেছেন। অভক্ত তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং অভিমানে আপনাকেই ঈশ্বর মনে করিয়া বিপদে পতিত হইতেছে। ভগবানের দোষ কি বাবা? ভগবান্ ত আর তাহাকে কুপথে যাইতে আদেশ করেন নাই; বরং জীব কুপথে গমনোদ্যত হইলে ভগবান্ নানাপ্রকারে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্যারী। আচ্ছা, আমাদের প্রতি ভগবানের যখন এতই দয়া, তখন অনিষ্টকারী কামক্রোধাদির সৃষ্টি না করিলেই ত হইত? তিনি অতি সুন্দর একটী পাত্রে হলাহল বিষ রাখিয়া দিয়াছেন। জীব লোভপরবশ; কাজেই উহা পান করিতেছে। এইরূপ করা কি ভগবানের অন্যায় নহে?

বাবাজী। এটী তোমার সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাস। পরম মঙ্গলময় ভগবান্ ইহজগতে যে সকল দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, তাহার একটীও আমাদের অনিষ্টকারী নহে। একজনের গৃহ দাহ হইয়া গেল—একটী মাত্র পুত্র এবং বড়ই আদরের পত্নী ঐ সঙ্গে জীবনত্যাগ করিল। সেই ব্যক্তি অতিশয় ব্যাকুল ভাবে ভগবান্‌কে বলিতেছে, "হে প্রভু! তুমি যদি অগ্নি সৃষ্টি না করিতে, তবে আজ আমাকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইত না। অগ্নিসৃষ্টি তোমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে!" আবার অন্যত্র একজনের একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অথবা বরফ পড়িয়া

হস্তপদ সব আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই সময় একজন একটু অগ্নির উত্তাপ দিবামাত্র সে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছে, "হে প্রভো! তোমার কি অপার করুণা! যদি অগ্নিসৃষ্টি না করিতে, তবে ত আজ এই শিশুটীর জীবন রক্ষা করা যাইত না। বল, অগ্নির দোষ বলিবে কি গুণ বলিবে? একব্যক্তি একটী ডাক্তারখানায় গমন পূর্ব্বক ঔষধের আলমারী খুলিয়া দেখিল যে, একটী শিশিতে "বিষ" লেখা আছে। ডাক্তারবাবু তাহাকে বলিলেন, "সাবধান! ঐ শিশিটীতে হাত দিবেন না; কারণ উহার সংস্পর্শে প্রাণনাশ হইতে পারে।" তখন সে অতি বিরক্তির সহিত ডাক্তার বাবুকে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! আপনাদের এটা বড় অন্যায়। আপনারা লোকের উপকারের জন্য ডাক্তার হইয়াছেন; অনিষ্টকারী পদার্থ রাখার দরকার কি?" ডাক্তার বাবুটী কোনই উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল পরে একটী রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক আসিল। রোগীটীর সান্নিপাতিক বিকার—নাড়ী স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, "মহাশয়! ঐ বিষের শিশিটী লইয়া একবার আমার সঙ্গে চলুনত।" সে ব্যক্তিও ডাক্তার বাবুর কথামত বিষের শিশিটী লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। রোগীর নিকট পৌঁছিয়াই ডাক্তারবাবু তাহাকে বলিলেন, "ঐ শিশি হইতে ছয় ফোঁটা একটু জলের সঙ্গে রোগীকে খাওয়াইয়া দিন।" সে প্রথমে মনে করিল যে, ইহার অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ার দরুণ বোধ হয় ডাক্তারবাবু বিষপ্রয়োগে প্রাণনাশ করিয়া ইহাকে কষ্টের হাত হইতে মুক্ত করিতে বাসনা করিয়াছেন। ডাক্তার বাবু বিশেষ জেদ করায় তিনি ছয় ফোঁটা বিষ রোগীকে দিলে অনুমান দুই মিনিটের মধ্যেই রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে আর একবার ঐরূপ ছয় ফোঁটা খাওয়াইলে রোগী সুস্থ হইল। তখন ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মহাশয়!

কেন বিষ রাখিয়াছি, এখন বুঝিলেন ত ? অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিষও অমৃত হইয়া থাকে। প্রাণবিনাশকারী পদার্থও প্রাণদাতা হইয়া থাকে। আবার ব্যবহারদোষে অমৃতও বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।" তাই বলি, আগে শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করিয়া মহাজনগণের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে শিখ। দেখিবে ঐ কাম ক্রোধেই তোমার হিতসাধন করিবে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা" ইত্যাদি। সৎসঙ্গে যদি তোমার লোভ হইল, তবে লোভেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়তা করিল। লোভই যখন একমাত্র প্রাপ্তির উপায়, তখন লোভসৃজনকারী ভগবানের দোষ কি হইল ? শাস্ত্র বলিয়াছেন, "কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র মূল্যমেব লৌল্যমেকলং, জন্মকোটিসুকৃতৈর্নলভ্যতে ॥"

প্যারী। আচ্ছা, এই লোভ জন্মাইবার উপায় কি ?

বাবাজী। আর্য্যগণ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, একমাত্র সাধুগুরু-করুণা ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি থাকিলেও লোভোৎপত্তি হইবার সম্ভব নাই।

প্যারী। সাধু অসাধু কি করিয়া চেনা যাইবে ? আমরা অজ্ঞজীব; আজ একজনকে অসাধু বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিলাম; কাল দেখি তিনি মহাপুরুষ হইয়াছেন। তবে বুঝিবার উপায় কি এবং কিরূপভাবে সাধুসঙ্গ করিলে অভীষ্ট ফল লাভ হইতে পারে ?

বাবাজী। দ্রষ্টা নিজে ব্যতীত জগতের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তুই সাধু শব্দবাচ্য। চোরকেও যদি তুমি সাধুবুদ্ধি করিতে পার, তোমার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে। আচরণে সাধু অসাধু চেনা যায় না। "গর্হিত আচরণ করেন যদি মহা অধিকারী। নিন্দার আছুক দায় হাসিলেও মরি ॥" তুমি

মায়ামুগ্ধ জীব ; সাধু পরীক্ষা করার কষ্টী পাথর হইতে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ ভুল বই আর কিছুই নহে। জগৎকে অবিচারে সাধুবুদ্ধি করিয়া অদোষদরশী হওতঃ নিজে ভক্তি যাজন কর, উন্নতি হইবে—অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে। এ বিষয়ে একটী গল্প শুন—একরাজা বড়ই বৈষ্ণবসেবী ছিলেন। বৈষ্ণবগণ যেরূপভাবেই সেবা অভিলাষ করিতেন, রাজা অবিচারে তাহা সম্পন্ন করিতেন। রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে চারিজন দস্যু বৈষ্ণববেশে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট অন্তঃপুরে রাণীর হস্তে সেবা প্রার্থনা করিল। মহারাজ অবিচারে বৈষ্ণবগণকে রাণীর নিকট প্রেরণ করিলেন। বৈষ্ণবগণ ভোজনাদি করিয়া শয়ন করিবার পর রাণী যেমন চরণসেবা করিতে গিয়াছেন, অমনি চারিজনে মিলিয়া রাণীর প্রাণবধ করতঃ যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কারাদি আত্মসাৎ পূর্ব্বক রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পরিচারিকাগণ রাণীর প্রাণবধ এবং অলঙ্কারাদির অপহরণ-বার্ত্তা রাজাকে শুনাইবামাত্র রাজা বলিলেন, "পাপীয়সী নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-চরণে কোনও অপরাধ করিয়াছে। তাহা না হইলে কখনই এরূপ অবস্থা ঘটিত না। না জানি সুখময় বৈষ্ণবঠাকুরদিগের কতই না সেবার ত্রুটি হইয়াছে ; নতুবা তাঁহারা এরূপভাবে চলিয়া যাইবেন কেন? অতি যৎসামান্য বস্তু চারিভাগ করিলে এক একজনের আর কতই বা প্রাপ্তি হইবে?" এই বলিয়া মহারাজ প্রচুর অর্থসহ চারিজন লোক উক্ত বৈষ্ণববেশধারী দস্যুদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং উহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, 'যদি তাঁহারা একান্ত না আসেন, তবে তাঁহাদের চরণে রাণীর অপরাধ ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া একটু চরণামৃত লইয়া আসিবে।' ভৃত্যগণ দ্রুতবেগে বৈষ্ণগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে বৈষ্ণববেশী দস্যুগণ পশ্চাৎ ধাবিত

রাজঅনুচরগণকে দেখিয়া নিজ নিজ প্রাণবিনাশ-আশঙ্কায় দ্রুতগতি ধাবিত হইতে লাগিল। রাজভৃত্যগণ দূর হইতে অভয় প্রদান করিতে করিতে উহাদের নিকট যাইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করতঃ রাজদত্ত অর্থসকল অর্পণপূর্ব্বক রাণীর অপরাধ ক্ষমাভিক্ষা এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন প্রার্থনা জানাইলেন। বৈষ্ণববেশী দস্যুগণের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল এবং উক্ত ভৃত্যগণসঙ্গে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র রাজা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক উহা-দিগকে অন্তঃপুরে রাণীর নিকট লইয়া গেলেন এবং চারিজনের চরণ ধৌত করিয়া সেই চরণামৃত যেমন রাণীর মুখে এবং সর্ব্বাঙ্গে দিলেন, অমনি রাণীনিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। বল, দস্যুগণের চরণের গুণ, কি রাজার বিশ্বাসের গুণ? তাই বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর।" তুমি বিশ্বাস কর ফল পাইবে। তবে স্বজাতীয় সাধুসঙ্গ করা দরকার।

প্যারী। স্বজাতীয় কি বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। একভাব, এক বিষয় এবং এক আশয় হইলে তাঁহাকেই স্বজাতীয় বলা হয়। অর্থাৎ আমার প্রাণটী যে ভাবে যে-অবস্থায় যে-স্থানে যাঁহাকে চায়, যিনি ঠিক সেইভাবে সেই অবস্থায় সেই স্থানে তাঁহাকে চাহিবেন, তিনিই স্বজাতি। তাঁহারি সঙ্গ করা দরকার। ধর, একটী ষ্টেশনে শত শত লোক টিকিট করিতে গিয়াছে। প্রত্যেকেই এক গাড়ীতে উঠিবে এবং একদিকে যাইবে; কিন্তু কেহ কটক, কেহ কলিকাতা, কেহ নবদ্বীপ, কেহ বৃন্দাবন, কেহ কেহ কাশী, গয়া, প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানের টিকিট করিল। তাহার মধ্যে আবার কেহ প্রথম শ্রেণীর, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর, কেহ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করিল। তুমি কাহার সঙ্গ করিবে? কে তোমার স্বজাতি? যিনি তোমার গন্তব্য

স্থানের এবং তোমার শ্রেণীর টিকিট করিয়াছেন, তিনি হিন্দুই হউন, মুসলমানই হউন আর খ্রীষ্টানই হউন, তিনিই তোমার স্বজাতি এবং তাঁহারই সঙ্গ করা তোমার কর্ত্তব্য। এমন কি গন্তব্য স্থান অপরিচিত হইলেও সেই সঙ্গবলে তোমার প্রাণে দ্বিগুণতর সাহস হইবে। তোমার সহোদর. ভ্রাতাভগিনী বা মাতাপিতা যিনিই তোমার সহিত একভাবাপন্ন না হইবেন, তিনিই তোমার বিজাতি। তাঁহার সঙ্গ করিলে তোমার ভাবের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইবার আশা নাই। কারণ দেখ—একই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের উপাসক দাসগণ ও সখাগণ। দাসগণ করযোড়ে স্তব করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা—কৃষ্ণ আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আর সখাগণ কৃষ্ণকে বলিতেছেন, হ্যাঁরে কানাই! তুইকি নিতুই নিতুই এত বেলা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকিবি, আর আমরা আসিয়া তোকে ডাকিব? আজ মাঠে চল্ তোকে খেলায় হারাইয়া সকলে তোর কাঁধে চড়িব। শ্রীদাম বলিতেছে "তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম।" বল, সখাদের কথায় দাসগণের মনে গ্লানি আসিবে নাকি? একের উপাসক হইলেও উহারা পরস্পর পরস্পরের বিজাতি। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "আন কথা না কহিবে, আন কথা না শুনিবে, সকলই কহিবে পরমার্থ।" রসান্তরকথাও এই আন কথার মধ্যে পড়িয়া গেল।

প্যারী। আজ্ঞে, যদি এরূপ স্বজাতি সাধু না পাওয়া যায়, তবে কি করা উচিত?

বাবাজী।√ সাধু অর্থ যে কেবল মানুষ, তাহা নহে—শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি এবং নামকেও বুঝায়। ইহার মধ্যে কোন না কোন সঙ্গ অবশ্যই মিলিবে। এই চতুর্বিধ সাধুর প্রত্যেকের মধ্যেই স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় আছে। নিজ অভীষ্ট রস-প্রতিপাদক শাস্ত্রই স্বজাতীয় শাস্ত্র এবং উহাই সর্ব্বদা আলোচ্য। নিজ ভাবরসোদ্দীপক শ্রীমূর্ত্তিই স্বজাতীয় মূর্ত্তি এবং উহাই

সর্ব্বদা সেব্য ও দ্রষ্টব্য। নিজ অভিষ্ট ভাব, রস ও সম্বন্ধবাচক নামই স্বজাতীয় নাম এবং উহাই সর্ব্বদা শ্রোতব্য ও কীর্ত্তিতব্য। এইরূপ সঙ্গপ্রভাবেই জীবের নিজস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং জীবে ও কৃষ্ণে সম্বন্ধ জাগিয়া উঠে।

প্যারী। জীবের নিজস্বরূপ কি, বুঝিতে পারিলাম না; কারণ জীবগণ যে যে অবয়ববিশিষ্ট তত্তৎস্বরূপ ত প্রকাশমানই রহিয়াছে। আবার প্রকৃত স্বরূপপ্রকাশ কি?

বাবাজী। জীবগণ প্রাকৃত তত্ত্ব কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া যেরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হউক না কেন এবং সেই স্বভাবানুযায়ী যেরূপ আকৃতিই লাভ করুক না কেন, সেই স্বভাব—সেই আকৃতি সকলই নশ্বর। পরন্তু জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস। এই স্বরূপ নিত্য, অবিনাশী এবং চিন্ময়। ইহাকেই বলা হয় প্রকৃত স্বরূপ।

প্যারী। জীবেতে এবং ভগবানেতে ভেদ কি? বেদান্ত শাস্ত্র বলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি; তত্ত্বমসি।" আবার তন্ত্র বলিয়াছেন "শিবোঽহম্"। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বলিয়াছেন, "দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ।" আবার পূজাপ্রণালীতে আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন "দেবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা সোঽহমিতি বিচিন্ত্য পুনর্ধ্যায়েৎ ইত্যাদি।" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা জীবে এবং ভগবানে অভিন্নত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে; কেবল ভক্তি-শাস্ত্রেই বলিয়া থাকেন, "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।" বিষয়টি আমাকে একটু বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বাবাজী। ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত এবং ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একই। উভয়েরই অভিপ্রায় এক। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ।" অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকাশক্তি উভয়ের পরস্পর ভেদ থাকিলেও অভেদ।

অগ্নি হইতে দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করা মনুষ্যশক্তির অতীত; তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ।' জীব এবং ভগবানে তত্ত্বতঃ অভেদ হইলেও লীলা বিস্তার হেতু ভগবান্ প্রকাশে ভেদ স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অগ্নি এবং দাহিকা শক্তির ভেদ করা যত কঠিন, ভগবান্ এবং জীবের ভেদ করা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ। মোট কথা তৎসত্বে তৎসত্তা, তদসত্বে তৎসত্তা। অর্থাৎ ভগবৎ সত্তায় জীবের সত্তা; জীবের অসত্বেও ভবগৎসত্তা বর্ত্তমান থাকে। প্রাকৃত শক্তি শক্তিমানের সহিত অপ্রাকৃত শক্তি শক্তিমান্ জীব ও ভগবানে এইটুকু পার্থক্য।

প্যারী। ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ জাগাইবার উপায় কি?

বাবাজী। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জাগাইবার জন্যই সংসারক্ষেত্র। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটী রস সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বদার তরে বর্ত্তমান। সম্বন্ধই সংসারের জীবন; সম্বন্ধ না থাকিলে সংসার থাকে না। মানব সাংসারিক সম্বন্ধসুখ উপভোগ করিতে গিয়া যখন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় দ্বারা নানাবিধ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, তখন বিবেকবলে সাংসারিক সম্বন্ধসুখের ইতরতা নির্দ্ধাণপূর্ব্বক প্রকৃত সম্বন্ধ তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া থাকে। এই অকপট ব্যাকুলতাবশতঃই জীবের সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই তত্ত্বজ্ঞান জীবকে ভগবদুন্মুখ করায়। ভগবদুন্মুখী জীব ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণের আবেগে শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করে। গুরুদেব কৃপা করিয়া জীবের হৃদয়ে ভগবৎসম্বন্ধ জাগাইয়া দেন। তখন জীব ভগবানের সহিত নিজের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক প্রাণে প্রাণে ভগবান্‌কে ভালবাসে। ভালবাসার প্রাণ সেবাভিন্ন অন্য কিছুই চায় না। সেবাই ভালবাসার জীবন। সেবা ভিন্ন ভালবাসা বাঁচে না। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত এই সেবা দুই প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম প্রকার—প্রাকৃত জগতের অবিবাহিতা কিশোরীর স্বামিসেবাবিষয়ক মানসিক চিন্তার ন্যায় সাধকের প্রীতিযোগে ভগবদ্‌বিষয়ক মানসিক সেবা। এই স্মরণ মননটী বড়ই মধুর ও আনন্দপ্রদ। এই মানসিক সেবায় সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকিবেন, ততই ইতরবিষয়ক আসক্তির হ্রাস হইয়া ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ হইবে। দ্বিতীয়—শ্রীমূর্ত্তিরূপে ভগবৎ-সেবা; অর্থাৎ নিজ অভীষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে নিত্যত্ব আরোপ করতঃ কায়মনোবাক্যে অষ্টকাল সেবা। এই পন্থাটী বড়ই সুগম ও প্রীতিপ্রদ। কারণ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ সকলেই স্বীয় স্বীয় বহির্ম্মুখ ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখীন হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবার আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপ সেবায় সাধক অতি অল্পায়াসেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি প্রাকৃত রাজ্যে যথাবস্থিত দেহে অবস্থিতি করিলেও অপ্রাকৃত, নিত্য, সচ্চিদানন্দময় নিজ অভীষ্ট-দেবের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ ব্যবহারাদি করিতে সমর্থ হন।

প্যারী। আপনার কথায় বুঝিলাম, গুরুকৃপাই সকলের মূল। কিন্তু কালপ্রভাবে আজকাল সদ্‌গুরু পাওয়াই কঠিন; কাজেই এই সকল উপাসনা আমাদের পক্ষে আকাশকুসুমবৎ হইয়া পড়িয়াছে।

বাবাজী। বাবা! গুরু শব্দ ভগবদ্বোধক; যেমন সৎ ভগবান্ ও অসৎ ভগবান্ কথাটা অলীক, সেইরূপ গুরুশব্দেও অসৎ শব্দ যোগকরা সম্পূর্ণ ভুল। ব্যবহারিক জগতেও গুরুশব্দে মহৎ বুঝায়; সৎ মহৎ ও অসৎ মহৎ কথাটা কেমন হয় বল দেখি?

প্যারী। আজ্ঞে, গুরুশব্দ ভগবদ্বোধক বলিয়া আমাদের ত ধারণাই হয় না। আধুনিক গুরুগিরি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের ব্যবহার ও উপদেশে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, আমার বিশ্বাস অবনতিই

হইতেছে।

বাবাজী। কেন বাবা! তুমি ত অনেক শাস্ত্রাদি দেখিয়াছ। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" আবার গুরুগীতায় বলিয়াছেন, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।" কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য— "দীক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের সরূপ।" অন্যত্র "গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি।" এই বাক্য অবলম্বন করিয়াই শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

✓ জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হইলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হইলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনে ত্রিসংসারে নাহি আর গতি॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না কর কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরুনিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥

গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥
হেন গুরু-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস॥

বুঝিয়া দেখ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যদি গুরুগোবিন্দ একবস্তুই হইলেন, তবে তাঁহার ক্রিয়াকলাপ লইয়া তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবের সমালোচনা করার অধিকার কি? গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে গুরু যেমনই হউক না কেন, তাঁহা হইতেই শিষ্য অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবে। গুরু গাভী, শিষ্য দোগ্ধা। শিষ্য একাগ্রচিত্তে যতই দোহন করিবে, ততই বাসনানুরূপ ফল পাইবে। শিষ্যের মনোমত না হইলে তাহার ভক্তির পাত্র হইতে পারা যাইবে না ভাবিয়া গুরুদেব যদি সর্ব্বদা শিষ্যের মনরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকেন, তবে গুরুদেবের শিষ্যকেই উপাসনা করা হইল না কি? শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; শিষ্যের সাধ্য কি যে তাঁহার দোষগুণ বিচার করিবে? তুলসীদাসজী বলিয়াছেন, "গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক।" গুরুদেবের আচরণে কপটতা বা প্রবঞ্চকতা প্রভৃতি দেখিয়া হয় ত শিষ্য মনে করিতে পারে যে, গুরুদেবেরই ঐরূপ প্রকৃতি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। শিষ্যের মনোবৃত্তি অনুসারেই গুরুদেবে তত্তৎবস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুরু ফটোযন্ত্র; শিষ্য যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইবে, সেইরূপ ফটো উঠিবে।

প্যারী। প্রায়ই দেখা যায়, গুরুদেব শিষ্যের বাড়িতে গিয়া অর্থাদি এবং ভাল বস্ত্রাদিতে লোভ করিয়া থাকেন। শিষ্য যদিও অতি কষ্টে সে সব অর্পণ করিল; কিন্তু অবশেষে হয়ত তাহার কন্যা বা ভগিনী প্রভৃতিতেই লোভ করিলেন। বলুন দেখি, এইরূপ ব্যবহারে কতক্ষণ লোকের ভক্তি থাকে? কাজে কাজেই গুরু আসিবেন শুনিলে প্রাণ সশঙ্কিত হইয়া উঠে।

বাবাজী। আচ্ছা, তুমি একটা টক-আমের বীজ রোপণ করিয়া ঐ বৃক্ষ হইতে মিষ্ট আম পাইবার আশা করিতে পার কি? যদি মিষ্টি আম খাইবার অভিলাষ থাকে, তবে বীজ রোপণের সময় মিষ্টি আমের বীজ রোপণ করা দরকার। যখন তুমি দীক্ষা গ্রহণ করিতে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে, তখন তাঁহার শ্রীচরণে অকপটচিত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলে কি? গুরুদেবের দর্শনে কৃষ্ণসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলে কি? গুরুদত্ত মন্ত্র প্রাপ্তে তোমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-প্রাপ্তিজনিত সুখ অনুভব করিয়াছিলে কি? আমাদের একটী প্রধান দোষ এই যে, আমরা ব্যাধির উৎপত্তির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করিয়া ব্যাধি যখন খুব প্রবল হইয়া পড়ে, তখন হা হুতাশ করিয়া থাকি। কুলগুরু বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন, কি করা যায়! আর্থিক অবস্থাও তত ভাল নয়, অন্তত একটা টাকা প্রণামী এবং একযোড়া কাপড় ত দিতেই হইবে। তাহার পর আবার পূজার খরচ আছে। যাহা হউক যে কোন প্রকারে হউক মন্ত্রনেওয়া ঝঞ্ঝাটটা মিটাইয়া দেওয়া যাক্। না হইলে আবার গাড়ী করিয়া গুরুদেবকে আনিতে অনেক খরচ। অমনি হয় ত একজন হিতৈষী মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "কেন মহাশয়! কাপড় যোড়া না দিয়া কাপড়ের বাবদ কিছু ধরিয়া দিলেও ত হইতে পারে। প্রণামী টাকাটা এখন নগদ না দিলেই বা কি? গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ত

একদিনের জন্য নহে। যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, চিরদিনই ত দিতে হইবে।" ইত্যাদিভাবে যে গুরুকরণ হয়, তাহার ফলে কি কখন সুফল ফলিতে পারে? প্রথমে আপন আপন অন্তঃকরণের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া পরে গুরুদেবকে সংশোধন করিতে যাওয়া উচিত। গুরুদেব নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ। শিষ্য যেরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তি লইয়া গুরুদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইবে, তাঁহাতে সেইরূপ প্রতিবিম্বই দৃষ্টিগোচর হইবে। ফলকথা— শিষ্য নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুসারেই গুরুদেবের প্রতি দোষ বা গুণ আরোপ করিয়া থাকে।

প্যারী। আচ্ছা! আপনি বলিলেন, "নাম সর্ব্বশক্তিমান্; নাম লইতে দেশ-কাল, শুচি-অশুচি বিচার নাই; লইবামাত্রই প্রেমের উদয় হয়। নাম ও মন্ত্র একই বস্তু।" যে কোনরূপেই হউক, নাম ত আমরা করিয়া থাকি; চিত্তের কপটতা, কুটীনাটী দূর হইল কৈ? প্রেমের সঞ্চারই বা কখন হইবে? আমরা অবিশ্বাসী জীব; কোনও একটা প্রত্যক্ষ ফল না দেখিলে কেবল শাস্ত্রবাক্যে অন্ধ বিশ্বাস করা আমাদের হইয়া উঠে না।

বাবাজী। মনে কর একটী লোক অনেকগুলি কঠিন কঠিন ব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। তাহার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া কেহই বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না; কিন্তু অন্তরে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। অনেক বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ দেখান হইল; কিছুতেই কোন উপকার দর্শিল না। তখন একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন; "দেখ বাবা! আমার নিকট একটী অব্যর্থ মহৌষধ আছে। উহা ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, শরীর পুষ্ট এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে। এমন কি, ব্যাধি বলিয়া কোনও বস্তু তোমার দেহে থাকিবে না।" এই বলিয়া একটী বটিকা তাহাকে খাওয়াইয়া দিলেন। বড়িটী

খাইবামাত্র রোগী বলিয়া উঠিল, "কৈ কবিরাজ মহাশয়! আমার শরীর ত মোটা হইল না! ব্যাধিরই বা উপশম হইল কৈ? কি রকম আপনার ঔষধের গুণ?" কবিরাজ মহাশয় আর কি উত্তর দিবেন? বলিলেন "বাবা! বহুদিনের সঞ্চিত ব্যাধি; নানাবিধ চিকিৎসায় ত বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস পূর্ব্বক অন্ততঃ দুই চারি দিন ঔষধটী ব্যবহার কর—অবশ্য ফল পাইবে।" তাই বলি বাবা! অনাদিকাল হইতে কত কত পাপ, মহাপাপ; অপরাধ, মহা-অপরাধ, কপটতা, কুটিনাটি, প্রবঞ্চকতা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, অভিমান, দম্ভ, অবিশ্বাস, পরছিদ্রান্বেষিতা, দেব-দ্বিজ-গুরু-বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য ব্যাধি সঞ্চিত করিয়াছ; একটীবারমাত্র নাম লইতে না লইতেই প্রেম হইল না কেন এই প্রশ্ন! সেই নামও যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশ্বাসের সহিত লওয়া হইত, তবুও এক কথা। স্বাভাবিক কথায় বুঝিয়া দেখ, বহু বহু দ্রব্যপরিপূর্ণ একখানি গৃহ যদি তোমাকে কেহ পরিষ্কার করিতে বলে, তখন তুমি কি করিবে? বর্জ্জনীয়গুলি দূরে ফেলিয়া রক্ষণীয়গুলি যথা-স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গৃহখানি সুবাসিত করিতে পারিলে তবে ত গৃহটী পরিষ্কার করা হইবে! নাম সর্ব্বশক্তিমান্ বটে; কিন্তু নাম কাহারও বিনাশী নহে। নামের নিকট কেহই বর্জ্জনীয় নহে। নাম দোষকে গুণে, কামকে প্রেমে এবং খেলাকে লীলায় পরিণত করেন। নাম রিপুগণকে সহায়, প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত এবং সাংসারিক মায়াসম্বন্ধকে নিত্য চিন্ময় সম্বন্ধরাজ্য করিয়া দেন। পাপ দূর করা নামের বা নামা-ভাসেরও ক্রিয়া নহে। উহা নামের অবান্তর ফল। যেমন একত্রিত বহুবহু মশক বিনাশের জন্য বৃহৎ কামানের দরকার হয় না, সেইরূপ বহুবহুজন্মা-র্জ্জিত পুঞ্জপুঞ্জ পাপরাশি দূর করিবার জন্যও নামের প্রয়োজন হয় না। নামের আগমন-সম্ভাবনায় পাপরাশি আপনি দূরে পলায়ন করে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নাম্নৈব যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

এই শ্লোকের অর্থই স্বাভাবিক কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত্ত পাপ করে॥

প্যারী। নিত্যচিন্ময় সম্বন্ধ কি এবং উহা জন্মাইবারই বা উপায় কি?

বাবাজী। নিত্য চিন্ময় সম্বন্ধ অর্থ—অপ্রাকৃত অবিনাশী চৈতন্যময় সম্বন্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্বন্ধ রাজ্যটি বুঝাইবার জন্যই আমাদের সংসারক্ষেত্র। শাস্ত্রে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রস নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সম্বন্ধরাজ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রস বর্ত্তমান। শান্তরসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশ্বাসে তাঁহাকে অনুধাবন বা আরাধনা করা। সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন প্রভৃতি এই রসের পাত্র। শান্তরসে কোনওরূপ সম্বন্ধ অবধারণ হয় না। দাস্যরসে দাস প্রভু সম্বন্ধ; অর্থাৎ তিনি প্রভু আমি তাঁহার নিত্য কিঙ্কর, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপাসনা করা। জগতের অধিকাংশ লোকই এই দাস্যরসের পাত্র। দাস্যরসের ভক্তগণ চৌষট্টি অঙ্গে নবধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। এই দাসগণ বিধিমার্গ এবং রাগমার্গ এই উভয় পন্থাতেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্যারী। রাগ এবং বিধির পার্থক্য কি? এবং প্রাপ্তির তারতম্য আছে কি না।

বাবাজী। বিধি অর্থ আইন। অর্থাৎ পাপাদির ফলে নরকযন্ত্রণা

ভোগের ভয়ে ভীত হইয়া অথবা স্বর্গাদি সুখাভিলাষী হইয়া ভিগবদনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির শাস্ত্রানুমোদিত বিধিনিষেধ প্রতিপালন পূর্ব্বক ভগবদুপাসনার নামই বিধিমার্গে উপাসনা। মোটকথা বৈধ ভক্ত ভগবৎ-সুখ-অসুখ দেখিতে চান না বা জানেন না। শাস্ত্রের বিধি পালনীয় এবং নিষেধ বর্জ্জনীয় এই মাত্র জানেন। ভগবানেতে লোভপরবশ হইয়া শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ভগবদুপাসনার নাম রাগমার্গে উপাসনা। এই উপাসনায় সর্ব্বদা ভগবৎসুখ-অন্বেষণ, আত্মসুখাভিলাষশূন্যতা, ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্য এবং ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধা দেখা যায়। উভয়বিধ ভক্তের বাহ্যিক যাজন প্রায় এক প্রকার দেখা গেলেও মানসিক গতির তারতম্য রহিয়াছে। বিধি বলেন, "স্নান করিলেই পবিত্র"। রাগ বলেন, "স্নান কর আর নাই কর; কিন্তু মানসিক পবিত্রতা চাই।" বিধি বলেন, "শ্বেতপুষ্প দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে।" রাগ বলেন, "যে কোন বর্ণের পুষ্পই হউক না কেন, সুগন্ধি এবং সুকোমল হইলেই তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা হইবে।" ফলকথা—বিধি বলেন, "পূজা অর্থাৎ অর্চ্চনা কর; তিনি প্রসন্ন হইলেই তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে।" বিধি ফল চায়, রাগ উপাস্যের সুখ চায়। বিধি বহিরঙ্গ, রাগ অন্তরঙ্গ।

প্যারী। চৌষট্টি অঙ্গ এবং নবধা ভক্তি কি কি?

বাবাজী। ১ গুরুপদাশ্রয়। ২ কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা ও শিক্ষা। ৩ বিশ্বাস পূর্ব্বক গুরুসেবা। ৪ সাধুদিগের মার্গানুগমন। ৫ সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। ৬ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ। ৭ তীর্থাদি ধামে বাস। ৮ ভক্তি লাভের মুখ্য উপায় অবলম্বন। ৯ হরিবাসর সম্মান। ১০ ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব। ১১ বহির্ম্মুখ সঙ্গত্যাগ। ১২ বহুশিষ্য না করা। ১৩ আড়ম্বর ত্যাগ। ১৪ বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস, ব্যাখ্যা এবং কুতর্ক বর্জ্জন। ১৫ ব্যবহারে অকৃপণতা। ১৬ শোকমোহাদির অবশীভূততা। ১৭ দেবতান্তরের অবজ্ঞা না করা।

১৮ প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া। ১৯ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ বর্জ্জন। ২০ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তে বিদ্বেষ বা নিন্দায় অসহিষ্ণুতা। ২১ বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ। ২২ হরিনামাঙ্কিত চিহ্নাদি অঙ্গে ধারণ। ২৩ নির্ম্মাল্যধারণ। ২৪ ভগবদগ্রে নৃত্য। ২৫ দণ্ডবৎ নমস্কার। ২৬ অভ্যুত্থান। ২৭ অনুগমন। ২৮ ভগবদালয়ে গমন। ২৯ পরিক্রমা। ৩০ পূজা। ৩১ পরিচর্য্যা। ৩২ গীত। ৩৩ সংকীর্ত্তন। ৩৪ জপ। ৩৫ নিবেদন। ৩৬ স্তবপাঠ। ৩৭। নৈবেদ্য আস্বাদ গ্রহণ। ৩৮ চরণামৃত পান। ৩৯ ধূপ মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ। ৪০ শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। ৪১ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। ৪২ আরত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন। ৪৩ শ্রবণ। ৪৪ কৃষ্ণকৃপাপেক্ষা। ৪৫ স্মরণ। ৪৬ ধ্যান। ৪৭ দাস্য। ৪৮ সখ্য। ৪৯ আত্মনিবেদন। ৫০ নিজ প্রিয়বস্তু অর্পণ। ৫১ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা। ৫২ সর্ব্বথা শরণাগতি। ৫৩ তদীয়া তুলসীসেবা। ৫৪ ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন। ৫৫ মথুরা মণ্ডলবাস। ৫৬ বৈষ্ণবসেবা। ৫৭ শক্ত্যনুরূপ বৈভব দ্বারা সাধুগণ সহ মহোৎসব। ৫৮ কার্ত্তিক ব্রত ধারণ। ৫৯ জন্মযাত্রা মহোৎসব। ৬০ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবা। ৬১ রসিক জন সহ ভাগবতার্থ আস্বাদন। ৬২ স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ। ৬৩ নাম সংকীর্ত্তন। ৬৪ মথুরা মণ্ডলের সেবা।

এই চৌষট্টি অঙ্গে ভগবদারাধনাকে চৌষট্টি অঙ্গে যাজন বলে। নবধা ভক্তি এই চৌষট্টি অঙ্গেরই মধ্যে। মাত্র নাম ভেদ যথা—১ শ্রবণ। ২ কীর্ত্তন। ৩ স্মরণ। ৪ পাদসেবন। ৫ অর্চ্চন। ৬ বন্দন। ৭ দাস্য। ৮ সখ্য। ৯ আত্মনিবেদন। এই সকল অধিকারিভেদে ক্রমবিভেদ মাত্র। দাস্যভাবের উপাসকগণ কেহ বা চৌষট্টি অঙ্গের সম্পূর্ণ কেহ বা এক অঙ্গে, কেহ কেহ বা বহু অঙ্গে নিষ্ঠাপূর্ব্বক যাজন করিয়া ভাবসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাদের প্রাপ্তিস্থান বৈকুণ্ঠ, গোলোক, দ্বারকা, মথুরা,

বৃন্দাবন প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাবে, কেহ কেহ বা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য ভাবে, কেহ কেহ বা বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে, দ্বারকানাথ মথুরানাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে এবং গোলক-বিহারী ও বৃন্দাবনচন্দ্রকে উপাসনা করিয়া থাকেন। দাস্যরসের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাব একমাত্র ব্রজে ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই দাস্যভাব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। আমি তার প্রেমে বাধ্য না হই অধীন॥" জয়, বিজয়, ব্যাস, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, রক্তক, পত্রক, সারঙ্গ, মধুকণ্ঠ প্রভৃতি এই রসের পাত্র অসংখ্য। সখ্যরস অর্থাৎ বন্ধুত্বভাব। রাগমার্গাবলম্বী ব্যক্তি ভিন্ন বৈধ ভক্তের এরসে প্রবেশাধিকার নাই। এই সখ্যভাব দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সখ্য ও বিশুদ্ধ সখ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সখ্যের পাত্র উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি। প্রাপ্তিস্থান দ্বারকা ও মথুরা। বিশুদ্ধ সখ্যের পাত্র শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি। প্রাপ্তিস্থান একমাত্র বৃন্দাবন। সখাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত সখ্যরসের পাত্র উদ্ধব, অর্জ্জুন প্রভৃতি কখন কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলে মনে করিতেন, "হায়! আমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সখা বা কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে।" ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে যখন নিজৈশ্বর্য্য দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ইত্যাদি।

তবেই বুঝা গেল, ইঁহাদের মাধুর্য্যাংশ অল্প আর ঐশ্বর্য্যাংশ প্রবল। বিশুদ্ধ সখ্যরসের পাত্র শ্রীদাম সুবলাদি শ্রীকৃষ্ণের মহা মহা ঐশ্বর্য্যশক্তি দেখিলেও সেইটীকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য মনে না করিয়া কোন মন্ত্র বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাকে। গোবর্দ্ধনধারণ, দাবাগ্নিমোক্ষণ প্রভৃতি লীলায় সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যক্রিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াও সখাদের মনে কিঞ্চিৎমাত্র ঐশ্বর্য্য স্পর্শ করিতে পারে নাই; বরং গোবর্দ্ধনধারণের সময় কেহ কেহ দ্রুতপদে গিয়া আপন আপন যষ্টিদ্বারা কৃষ্ণের সহায়তা করিতে লাগিল। বনাগ্নিপানের পর সুবল কৃষ্ণের মুখখানি ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই কানাই! তোর সুকোমল মুখখানিতত অগ্নির উত্তাপ লাগে নাই ত?" বুঝিয়া দেখ কি মধুর ভাব! ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও ঐশ্বর্য্যগন্ধ স্পর্শ করিতে পারে না। এই সখ্যরসে দাস্যের সেবাগুণ এবং সখ্যের মিত্রতাদি গুণ বর্ত্তমান। পর পর রসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বাৎসল্যরসে কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞানে স্নেহব্যবহার, আপনাকে পিতৃমাতৃজ্ঞান। এই রসও দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য্যমিশ্র এবং বিশুদ্ধ। ঐশ্বর্য্যমিশ্র বাৎসল্যের পাত্র দেবকী বসুদেব প্রভৃতি এবং প্রাপ্তিস্থান দ্বারকা মথুরাদি। ইঁহারা ঐশ্বর্য্য দেখিলেই নিজসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া যান। মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াই বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য পরীক্ষার মানসে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করায় বসুদেব ও দেবকী নিজসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন :—

ত্বমস্য লোকস্য বিভো! রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

দেবকী বলিলেন,—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতি র্নিগুণং নির্ব্বিকারং।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

ইঁহারা কৃষ্ণকে পুত্রজ্ঞান করিলেও কখন তাড়নভৎর্সনাদি করিতে সমর্থ হন নাই। কৃষ্ণও ইঁহাদের নিকট সেরূপ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ঐশ্বর্য্যবিহীন বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের পাত্র নন্দযশোমতী প্রভৃতি সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া দেখিলেও সেটা দৈবী বা আসুরিকী ক্রিয়া মনে করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোমতীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য পরীক্ষা করিবার মানসে মৃদ্‌ভক্ষণচ্ছলে মুখারবিন্দে ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া নিজেই পরাস্ত হইলেন। কারণ মা যশোমতী উক্ত ব্যাপার দর্শনে মহারাজ নন্দকে আহ্বানপূর্ব্বক পুত্রের দেহে গ্রহগ্রস্ততা জানাইয়া শান্তির বিধান করিতে বলিলেন। নন্দ মহারাজও ব্রাহ্মণদ্বারা নানাবিধ শান্তির উপায় বিধান করিলেন। গোবর্দ্ধনধারণকালে মা যশোদা অন্যান্য বালকগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার দুধের ছেলে আজ সাত দিন যাবৎ অত বড় পর্ব্বতখানা হাতে তুলিয়া রাখিয়াছে। উহার বড়ই কষ্ট হইতেছে। তোমরা সকলে একটু সাহায্য কর। গোপাল একটু বিশ্রাম করুক" ইত্যাদি। বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র যতই ঐশ্বর্য্য দেখান না কেন, ব্রজবাসী-বাসিনীগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। ইঁহারা কৃষ্ণকে তাড়ন, ভৎর্সন, বন্ধন, শিক্ষনাদি দ্বারা সর্ব্বদা লালন পালন করিয়া কৃষ্ণকে নিজ নিজ বশে রাখিয়াছেন। কাহারও মুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলে মা যশোমতী বিস্মিতভাবে বলেন,—"কৃষ্ণ আমার অবোধ শিশু; আজ পর্য্যন্ত ক্ষুধা হইলে চাহিয়া খাইতে জানে না। তাহাকে এ সব কথা

বলায় অকল্যাণ হইতে পারে। তবে উহার অন্নারম্ভকালে গর্গমুনি বলিয়াছিলেন—'নারায়ণ সমো গুণৈঃ।' সেই মুনিবাক্যবলে যদি কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, গোপালের দেহে নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।" এই বাৎসল্যরসে দাস্তের সেবা, সখ্যের ক্রীড়া কৌতুকাদিসূচক মিত্রভাব এবং বাৎসল্যের লালন পালনাদি গুণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। ইঁহারা কোনও রূপ ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলেও শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ বাৎসল্যরসের পাত্র সামান্ত গোপবালক ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করেন না। ইঁহাদের কখনও আত্মসুখাভিলাস থাকিতে পারে না।

মধুরভাব অর্থাৎ কান্তাপ্রেম। এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ স্বামী এবং নিজে তাঁহার প্রেয়সী, এই ভাব। এই কৃষ্ণের প্রেয়সী আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধা।

স্বকীয়া অর্থ—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পতিব্রতা স্ত্রীকে স্বকীয়া বলা যায়। দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ষোলহাজার একশত আটজন মহিষী। তন্মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী এই আটজন মুখ্যা। ইঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা এই দুইজন প্রধানা। ইঁহারা পতিপরায়ণা এবং পতিসেবায় রতা; কিন্তু ধর্ম্মভীরু; অর্থাৎ পতির সুখকর কার্য্য যদি ধর্ম্মবিগর্হিত হয় বা সতীকুলোচিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা করিতে পারেন না। কোনও এক সময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নারদের সন্দেহভঞ্জনার্থ নিজদেহে জ্বরভাব অঙ্গিকার পূর্ব্বক কোন প্রেয়সীর চরণোদকই

ব্যাধিশান্তির একমাত্র উপায়, এই কথা নারদকে বলায় নারদ রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি দ্বারকাবাসিনী ষোল হাজার একশত আট মহিষীর প্রত্যেকের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অশেষ যন্ত্রণাদায়ক পীড়াশান্তির নিমিত্ত তাহাদের চরণামৃত প্রার্থনা করিয়া এমন কি কোন প্রেয়সীর চরণামৃত ব্যতীত কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন সংশয় জানিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এখন বুঝিয়া দেখ, পতির প্রাণবিনাশ হইলে বিধবা হইতে হইবে, সেও স্বীকার, তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুলা। যদিও ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সী, প্রেমে পরিপূর্ণ এবং অনুরাগবতী, তথাপি স্বার্থপরা সকামা।

পরকীয়া যথা :—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

অর্থাৎ রাগবশবর্ত্তিনী হইয়া ঐহিক পারত্রিক সতীকুলোচিত ধর্ম্মাদি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরকীয়া বলা যায়। ইঁহারা একমাত্র কৃষ্ণসুখে সুখী। এই প্রেমে আত্মসুখের গন্ধমাত্রও থাকিতে পারে না। এই রসের মুখ্যপাত্রী একমাত্র ব্রজগোপীগণ। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যতা হেতু ইঁহারা পতি প্রতিবেশী ও গুরুজনের তাড়ন ভৎর্সনাদিকেও অকাতরে সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইঁহারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম।

প্যারী। আজ্ঞে আপনি বলিলেন, গোপীদিগের কামগন্ধ নাই; কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—"কামাদ্ গোপ্যঃ" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন, "নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত।" এ কি রকম হইল?

বাবাজী। শ্রুতি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতির কথা তুমি যাহা বলিলে, সবই সত্য। কেবল কাম বলিয়া কেন? কাম, ক্রোধ, লোভ,

মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, প্রবঞ্চনা, কুটিলতা প্রভৃতি বৃন্দাবনে পূর্ণপূর্ণভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। ব্রজগোপীদিগের কামক্রোধাদি নাই বলাও যাহা, কৃষ্ণবৈমুখী বলাও তাই। কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মিথ্যাব্যবহার, কুটিলতা প্রভৃতিই তাঁহাদের উপাসনা। তবে যে গোস্বামিগণ কামশব্দ উচ্চারণ করিতে ভয় করিয়াছেন, তাহার কারণ—প্রাকৃত জগতের জীবগণের হৃদয়ে কাম শব্দের যথার্থ অর্থের পরিবর্ত্তে একটা কল্পিত অর্থ ধারণা হইয়া গিয়াছে। কামশব্দ উচ্চারণমাত্রই তাহারা একটা কুৎসিত ভাব মনে করিয়া থাকে। কাজেই পিতা কন্যার নিকট, পুত্র মায়ের নিকট এবং ভ্রাতা ভগিনীর নিকট কামশব্দ উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হয়। তাই আচার্য্যগণ বলিলেন "দেখ জীবগণ! তোমরা কামশব্দে যাহা বুঝিয়াছ, সেটী সম্পূর্ণ ভুল। সেটা হৃদয়ের কলুষতাসম্পাদক এবং ভগবৎপথের বিরোধী; অতএব পরিত্যাজ্য। ✓আমরা যদিও বৃন্দাবনে মধুরভাবে উপাসকগণের আচরণকে কামশব্দে অভিহিত করিব; কিন্তু সেটী ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ তাহার নাম প্রেম। কাম প্রাকৃত, প্রেম অপ্রাকৃত। কাম অন্ধকার, প্রেম নির্ম্মল চন্দ্রালোক। কাম আত্মসুখাভিলাষী, প্রেম কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য। কাম অসপত্ন, প্রেম বহুজনলিপ্সু। তাই বলি, বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন।" আরও দেখ কাম শব্দের অভিধানিক অর্থ—"কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ" অর্থাৎ অভিলাষ এবং তৃষ্ণা। ব্রজগোপীগণ কুল মান, মর্য্যাদা, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম এবং স্বর্গাভিলাষ প্রভৃতিকে তৃণতুল্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণসুখাভিলাষিণী; কাজেই আত্মসুখ বিবর্জ্জিতা; অতএব এই কাম অপ্রাকৃত। যদি বল তৃষ্ণা—গোপীদিগের এতই তৃষ্ণা যে, সংসার-সাগরে সে তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়ায় অবশেষে তাঁহারা প্রেমসাগরে

ঝাঁপ দিলেন। তথায় তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা; বরং ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল। তখন রসময়তনু নবজলধর শ্যামসুন্দরকে অবলম্বন করিয়া দিবানিশি অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। তথাপি পিপাসার শান্তি হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। বল, গোপীগণ নিষ্কামা কি পূর্ণকামা? কেবল কামশব্দের কুৎসিত অর্থ বাদ দিবার অভিপ্রায়েই নিষ্কাম নিষ্কাম বলিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পক্ষে গোপীগণকে নিষ্কামা বলা ভুল। মোট কথা—যে কামে আত্মসুখ রহিয়াছে, তাহাকেই কাম (কুৎসিত বস্তু) বলা হয়; আর যে কাম আত্মসুখাভিসন্ধি-রহিত, তাহারই নাম প্রেম (জীবনের আরাধ্য বস্তু)। সেই কামবীজেই কৃষ্ণ-আরাধনা হইয়া থাকে এবং সেই কামগায়ত্রীতেই কৃষ্ণ বশীভূত থাকেন। সেই কামচেষ্টাই ব্রজলীলা। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন :—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় গোপীভাববর্য্য॥
গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেমের সেবন॥
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

প্যারী। গোপীদের যদি আত্মসুখাভিলাষই না থাকিবে, তবে তাঁহারা নিজদেহে নানারূপ বেশভূষাদি করেন কেন? যদি তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাই না থাকিবে, তবে সর্ব্বদা কৃষ্ণসঙ্গলালসায় বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইবার কারণ কি?

বাবাজী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই এ বিষয়েরও মীমাংসা করিয়াছেন,—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণে সন্তোষণ।
এ লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যখন কৃষ্ণদরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥

গোপীকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥
গোপীকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক মমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
সেই শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণসুখ হয় গোপী-রূপগুণে।
কৃষ্ণ সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে॥
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিন্।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

মধুর রসের অপর একটী নাম "পররস"। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণসকল যেমন পর পর

ভূতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে পৃথিবীতে পঞ্চগুণ বর্ত্তে, সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারি রসের গুণসকল মধুররসে প্রবর্ত্তিত হয়। শান্তের বিশ্বাস, দাস্তের সেবা, সখ্যের মিত্রতা ও বাৎসল্যের স্নেহগুণ মধুররসে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মধুররসের পাত্র একমাত্র ব্রজ-গোপীকাগণ— স্থান শ্রীবৃন্দাবন—বিষয় শ্রীনন্দনন্দন। এই ব্রজগোপীকা-গণ আবার কন্যকা ও পরোঢ়া ভেদে দ্বিবিধা।

কন্যকা যথা—

অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখীকেলীষু বিশ্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধাগুণান্বিতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা বয়ঃপ্রাপ্তা, অথচ অবিবাহিতা, মাতাপিতা কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা, পিতৃগৃহেই অবস্থিতা এবং সমবয়স্কা নিজ সঙ্গিনীগণ সহ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণা এবং শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী, তাঁহাদিগকে কন্যকা বলা যায়। ইঁহারা প্রায়ই মুগ্ধার গণে গণ্যা হইয়া থাকেন।

পরোঢ়া যথা—

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥

অর্থাৎ যে ব্রজনারীগণ ব্রজবাসী গোপগণ, কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াও অনুরাগবলে শ্রীকৃষ্ণসহ সম্ভোগসুখাভিলাসিণী, যোগমায়া পৌর্ণমাসী দেবীর শক্তিপ্রভাবে নিজনিজ পতি-সম্ভোগবিরহিতা; অতএব অপ্রসূতিকা, তাঁহাদিগকেই পরোঢ়া বলা যায়। এই পরোঢ়া কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের রূপ, গুণ, প্রেম, মাধুর্য্যাদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে সাধনসিদ্ধা, কৃপাসিদ্ধা, ও নিত্যসিদ্ধা এই তিন প্রকার ভেদ আছে। সাধনসিদ্ধা দুই প্রকার—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যাঁহারা নিজগণ সহ একত্রে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যৌথিকী

সাধনসিদ্ধা বলা যায়। এই যৌথিকী আবার মুনিগণ এবং শ্রুতিগণ ভেদে দুই প্রকার। সীতাসহ রামচন্দ্রের রূপদর্শনে দণ্ডকারণ্যবাসী গোপাল উপাসক মুনিগণের হৃদয়ে গোপীবিষয়িণী রতি উদ্ভূত হওয়ায় সেইভাবে বহুদিন উপাসনা দ্বারা ব্রজগোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা কৃষ্ণে অনুরাগবতী হইয়াছেন এবং যে সমস্ত সূক্ষ্মদর্শিনী শ্রুতিগণ ব্রজলীলাদর্শনে পরমাশ্চর্য্যান্বিতা ও তদ্ভাবলিপ্সু হইয়া সাধনদ্বারা ব্রজে গোপীদেহ লাভ করতঃ কৃষ্ণে অনুরাগবতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যৌথিকী সাধনসিদ্ধা বলা যায়। অযৌথিকী যথা—যে কোন ব্যক্তি ব্রজগোপীদিগের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধন করিতে করিতে ব্রজে গোপীদেহ লাভ করতঃ কৃষ্ণে অনুরাগবতী হন, তাঁহাকে অযৌথিকী সাধনসিদ্ধা গোপী বলা যায়। কৃপাসিদ্ধা যথা—যাঁহারা গোপীদিগের কৃষ্ণসম্ভোগ-সৌভাগ্যাদি দর্শনে লোভযুক্ত হইয়া গোপী আনুগত্যহেতু তাঁহাদের কৃপায় ব্রজগোপকুলে জন্মগ্রহণ করতঃ কৃষ্ণে অনুরাগবতী হন, অথবা যাঁহারা যোগমায়ার কৃপায় গোপীআনুগত্য বশতঃ তত্তদ্দেহেই কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কৃপাসিদ্ধা বলা যায়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্ত্রী, পুরুষ যে কেহই হউক না কেন, একবার নিত্যসিদ্ধাগণের কৃপাকটাক্ষে পড়িলেই লীলাপ্রাপ্তি হইবে সন্দেহ নাই। নিত্যসিদ্ধা যথা—শ্রীরাধিকা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী, খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, তারাবলী, বিশারদা, চকোরাক্ষী, কুঙ্কুমা প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, পদ্মা ও শৈব্যা এই চারিজন ভিন্ন অন্য সকলেই যূথেশ্বরী। এই যূথেশ্বরীগণ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা এবং চন্দ্রাবলী সর্ব্বপ্রধানা। তন্মধ্যে আবার "রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।" ললিতাদি চারিজন সর্ব্বতোভাবে যূথেশ্বরীর যোগ্যা

হইলেও সখ্যভাবাকৃষ্ট হৃদয়হেতু ইঁহারা সখীত্বই গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের মধ্যে এক একজনের যূথে লক্ষ লক্ষ গোপীগণ। সকলেই রূপে, গুণে, প্রেমে অতুলনীয়া। শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী ও অসমোর্দ্ধগুণশালিনী। শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধিকাতে কেবল মাত্র তদীয়তা মদীয়তা ভাবহেতু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবলী তদীয় ভাবাপন্না অর্থাৎ আমি কৃষ্ণচন্দ্রের, এইভাবে বিভাবিতা; কাজেই ঘৃত-স্নেহা এবং শ্রীমতী রাধিকা মদীয় ভাবাপন্না অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার, এই ভাবযুক্তা; সুতরাং মধুস্নেহা।

প্যারী। এতক্ষণে বুঝা গেল যে কৃষ্ণের সহিত কোনও সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজিতে পারিলেই ব্রজপ্রাপ্তি অনিবার্য্য; অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধ রাজ্য।

বাবাজী। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় যে শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধ রাজ্য; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধাতীত অপ্রাকৃত অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধভাবরাজ্য। বৃন্দাবনলীলা একমাত্র ভাবলীলা। বৃন্দাবনের সকল ভাবই পরকীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের গর্ভবাস নাই। যখন দেবকী নন্দন কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ হয়, তখন বসুদেব-দেবকী তাঁহাকে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দর্শন করিয়া নানারূপে স্তব করায় তিনি আদেশ করিলেন, "আমাকে গোকুলে নন্দগৃহে রাখিয়া তথা হইতে যশোদানন্দিনী মহামায়াকে লইয়া আইস।" এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক গোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে যমুনার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোল হইতে যমুনায় পড়িয়া গেলেন। তখন বসুদেব অতি ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করায় ক্ষণকাল পরে আবার তাঁহার হস্তগত হইয়া গোকুলে আগমন করেন। তাৎপর্য্য—মথুরানাথ নারায়ণ যমুনায় ঝাঁপ দিবার ছলে

অন্তর্হিত হইলেন এবং রসময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবিভূর্ত হইলেন। এই কৃষ্ণই বৃন্দাবনেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন নবকিশোর নটবর গোপবেশ বেণূকর। যশোদাদেবীর গর্ভজাত পুত্র না হইলেও নাম যশোদানন্দন। মা যশোমতী, নন্দ প্রভৃতি ঠিক পুত্রভাবে কৃষ্ণকে লালন পালন, তাড়ন ভৎর্সনাদি করিতেন। তাই কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মাতা মোরে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন।
সখা সখ্যভাবে করে স্কন্ধে আরোহণ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হইতে সেও হরে মোর মন॥"

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"উপপতি ভাবে ভজে ব্রজরমাগণ।
তাহাদের প্রেমে আমায় করে আকর্ষণ॥"

এই সকল স্থানে ভাব শব্দ দেওয়াতেই বুঝা গেল যে শ্রীবৃন্দাবন-লীলাটীই পরকীয়া; অর্থাৎ পুত্রভাবে কথাটা বলিলেই বুঝা গেল যে পুত্রের প্রতি যেরূপ ভাব, ঠিক সেইরূপ; কিন্তু পুত্র নয়। এইরূপ সখা নয় কিন্তু সখ্যভাবে। "আমি তাহাদের উপপতি নই; কিন্তু তাহারা উপপতির ভাবে আমাকে ভজিয়া থাকে।" বল বৃন্দাবনে গোপগোপী-দিগের সহিত কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ আছে? যদি বা দেবকীনন্দন কৃষ্ণের যমুনাপতন ছলে অন্তর্দ্ধানটা কোন কোন গ্রন্থকার স্বীকার করেন না, তথাপি ভাবের পরকীয়ত্ব বাদ পড়িবার ত কোনই সম্ভব নাই; কারণ মথুরানাথ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, আর ব্রজবাসী বাসিনীগণ গোপজাতি অর্থাৎ বৈশ্য। বৈশ্যজাতি ব্রজবাসীদিগের সহিত কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ হইতে পারে? তাই বলি, বৃন্দাবন সম্বন্ধের অতীত রাজ্য। অন্য এক স্থানে ব্রজবাসীদিগের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

গমন নটন লীলা, বচন সঙ্গীত কলা,
মধুর চাহনি আকর্ষণ।
রঙ্গ বিনু নাহি অঙ্গ, ভাব বিনু নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন ॥

প্রকৃতই ব্রজবাসিগণ ভাব বিনা অভাবের সঙ্গ করিতে পারেন না বা করেন না।

প্যারী। কি ভাবে উপাসনা করিলে এই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

বাবাজী। ব্রজ-উপাসনার মূলভিত্তি অনুরাগ অর্থাৎ ভালবাসা। এই ভালবাসার মাত্রা যতই বিশুদ্ধ হইবে, ততই উপাসনার পথ সুগম হইবে—ততই কৃষ্ণচন্দ্র নিকটবর্ত্তী হইবেন। এই বিশুদ্ধ ভালবাসা অবলম্বনে "ব্রজজনার কোন একভাব লঞা ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে।" আনুগত্য প্রধান সহায়। বিনা আনুগত্যে ভজিলেও প্রাপ্তি হইবে না।

প্যারী। আচ্ছ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটী রসের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?

বাবাজী। রসের তারতম্য বা উপাসনার ভালমন্দ কে বলিবে? যাহার যে রসে লোভ হইয়াছে, তাহার নিকট সেই রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রদ। তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

প্যারী। ইহাতে বুঝা গেল যে মধুর ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মধুর ভাবের উপাসনা প্রণালীটী আমাকে একটু বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। এই উপাসনা প্রণালী আর আমাদের মুখে বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন নাই; একবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বেশ বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে।

"রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইঁহ অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥"

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীং।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাং॥
বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ॥
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥"

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটী সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥

* * *

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

* * *

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
নিরন্তর চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥"

নিজসিদ্ধ দেহ সর্ব্বদা মনে ভাবনা করিয়া এই প্রাকৃত দেহ বিস্মরণ পূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় দেহে অবস্থান করিয়া নিজ যূথেশ্বরীর আনুগত্যে অষ্টকাল সেবা করিতে করিতে ভাব স্থায়ী হইলে সেই ভাবযোগ্য দেহ লাভ হইবে।

প্যারী। এই সেবা কায়িক না মানসিক?

বাবাজী। উপাসকের ত্রিবিধ অবস্থা—প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ। এই ত্রিবিধ অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিই কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপে সেবা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কোনও কামনাসিদ্ধির জন্য ভক্তি যাজন করেন; কিন্তু শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা নাই, তাঁহাকে প্রবর্ত্ত ভক্ত বলা যায়। এই প্রবর্ত্ত ভক্ত তিন প্রকার—প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত, প্রবর্ত্তের সাধক ও প্রবর্ত্তের সিদ্ধ। কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধার কোমলতা প্রযুক্ত যখন যেরূপ সঙ্গ হয়, সেইরূপ আচরণশীল ও অপরের দোষদৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে প্রবর্ত্তের প্রবর্ত্ত ভক্ত বলা যায়। গুরুবাক্যে স্বল্প শ্রদ্ধাবান্ এবং কামনা-বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ মতে যাজনকারী ভক্তদিগের সঙ্গে তত্তদনুরূপ যাজন করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপকারী ব্যক্তিকে প্রবর্ত্তের সাধক বলা যায়। বাসনানুরূপ ফল প্রাপ্তি কামনায় সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যের দোষগুণ সমালোচনাপূর্ব্বক অবিতৃপ্তভাবে কাম্যকর্ম্মাদিদ্বারা ভগবদর্চ্চনা করাকে প্রবর্ত্তের সিদ্ধ অবস্থা বলে। শ্রদ্ধাবান্, শ্রীকৃষ্ণে জাতরতি, নানারূপ বিঘ্নাদি দ্বারা বিচলিত, ভক্তিযাজনপরায়ণ, ধৃতভক্তচিহ্ন ব্যক্তিকে সাধক বলা যায়। এই সাধকও ত্রিবিধ—সাধকের প্রবর্ত্ত, সাধকের সাধক এবং সাধকের সিদ্ধ। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্য হৃদয়ে সমালোচনা করতঃ সমন্বয় করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে বিধিপূর্ব্বক যাজনকারীকে

সাধকের প্রবর্ত্ত বলা যায়। সম্বন্ধনির্দ্ধারণপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তি-যজন, ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, শত্রুতে উপেক্ষাকারীকে সাধকের সাধক ভক্ত বলা যায়।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
ফলেষ্বাসক্তিরহিতো মন্নিষ্ঠো যাজকঃ সুধীঃ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
বিকারৈঃ সাত্ত্বিকৈর্যুক্তঃ সিদ্ধত্বং সাধকস্ত তু॥"

অর্থাৎ সর্ব্বজীবে দ্বেষভাবরহিত, প্রাণিমাত্রের হিতে রত, ফলাভি-সন্ধিরহিত, ভগবন্নিষ্ঠ, যাজনকারী, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, সংযতচিত্ত, সাত্ত্বিকাদি বিকারযুক্ত দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তিকে সাধকের সিদ্ধ বলা যায়। সিদ্ধো যথা—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়ঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতি র্মৌনী যথালাভসুখী ক্ষমী।
স্থিরধীঃ সন্ততপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণঃ॥
নিরাশী সাত্ত্বিকৈর্যুক্তঃ ফলাসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
শুভাশুভপরিত্যাগী সিদ্ধঃ স্যান্মুক্তলিঙ্গকঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে কোনও লোক উদ্বিগ্ন না হয় বা যিনি কোনও লোক কর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন না হন, হর্ষ, রোষ, ভয় ও উদ্বেগশূন্য, সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় রত, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান, মিতভাষী, যথালাভে সন্তুষ্ট, ক্ষমাশীল, ধীর, সর্ব্বদা প্রেমসৌখ্যাস্বাদনে তৎপর, নিরাশী, সাত্ত্বিকভূষণে বিভূষিত, ফলাভি-সন্ধিরহিত এবং শুভাশুভপরিত্যাগী ব্যক্তিকে সিদ্ধ বলা যায়। এই সিদ্ধ, আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ ভেদে তিন প্রকার। শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, ভাবৈকনিষ্ঠ; কৃষ্ণগুণানুকথনে

আত্মবিস্মৃতি ও বৈক্লব্যযুক্ত, কৃষ্ণসুখাভিলাষী, প্রেমানুরাগবান্, পরিচর্য্যা-পরায়ণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টান্বিত, সাধনফলত্যাগী ব্যক্তিকে সাধনসিদ্ধ বলা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—মার্কণ্ডেয়, ধ্রুব, শ্রুতিকন্যা, মুনিকন্যাগণ প্রভৃতি। কৃপাসিদ্ধের কোনও ভজনক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। বাহ্যিক ক্রিয়া থাক আর নাই থাক্, আন্তরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা, হৃদয়ের কোমলতা ও ব্যাকুলতা থাকিলেই হইল। কৃপাসিদ্ধের পাত্রাপাত্র যোগ্যাযোগ্য বিচার থাকে না অর্থাৎ যাহার উপর চিত্তের সন্তোষ জন্মে, তাহাকেই অনুগ্রহ হয়; কাজেই সে কৃপার পাত্র। প্রহ্লাদ, বলি, শুকদেব, যজ্ঞপত্নী প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ। শ্রীমতী রাধিকা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা। যত কিছু ভজন সাধন জপতপ নিয়মনিষ্ঠাই কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে গুরুকৃপা চাই। গুরুকৃপা না হইলে কাহারই কৃপা হইতে পারে না। যদি কোন সাধনপথে অগ্রসর হইতে চাও, তবে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান কর—অক্ষয় গুরুকৃপা সঞ্চয় কর—শ্রীগুরুদেবকে অগ্রগামী করিয়া তদানুগত্য অবলম্বন কর। অতিকষ্টসাধ্য কার্য্যও সুগম হইবে—অলভ্য বস্তুও অনায়সলভ্য হইবে।

প্যারী। গুরুদেব যদি উপস্থিত বা প্রকট না থাকেন, তবে কি করা যাইবে?

বাবাজী। বাবা! গুরুদেব নিকটে না থাকিলে জীবের এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। বল, যখন তুমি মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলে, তখন কে তোমাকে মাতৃস্তন হাতে ধরাইয়া দুগ্ধপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিল? কেই বা ক্ষুধা হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাকে ডাকিতে শিখাইয়াছিল? আবার দুদিন পরে কেই বা তোমায় মা, বাবা, দাদা, বুলি বলিতে উপদেশ দিয়াছিল? কেই বা তোমায় আপন-পর, ভাল-মন্দ, জল-আগুন, শীত-গ্রীষ্ম অনুভব করাইয়া দিয়াছিল? কে তোমাকে

হাত ধরিয়া হাঁটিতে শিখাইয়াছিল? কেই বা বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছিল? তাই বলি, আমাদের যে মুহূর্ত্তে যে ভাবটার প্রয়োজন, ভগবান্ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গুরুরূপে নিকটে আসিয়া সেইভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কখন বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দেন, কখন বা অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান-বলে বা শিক্ষাপ্রভাবে "গুরুর প্রয়োজন নাই" এই সিদ্ধান্ত করেন, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—"ভাই সকল! যে শিক্ষার প্রভাবে আজ তোমরা জ্ঞানী বা বিদ্বান্ হইয়াছ, কে তোমাদিগকে সেই শিক্ষা দিয়াছিল? কে তোমাদের হাতে ধরিয়া ক—খ—গ—ঘ লিখাইয়া বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছিল?" কে তোমাদিগকে হস্তপদাদির ক্রিয়াসকল শিক্ষা দিয়াছিল? গুরু নিত্য, চিন্ময় ও সর্ব্বব্যাপী। তোমার প্রয়োজন হইলেই তিনি উপস্থিত হইবেন। যখন অভাব বোধ করিবে, ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিলেই; দর্শন পাইবে।

প্যারী। যে ব্যক্তি সকল বিষয়েই অক্ষম, সে কি করিবে? তাহার কি কোনও উপায় নাই?

বাবাজী। কেন থাকিবে না? যে লেখাপড়া না জানে, তাহার কি জমিদারী চলে না? ধর, তুমি লিখিতে অক্ষম, তোমার যদি কোথাও নাম সহি করিতে হয়, তুমি কি করিবে?

প্যারী। কি আর করিব? অপর একজন দ্বারা বকলম দস্তখত করাইতে হয়।

বাবাজী। তবে আর কি! এ বিষয়েও তাই। যদি কোন কার্য্য করিতে অক্ষম হও বা ভাল মন্দ বিচার করিতে না পার, তবে অপর একজনকে ক্ষমতাপত্র দাও, সুচারুরূপে কার্য্য চলিবে—ঘরে বসিয়া লাভ পাইবে।

প্যারী। কথাটী ভাল বটে। আমাদের ন্যায় অশক্ত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে এই পন্থাই সুগম। তবে কথাটা একটু বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। কথাটী ত বুঝিতে বিশেষ কিছুই কঠিন নয়। একদিন কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর – সরল প্রাণে গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা কর, "প্রভো! আমি আপনার শ্রীচরণে বিক্রীত হইলাম। আজ হইতে আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পূর্ণ আপনার উপরই নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" সেই দিন হইতে তোমার সম্বন্ধে তোমার আর কিছু ভাবনা থাকিবে না। যদি গুরুদেবের আদেশানুযায়ী তাঁহার হইয়া কিছু করিতে পার কর; কিন্তু সাবধান যেন লাভের প্রত্যাশা না আসে। ফলাফল তাঁহার। দিবানিশি মনে ধারণা করিয়া রাখ—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে শিক্ষা দিলেন যে, তুমি আমার নিকট চির-বিক্রীত হইয়াছ; তোমার কেবল কর্ম্ম করারই অধিকার। ফলাফলের ভোক্তা তুমি নও। স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, সে সকলের ফলাফল আমাকে সমর্পণ কর। ইহারই নাম ক্ষমতাপত্র দেওয়া। তুমি তোমার জন্য ব্যস্ত হইও না। তিনি তোমার জন্য চেষ্টা করিবেন।

প্যারী। তবে যে গুরুদেব শিষ্যকে যাজন করিতে আদেশ করেন?

বাবাজী। সে যাজন তোমার জন্য নয়; তাঁহারই জন্য। যেদিন তুমি তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, সেইদিন হইতে অঙ্গীকারপত্র দ্বারা তিনি তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বাঁধা পড়িয়াছেন। তোমাকে

গম্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছাইয়া দিবেন। তবে তোমাকে যে যাজন করিতে বলিয়াছেন, সে কেবল তাঁহার নিজ সাহায্যের জন্য। মনে কর, তুমি নবদ্বীপ যাইবার জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করিলে। মাঝির সঙ্গে তোমার স্থির হইল যে, নবদ্বীপ পৌঁছাইয়া দিলে তুমি তাহাকে দশ টাকা দিবে। সে তোমার কথায় স্বীকৃত হইয়া নৌকা ছাড়িল। কিছুদূর যাইয়া মাঝিটী তোমাকে বলিল, "মহাশয়! আপনি যদি ঐ দাঁড়গাছটী একটু টানেন, তবে আমার একটু সুবিধা হয়। আপনিও একটু সত্বর নবদ্বীপ পৌঁছিতে পারেন।" তুমি যদি তাহার কথামত দাঁড়গাছটা একটু টান, তবে তাহারও উপকার হয়, তোমারও পথ নিকট হয়। যদি না টান তোমার উপর মাঝির জোর নাই। যতক্ষণে হউক মাঝি তোমাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু তুমি নৌকার দাঁড় হাতে করিয়াই বিপরীত দিকে টানিতে থাকিলে; মাঝি কি করিবে? সে তোমার নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "বাবা! আপনি কিছু না করিয়া নৌকার মধ্যে বসিয়া থাকুন। আমি যতক্ষণেই হউক আপনাকে গম্য-স্থানে পৌঁছাইয়া দিব।" তুমি মাঝির কথা না শুনিয়া বিপরীতভাবে টানিতে লাগিলে মাঝি অগত্যা হা'ল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। তোমার নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝে ঘুরিতে লাগিল। তোমার সম্মুখ দিয়া কত কত নৌকা চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু তোমার নৌকাখানি কখন অনুকূল কখনও প্রতিকূলভাবে চলিতে চলিতে এমন এক স্থানে গিয়া পৌঁছিল যে, চারিদিকে তরঙ্গমালা পরিপূর্ণ; গম্যস্থান যে কোন্ দিকে তাহা ঠিক করা কঠিন হইয়া পড়িল। বল, এই অবস্থায় মাঝির দোষ, না তোমার নিজের দোষ? ব্যাধি জন্মিয়াছে, সুনিয়মে ঔষধ ব্যবহার কর এবং সুপথ্য কর, শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবে। যদি ঔষধ না খাও না খাইলে; কিন্তু কুপথ্য করিও না; ঔষধ না খাইলেও

আরোগ্যের আশা আছে। তুমি ঔষধও খাইবে না, কুপথ্যও করিবে; কিরূপে তোমার রোগ ভাল হইবে? শ্রীগুরুদেবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাক—তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর, অভীষ্ট প্রাপ্তি হইবে। যদি কিছু করিবার মন হয়, গুরুদেবের আদেশানুযায়ী কার্য্য কর। শ্রীগুরুদেবের উপর নির্ভরও করিব; নিজেও চেষ্টা করিব. সে চেষ্টাও প্রতিকূলে। বল, ফল হইবে কিরূপে? সুগম পথের সময় তুমি, দুর্গম পথের বেলায় 'যা কর প্রভু!' কষ্টসাধ্য কার্য্যের ভার গুরুদেবের উপর অর্পণ করিয়া তাড়াতাড়ি ফলপ্রার্থী হইলে চলিবে কেন? পরমার্থজগতে ভাগে ব্যবসা চলিতে পারে না। হয় তুমি কর, না হয় তাঁকে দাও।

প্যারী। বিষয় আশ্রয়তত্ত্ব কি আমাকে বলিতে হইবে।

বাবাজী। বিষয় অর্থ—উপাস্য বস্তু অর্থাৎ অভীষ্ট জিনিষ। সেই বিষয় প্রাপ্তির সহায়কে আশ্রয় বলে। আশ্রয় অর্থ অবলম্বন। আশ্রয় পাঁচ প্রকার—নামাশ্রয়, গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয় ও ভক্তাশ্রয়। নামের কৃপা না হইলে কোন কার্য্যসাধন হইতে পারে না। প্রথম নিজের রুচি-অনুযায়ী যে কোনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই নাম করিতে করিতে নামের কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া গেলে নামের প্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ নামীর প্রতি লোভ জন্মিবে। লোভ জন্মিলেই লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে। এই ব্যাকুলতাই গুরুপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। ব্যাকুলতা জন্মিলেই গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ হইবে। গুরুপদাশ্রয় গ্রহণমাত্রই গুরুকৃপায় মন্ত্রপ্রাপ্তি হইবে। নাম ও মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাবের সঞ্চার হইবে। একনিষ্ঠ হইয়া এই ভাবাশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই সেই সেই ভাবাঢ্য ভক্তের করুণা জন্মিবে। ভাবাঢ্য ভক্তের করুণা হইলেই সাধন সিদ্ধ হইল। ভাবাঢ্য ভক্ত অর্থাৎ বিষয়ের অন্তরঙ্গ পরিকর। তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া

তাহাদের আনুগত্যে তাঁহাদিগের আচরিত এবং আদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করাকে আশ্রয় বলে। এইরূপ ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে বিষয়প্রাপ্তির আর কোনরূপ বাধা থাকে না। এমন কি, বিষয় আপনি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লন। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" বৃন্দাবনে বিষয় যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর। আশ্রয় (দাস্যভাবে) রক্তক, পত্রক প্রভৃতি। (বাৎসল্য ভাবে) নন্দযশোমতী প্রভৃতি। (সখ্যভাবে) শ্রীদাম, সুবলাদি। (মধুরভাবে) শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। ব্রজ-উপাসনার মূলভিত্তি আনুগত্য। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-পদাশ্রয় প্রাপ্তির পরে যে নামাশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে, প্রবর্ত্ত. সাধক, সিদ্ধ কোন অবস্থায়ই কোনও আশ্রয় ত্যাগ হইবে না; বরং আনুগত্যভাবটী ক্রমে প্রবলই হইবে; কারণ প্রাপ্য বস্তু যতই নিকটবর্ত্তী হইবে ততই তৎসাধকের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার আসিবে।

প্যারী। প্রেম অর্থ কি?

বাবাজী। প্রেম অর্থ বিশুদ্ধ ভালবাসা। এই বিশুদ্ধ ভালবাসা একমাত্র ব্রজ বৃন্দাবন ছাড়া অন্যত্র কোথাও নাই। ইহা আমাদের ন্যায় স্বার্থপর জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি বা কাহারও কোন ভাগ্যবলে কোন ব্যক্তির প্রতি জন্মে, তবে সেই ভালবাসাই তাহার ব্রজপ্রাপ্তির সহায় হইবে। গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের নিজপুত্রের প্রতি বিশুদ্ধ বাৎসল্য জন্মিয়াছিল। ঠিক সেই বাৎসল্যেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্রটিকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেই ঘোষ-ঠাকুরের পুত্র হইয়া বসিলেন। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বহু বহু পাওয়া যায়। প্রেম-অন্ধ; প্রেম কুল, শীল, জাতি, বিদ্যা, রূপ, গুণ, ভাল, মন্দ বিচার করিতে জানে

না। প্রেম যোগ, তপ, জ্ঞান ধ্যান, ভজন সাধন দেখে না। প্রেম চায় প্রাণ; প্রেম আত্মসমর্পণ করিতে ভালবাসে। প্রেম প্রতিদান চায় না; কিন্তু আপনিই মিলে। এ বিষয়ে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত শুন :—

নৌরঙ্গজীব বাদসাহ একসময় দুষ্ট মন্ত্রীদিগের পরামর্শে বড়ই দেবদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এমন কি, নানা দেশভ্রমণপূর্ব্বক বহু বহু দেবদেবীর মন্দিরভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমূর্ত্তির কাহারও হাত, কাহারও চরণ, কাহারও কটিদেশ ভগ্ন করিয়া দিল্লীতে পাঠাইতে লাগিলেন। যাদবাচল নামক গ্রামে জনৈক সাধু একটী কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেন। একদিন বাদসাহের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাধু অতি কাতরভাবে নিজ ইষ্টমূর্ত্তিকে বাদসাহের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে মাটীতে একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ঠাকুরকে প্রোথিত করিয়া রাখিবার মানসে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গর্ত্তের পরিমাণ যখন চারিহাত হইল, তখন সাধু শ্রীমূর্ত্তি আনিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে রাখিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে কাহার সাধ্য? সাধু উপরে আসিয়া যেমন গর্ত্ত বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই সময় দেখেন যে গর্ত্তের পরিমাণ ঠাকুরের কটিদেশ পর্য্যন্ত। পুনর্ব্বার গর্ত্ত খনন করতঃ তন্মধ্যে ঠাকুরকে রাখিয়া উপরে উঠিবামাত্র দেখেন পূর্ব্ববৎ। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতে বাদসাহের লোক আসিয়া সাধুর মন্দিরাদি ভগ্ন করতঃ শ্রীমূর্ত্তি লইয়া প্রস্থান করিল। মূর্ত্তিখানি বড়ই অপূর্ব্বদর্শন দেখিয়া বাদসাহের কন্যা খেলা করিবার জন্য পিতার নিকট হইতে ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিটী চাহিয়া লইলেন। যথাসময়ে বাদসাহ দিল্লীতে পৌঁছিলেন। ক্রমে বাদসাহকন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিটীর উপর এত স্নেহাতিশয্য জন্মিল যে, মুহূর্ত্তকালও শ্রীমূর্ত্তি ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি স্নান, ভোজন, শয়ন,

উপবেশন প্রভৃতিতেও উঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতেন। প্রেমের ঠাকুর প্রেমে বাঁধা পড়িলেন। ক্রমে সাহাজাদীর সহিত আলাপব্যবহার ও একত্র শয়ন-ভোজন-বিলাসাদি চলিতে লাগিল।

কৌতুকী ঠাকুর একটা কিছু কৌতুক না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই রামানুজ স্বামীকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, "আমি দিল্লীতে নৌরঙ্গজীর বাদসাহের ঘরে আছি। তুমি আমাকে তথা হইতে আনিয়া সেবা কর।" প্রভাতে বহু বৈষ্ণব জমাতি লইয়া যতিরাজ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লী পৌছিয়া কি উপায়ে ঠাকুর পাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা বাদসাহের চারি দরজা ঘেরাও করিলেন। বাদ্সাহের নিকট খবর গেল যে, "অনেকগুলি ফকির দ্বার রোধ করিয়াছে।" তখন বাদ্সা গোয়েন্দা পাঠাইয়া যতিরাজের অভিমত জানিলেন যে, উহারা ধনজন প্রার্থী নহে; বাদসাহের নিকট উহাদের এক ঠাকুর আছে, উহারা কেবল তাহাই চায়। শুনিয়া বাদ্সাহ যতিরাজকে নিজদরবারে আনয়নপূর্ব্বক যাবতীয় ঠাকুর দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার যে যে মূর্ত্তি ইচ্ছা গ্রহণ কর।" যতিরাজ তখন আদেশকারী মূর্ত্তি নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় বলিলেন— 'আমি কাল প্রভাতে বলিব।' রাত্রে স্বপ্ন হইল, 'আমি বাদসাহের মূর্ত্তির মধ্যে কেহই নহি; আমি বাদসাহের কন্যার নিকট আছি।' প্রভাতে স্বামীজী ঐ কথা বলায় বাদ্সাহ দাসীর হাতে কন্যাকে মূর্ত্তি দিতে বলিলে কন্যা উত্তর করিল, "মূর্ত্তি আমার প্রাণতুল্য; বরং আমি প্রাণ দিতে পারি; কিন্তু মূর্ত্তি দিতে পারিব না।" বাদ্সাহ মণিমাণিক্য-খচিত রত্নময়ী মূর্ত্তি লইয়া ফকিরদিগকে ঐ মূর্ত্তি দিবার জন্য কন্যাকে অনুরোধ করিলেও কন্যা কিছুতেই স্বীকার না করায় বাদ্সাহ নিজবাক্য রক্ষার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া কন্যার নিকটে যুক্তি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,

"আচ্ছা, কাল রাজসভামধ্যে আমি মূর্ত্তি রাখিয়া দিব ; মূর্ত্তি হাঁটিয়া যাহার কোলে যাইবে, তাহারই হইবে। সকলেই এই কথায় স্বীকৃত হইলেন।

পরদিবস তাহাই করা হইল। হাজার হাজার যোগী তপস্বী সাধুসন্ন্যাসী একদিকে, আর সেই আচার-নিয়ম-নিষ্ঠাবিহীনা, যোগ-তপোরহিতা যবনদুহিতা একদিকে। প্রেমের ঠাকুর কাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন? প্রেমের না যোগ তপস্যার? কাহাকে উচ্চপদ প্রদান করিবেন ভাবিয়া রুনুঝুনু শব্দে নাচিতে নাচিতে সাহাজাদীর কোলে গিয়া উঠিলেন। বাদ্‌সাহ অবাক! সাধুসকল অন্তরে অন্তরে সাহাজাদীর প্রেমকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তখন রামানুজ স্বামী অতি দুঃখিত হৃদয়ে ত্রিদণ্ডী হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন "হে লম্পট! হে শঠ! তোমার যদি যবন গৃহে থাকিতেই মন ছিল, তবে আমাকে কেন যবনপুরে আনিয়া অপমানিত করিলে? এই নেও তোমার মালাকণ্ঠী, এই তোমার ধর্ম্ম, এই তোমার বেদ। আজ থেকে আমি জগতে ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রচার করিব এবং তোমার উপর ব্রহ্মবধের পাতক অর্পণ করিব।" বলিয়া যেমন ত্রিদণ্ডী নিক্ষেপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন, অমনি ঠাকুর সাহাজাদীর ক্রোড় হইতে রামানুজ স্বামীর কোলে গিয়া উঠিলেন। সাহাজাদী বিরহে ব্যাকুলা হইয়া আহার নিদ্রা বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগই দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন। বাদসাহ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। সাহাজাদী বলিলেন, 'যদি আমার প্রাণ রক্ষা চাও, তবে আমাকে সাধুর সঙ্গে যাইতে দাও।' মন্ত্রীদিগের পরামর্শে বাদসাহ তাহাই করিলেন। সাহাজাদী রামানুজ স্বামীর চরণে ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি শুনিয়াছি আমার প্রাণপ্রিয় নাকি আপনার নিকট পুত্ররূপে প্রতিপাল্য ; অতএব আমিও আপনার তনয়া। আমাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে লইতে হইবে এবং সেবাপূজার সময় ব্যতীত ঠাকুর

আমার নিকট থাকিবে।" যতিরাজ অগত্যা সাহাজাদীর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

যতিরাজ ঠাকুরের নাম রাখিয়াছেন সম্পৎকুমার। কয়েকদিন পরে সাহাজাদি সম্পৎকুমারকে বলিলেন, "দেখ, প্রাণনাথ! আমি ক্ষণকালও তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না; অতএব যাহাতে তোমার সহিত মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিচ্ছেদ না হয় তাহাই কর।" প্রেমের ঠাকুর প্রেমিকার কথা শুনিতে বাধ্য। একদিন পাল্কীর মধ্যে সাহাজাদীর কোলে বসিয়া আছেন, সাহাজাদী উঁহার শ্রীমুখচন্দ্রে নিজ নয়নচকোর বসাইয়া চিরজীবনের মত অবিচ্ছেদে সুধাপান করিতে লাগিলেন। পরদিবস প্রভাতে স্বামীজী সেবার জন্য সম্পৎকুমারকে আনিতে গিয়া দেখেন, সাহাজাদী উঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তখন তিনি সাহাজাদীর রূপানুরূপ কনকপ্রতিমা গঠনপূর্ব্বক সম্পৎকুমারের বামে বসাইয়া সাহাজাদীর সমাধিস্থানে (যাদব গিরিতে) মন্দির প্রস্তুত করাইয়া সেবা প্রকাশ করিলেন। দেখ প্রেমের খেলা! সাহাজাদী কোনও শাস্ত্রাদি পড়িয়া কৃষ্ণ যে পূর্ণপূর্ণতম এই বিশ্বাসে ভালবাসেন নাই। অথবা কৃষ্ণ যে কোনও দেবতা বা সুখ-মোক্ষপ্রদাতা ইহাও তাঁহার মনে ধারণা ছিল না। তিনি জানিতেন এইটী আমার একটী খেলার পুতুল। প্রেমের বিশুদ্ধতা ও গাঢ়তাবশতঃ ঐ পুতুল হইতেই তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল।

প্যারী। এই প্রেম জন্মাইবার উপায় কি?

বাবাজী। প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, প্রেমের জন্ম নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্য শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

শ্রবণাদি যে কোনও উপায়েই হউক, চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মিলেই প্রেমের বিকাশ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "প্রেম চায় স্বচ্ছতা, সরলতা ও কোমলতা। কোনও ধনী একটী কাচের বাক্সের মধ্যে বহুবিধ মণি মাণিক্য রাখিয়াছে। কেহ সেই কাচের গায়ে কালি মাখাইয়া দিলে, সে যেমন মণি মাণিক্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারায় নানাস্থানে অন্বেষণ করতঃ মণিমাণিক্যের অভাবজনিত শোকে কাতর হইয়া অন্যান্য লোকের নিকট উহা প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রেমধন থাকিলেও হৃদয়ের মলিনতা হেতু উপলব্ধি করিতে না পারায় বাহিরে অন্বেষণ করিয়া থাকে। যত কিছু সাধনভজন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে সকল কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য। সাধনাদি হৃদয়শোধক বা উপযুক্ত দেহ-প্রস্তুত-কারক; কিন্তু প্রেমের জনক বা ভগবৎ-প্রাপক হইতে পারে না। সাধনাদির সহিত প্রেম বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য জনকতা সম্বন্ধ হইলে উঁহাদের নিত্যত্বের হানি হইয়া পড়ে। যদি তত্ত্বাংশে ধরিতে যাও তবে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনি ত তোমার নিকটই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার আর সাধন করিবার প্রয়োজন কি?

প্যারী। তবে কি সাধনের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই?

বাবাজী। আছে বই কি! সাধন কেবল সেবার যোগ্যতা এবং চিত্তের স্বচ্ছতা-সম্পাদক। আর যদি লীলাংশে ধরিতে হয়, তবে ভাবিয়া দেখা দরকার—কৃষ্ণ লম্পট পুরুষ, তুমি যুবতী স্ত্রী; তুমি যদি তাহাকে অন্বেষণ করিতে যাও তোমার স্বধর্ম্ম লোপ পায় না কি? তুমি নানাবিধ বেশভূষণে ভূষিতা হইয়া নিজগৃহে বসিয়া থাক; তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লম্পট পুরুষ কৃষ্ণ আপনিই তোমাকে অন্বেষণ করিবেন। তোমার

হৃদয়ে প্রেমরূপ কস্তুরী বিকাশ পাইলে গন্ধে প্রেমিক কৃষ্ণ-মৃগ আপনিই মাতোয়ারা হইয়া তোমাকে পাইবার জন্য চেষ্টিত হইবে। কৃষ্ণ যখন প্রেমভিখারী, ভাবগ্রাহী, তখন তুমি ভাবভূষণে ভূষিতা হইয়া, অনুরাগের শাড়ী পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে প্রেমকস্তুরীর গন্ধ লেপনকরতঃ বসিয়া থাক—অপ্রাকৃত কলাবিলাসকৌশলাভিজ্ঞতা লাভ করিবার চেষ্টা কর, কৃষ্ণই তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে।

তখন প্যারীবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইলে, বাবাজী মহাশয় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় কি বাবা? পতিতপাবন পরম দয়াল নিতাইচাঁদ আছেন, ভাবিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কৈতব ছাড়িয়া তাঁহাকে ডাক, অভীষ্ট লাভ হইবে।"

প্যারী। আজ্ঞে কৈতব কাহাকে বলে বুঝিতে পারিলাম না।

বাবাজী। কৈতব শব্দের বহু অর্থ, তন্মধ্যে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম), ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতিকেই কৈতব পদে উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার সিদ্ধি এবং মুক্তি এই দুইটাই প্রধান কৈতব অর্থাৎ সিদ্ধিকামী বা মুক্তিকামী ব্যক্তির ভগবদ্ভক্তি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিবে; ভক্তগণ মুক্তিকে প্রার্থনা করা ত দূরের কথা; ভগবান্ দিতে ইচ্ছুক হইলেও গ্রহণ করেন না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ নিতাইচাঁদ দাতাশিরোমণি, অযাচকে দান করিয়া থাকেন, এমন কি, "যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণধরি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি॥" জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেমের ডালি মাথায় করিয়া যেজন 'কে নিবি কে নিবি' ব'লে প্রেমধন দান করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট চাহিয়া বৃত্তি খারাপ করিবার প্রয়োজন কি? তাই বলি কামনা বাসনা

পরিশূন্য হইয়া "নিতাইচাঁদের আদেশ প্রতিপালন কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।"

তখন প্যারীবাবু আনন্দ-বিহ্বলভাবে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম। আমার বহুদিনের সঞ্চিত হৃদয়ের সন্দেহ সকল আজ আপনার কৃপায় দূরীভূত হইল। আমি অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছি; কিন্তু এমন সরল ভাষায় কঠিন কঠিন তত্ত্বের মীমাংসা আর কখনও শুনি নাই। শ্রীচরণে এই প্রার্থনা—যখন একবার দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আর যেন শ্রীচরণ ছাড়া করিবেন না।" এইরূপে নানা কথোপকথনের পর নাম করিতে করিতে স্বদলে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অপূর্ব্ব ঘটনা।

এই সময়কার একদিনের একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বাবাজী যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার নাম **বসন্তকুমার দাস**। পূর্ব্বনিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত চালিতাতলা। আমি একটী ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে হঠযোগাদির উপদেশ গ্রহণ করিয়া নানা দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। ১৩০৪ সনে আমি এবং রাধাকৃষ্ণ দাস নামক আমার একটী গুরুভাই রথযাত্রা দর্শনমানসে শ্রীধাম পুরী আসিয়া নরেন্দ্র সরোবরের তীরে একটী বাড়ীতে আছি। একদিন নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম, একদল লোক সরোবরের তীরে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতেছেন। উঁহারা সাধু, কি সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব আমি তখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। সকলেরই কণ্ঠে তুলসীর মালা, ললাটে হরিমন্দির তিলক এবং কেমন এক রকম নূতন ধরণের বাঁধা চাদরে পা

পর্য্যন্ত ঢাকা সকলেই প্রায় সমবয়স্ক। তন্মধ্যে একটী পুরুষ নাতিস্থূল, নাতিকৃশ এবং অতি দীর্ঘাকার। উঁহাকে দেখিলেই মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর গদগদকণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম গান করিতেছেন। উঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই আমার মনে যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল। ঐ মহাপুরুষটীর প্রতি অঙ্গভঙ্গিই যেন আমার মনপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল—সুধামাখা কণ্ঠস্বরে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। আমি ঠিক্ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মহারাভাবে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া অনিমেষনয়নে ঐ মহাপুরুষটীর ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিতেছিলাম। ক্রমে সংকীর্ত্তন যেমন আমার নিকটবর্ত্তী হইল, অমনি আমি প্রণাম করিবামাত্র ঐ মহাপুরুষও প্রতিপ্রণামপূর্ব্বক আমাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আহা মরি! কি অমিয়মাখা অপ্রাকৃত সংস্পর্শ! কি সুশীতল বক্ষস্থল! স্পর্শ পাইয়াই যেন আমার হৃদয়ের কোটী কোটী জন্মার্জ্জিত তাপ জুড়াইয়া গেল। আমি তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মহাপুরুষটী আমাকে কীর্ত্তনের সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে গেলেন। তথায় বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর সঙ্গিগণকে বাসায় প্রেরণ করিয়া কিছুক্ষণ শ্রীমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে সঙ্গে লইয়া সিংহদ্বারের নিকটবর্ত্তী কোটভোগ মঠে গমন করিলেন। তথায় অনেকগুলি লোক আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহসহকারে একটী ঘরে বসিতে দিলেন। তখন মহাপুরুষটী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম—"আমি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে গোবিন্দদাস মহান্তের আখড়ায় বাস করিতেছিলাম। একদিন আপনি কৃপা করিয়া এ নরাধমকে দর্শন দিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দুর্দ্দৈববশতঃ আপনার গুরুদেবের আশ্রমে গিয়াও আপনার

শ্রীচরণদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। মনে বড়ই আক্ষেপ ছিল। আজ আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া ভক্তিবিশ্বাসহীন এ অধমকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন।" এইরূপ নানা কথোপকথন হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্ষণকালের মধ্যে মঠের অঙ্গনে অনেক জল দাঁড়াইয়া গেল। সেদিন সেই মঠে এই মহাপুরুষের মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ। অন্য ঘরে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃষ্টি থামিলেও অঙ্গণের জল তখনও নিঃসারিত হয় নাই। তখন মহাপুরুষ ঠিক বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—"আমাকে যদি কেহ কোলে করিয়া ঐ ঘরে লইয়া যাইতে পারে, তবে যাইব। নচেৎ জল ভাঙ্গিয়া আমি কিছুতেই যাইতে পারিব না।" আমি অমনি দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"আসুন, আমি কোলে করিয়া লইয়া যাই।" বলিতে না বলিতে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায় আমার গলা ধরিয়া কোলে উঠিলেন। আমিও একটী বালকের ন্যায় অনায়াসে উঁহাকে কোলে লইয়া যাইতে যাইতে অতি বিস্মিতভাবে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, —"কি আশ্চর্য্য! এত বড় বিশাল দেহখানি এত লঘু হইল কিরূপে? ঠিক যেন একটী শোলার পুতুল।" এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতেই একেবারে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এমন কি, তখন উঁহাকে কোলে রাখা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া পড়িল। যদিও পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, একেবারে ঘরের মধ্যেই লইয়া যাইব; কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। কি করি! অগত্যা অতিকষ্টে বারান্দায় নামাইয়া দিলাম। কিন্তু আমার মনে আরও সংশয় উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, "এ কি আশ্চর্য্য! যখন কোলে লইলাম, তখন যেন একটী শোলার পুতুল; আবার দেখিতে দেখিতে একেবারে অচল পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন!

সামান্য মানবে এরূপ অলৌকিক শক্তি কখনই সম্ভবে না। ইঁনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ।" এইরূপ ভাবিতেছি, এই সময় ডাকিলেন,—"এস মহাপ্রসাদ পাইবে।" ডাকিবা মাত্র যেন আমার চমক ভাঙ্গিল। গৃহাভ্যন্তরে গিয়া উঁহার বামপার্শ্বে একখানি পাতায় বসিলাম।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং ঠাকুরের মহাপ্রসাদ উভয়ই রহিয়াছে। মহাপুরুষ ঠাকুরের প্রসাদী ছোলার ডাইল হইতে চারি পাঁচটী লঙ্কা গ্রহণপূর্ব্বক অন্ন মহাপ্রসাদের সঙ্গে সকল রকম জিনিষ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া মিশ্রিত করতঃ উহা হইতে একগ্রাস আমার মুখে দিলেন। বলিতে কি, তৎক্ষণাৎ আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমার সর্ব্ব শরীরে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল—দুইটী চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতে লাগিল। দেখিয়া একটী যোগিনী মাই বলিলেন,—"বাবা! ছেলেটিকে লঙ্কার ঝাল খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলেন?" মহাপুরুষ বলিলেন, "কেন মহাপ্রসাদ যে!" আবার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আহা! বড়ই কষ্ট হইয়াছে? আচ্ছা, ধর, এই গ্রাসটী খাও, ঠাণ্ডা হইবে।" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মাখা মহাপ্রসাদ হইতেই আর একগ্রাস লইয়া আমার মুখে দিবামাত্র মুখ জুড়াইয়া গেল। সর্ব্বশরীর সুশীতল হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন মহাপুরুষ আমার কষ্ট দেখিয়া একগ্রাস মাখন আমার মুখে দিয়াছেন। আহা মরি! কি মধুর আস্বাদন! কি অপূর্ব্ব সুশীতল সংস্পর্শ! কি অপূর্ব্ব আঘ্রাণ! আমার জীবনে এরূপ সুস্বাদু কোন বস্তু আস্বাদন করি নাই যে, তাহার সহিত উহার তুলনা দিতে পারি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! একই বস্তুর সমকালীন দুই ক্রিয়া! একত্র মিশ্রিত মহাপ্রসাদের একগ্রাস অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক—এমন কি স্পর্শ মাত্র সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; ঠিক তাহারই অপর গ্রাস অতিশয় সুস্বাদু ও সুস্নিগ্ধ; স্পর্শমাত্র সর্ব্বশরীর সুশীতল হইয়া গেল! ক্ষণকাল

পূর্ব্বে একই শরীরের দুই অবস্থা অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি আবার এই অপূর্ব্ব ঘটনায় একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমি জীবনে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে বেড়াইয়াছি; কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার আর কুত্রাপি দর্শন বা অনুভব করি নাই। তখন আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, নিশ্চয়ই আমা হেন অবিশ্বাসী মহাপতিত, অভিমানী, জ্ঞানান্ধ জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্যই বোধ হয় মহাপুরুষের এই ভঙ্গি। সেই দিন হইতেই ঐ মহাপুরুষের শ্রীচরণে চিরজীবণের মত আত্মসমর্পণ করিয়া সেই মধুময় সঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম।

কুক্কুরকে উপদেশপ্রদান।

একদিন গঙ্গামাতামঠে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য ইঁহাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত সমাপনপূর্ব্বক সদলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে কীর্ত্তনসমাপ্তি করতঃ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। সমুদ্রস্নান করিয়া বেলা অনুমান দশটার সময় গঙ্গামাতামঠে উপস্থিত হইলেন। মহান্ত মাধবদাস বাবাজী, বিহারীদাস পূজারী প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মা বাবাজী মহাশয়ের সহিত নানারূপ ভগবৎকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা—বাবাজী মহাশয় একটু কীর্ত্তন করেন; কিন্তু বেলা অধিক হওয়ায় কেহই বলিতে সাহস করিতেছেন না। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, এই সময় একটু নামকীর্ত্তন হইলে কাহারও ভজনের ব্যাঘাত হইবে কি?" শুনিয়া মহান্ত মাধব দাস অতি আনন্দের সহিত বলিলেন, "আমরা ঐরূপ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় আপনাকে বলিতে সাহস পাই নাই।"

বলিতেই বাবাজী মহাশয় "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিলেন। ক্রমে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুণগান এবং তৎকৃত গৌরাঙ্গাষ্টকের অর্থ অতি বিশদভাবে ত্রিপদীছন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া মহান্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয় এবং উপস্থিত বৈষ্ণব মণ্ডলী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপভাবে বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইবার পর সকলের অনিচ্ছাসত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন।

এই সময় একটী উড়িষ্যাবাসী পণ্ডিত বাবাজী করযোড়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট বলিতে লাগিলেন, "বাবা! আপনার নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে; কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, এই বাবাজীটী কেবল 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।' সর্ব্বদা এই কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। শাস্ত্রাদি কিছু জানাশুনা নাই; কিন্তু আজ আপনার কীর্ত্তন শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমি অনেক বড় বড় পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও যে গৌরাঙ্গাষ্টকের বিশদ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, আজ আপনার মুখে সুর-তাল-সহযোগে সংকীর্ত্তনে তাহার প্রত্যেক শব্দের অতি সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া নিজেতে পাণ্ডিত্যাভিমান এবং আপনাতে সাধারণবুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ঘোর অভিমানী, ভক্তিহীন পাষণ্ড।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বিনীত-ভাবে বলিতে লাগিলেন—"নিতাই! নিতাই! বাবা! আমি আপনাদের দাসানুদাস। যথার্থই আমি শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না। কাঠের পুতুলের ন্যায় আপনারা যাহা বলান, আমি তাহাই বলি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন নিতাইচাঁদের কৃপায় বৈষ্ণবের চরণে মতি থাকে।" এই ভাবে

নানারূপ কথোপকথনে মহাপ্রসাদ পাইয়া বেলা আন্দাজ তিনটার সময় বাসায় রওনা হইলেন।

ক্রমে হরিশবাবুর নিজবাড়ীর নিকটে আসিয়া দেখেন যে, একটি কাল রংএর মেয়ে-কুকুর রাস্তার মধ্যস্থলে বসিয়া উর্দ্ধমুখে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "বাবা! উহার চারিটী বাচ্চা হইয়াছিল। ও পাড়ার বাবুদের ছেলেরা সব কয়টীই লইয়া গিয়াছে। তাই কাল থেকে কুকুরটা কিছুই খায় নাই; কেবল চীৎকার করিতেছে। তখন বাবাজী মহাশয় কুকুরটীর নিকটে বসিয়া তাহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "মা! সংসারের এই নিয়ম। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান যাহাকে যে মুহূর্ত্তে যেস্থানে পাঠাইবেন, তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সেইস্থানে যাইতেই হইবে। কে কাহার সন্তান? কে কাহার মাতাপিতা? সংসারটী কেবল মায়িক সম্বন্ধমাত্র। মা! পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতিফলে ধামে জন্মগ্রহন করিয়াছ; কিন্তু সেই সুকৃতি এইরূপ অযথাভাবে নষ্ট করা কখনই উচিত নহে। অনেকদিন মায়ার খেলা খেলিলে, আর কেন মা! এইবার নিতাইচাঁদের কৃপা গ্রহণ কর। এখন হইতে সর্ব্বদা নামশ্রবণ, মহাপ্রসাদসেবা ও সাধুসঙ্গে কালযাপন কর। তোমার চারিটী ছেলে গিয়াছে। আমরা এই কত ছেলে আছি। সকলেই তোমাকে মা বলিয়া ডাকিব এবং যত্ন করিব। চল, আমাদের বাসায় চল, মহাপ্রসাদ পাইবে।" বলিয়া বাবাজী মহাশয় রওনা হইলেন।

এতক্ষণ কুক্কুরটী অনিমেষনয়নে বাবাজী মহাশয়ের মুখ পানে তাকাইয়া কথা শুনিতেছিল। যেমন ইনি বলিলেন "আমাদের বাসায় চল, মহাপ্রসাদ পাইবে," অমনি উঠিয়া বাবাজী মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

যাইতে লাগিল। সঙ্গিগণ কুক্কুরটীর বসিবার স্থান হইতে রজ লইয়া মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়ের সহিত বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় দোতলার উপরে উঠিলেন, কুকুরটীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপ্রসাদ আছে কি ?" জয়গোপাল বলিল, "আজ্ঞে আছে"। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "এই নিতাই-দাসীমাকে নীচে লইয়া গিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করাও। এই মায়ের সেবার ভার তোমার উপর রহিল। প্রত্যহ মায়ের অধরামৃত পাইও ; সেবাশক্তি লাভ করিতে পারিবে।" তখন জয়গোপাল নিতাই-দাসীকে নীচে লইয়া গিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করাইল এবং বলিল, "মা ! তুমি এইস্থানে থাকিবে। আমি তোমাকে বৈষ্ণব-অধরামৃত দিব।" সেইদিন হইতেই নিতাই-দাসী বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রহিল এবং ইনি যে যে স্থানে কীর্ত্তনে যাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে যাইত। কেহ কিছু অনিবেদিত বস্তু দিলে কখনই তাহা খাইত না। কোথাও ঠাকুরের আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিলে ঠিক শঙ্খধ্বনির ন্যায় ধ্বনি করিত। বাবাজী মহাশয় হরিবোল বলিলে অমনি নিতাই-দাসী সম্মুখের দুইখানি পা উর্দ্ধে তুলিয়া হো হো করিয়া উচ্চধ্বনি করিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণকুঞ্জ প্রাপ্তি।

পূর্ব্বোক্ত প্যারীবাবু নিজের সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই রহিলেন। একদিন তিনি বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আমার একটী অনাথা ভগিনী আছে, আমি ধর্ম্মতঃ তাহার নিকট ঋণী। যদি অল্প অর্থ ব্যয়ে কোথাও এমন একটী ঠাকুরবাড়ী পাওয়া যায় যে, জীবিতকাল পর্য্যন্ত সে বাস করিবে, জীবনান্তে ঐটী সর্ব্বসাধারণের হইবে, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে আপনার

শ্রীচরণতলে বাস করিয়া সুখী হইতাম।” এইরূপ ভাবে কয়েক দিন যায়, একদিন বলরামবাবু, কুঞ্জবাবু, গোপালবাবু প্রভৃতি সকলেই বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া আছেন, এই সময় **কুঞ্জবিহারী দাস** নামক আন্দাজ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটী বাবাজী আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “আমার একটী মঠ ও ঠাকুরসেবা আছে। আমি আর সেবা চালাইতে পারিতেছিনা। মঠের কিছু সামান্য দেনা আছে, আপনি কোনরূপে ঐ দেনাটা পরিশোধ করিয়া সেবার ভারগ্রহণ করতঃ আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি স্বাধীনভাবে কখনও বা আপনার সঙ্গে কখনও বা বৃন্দাবন বাস করিব। বাবাজীমহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই! তোমার কত টাকা দেনা আছে?”

কুঞ্জ। আজ্ঞে প্রায় আশী টাকা হইবে।

বাবাজী। কাহার নিকট?

কুঞ্জ। ছোট হরিশবাবু উকিলের নিকট।

বাবাজী। আচ্ছা বেশ, আমি ভিক্ষা করিয়া তোমার দেনা পরিশোধ করিয়া দিব। তুমি মঠে থাকিয়া সেবা কর। তোমার গুরুদত্তা সেবা তোমারই রহিবে।

কুঞ্জ। আজ্ঞে বৃন্দাবন যাইবার জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে; অতএব আপনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিন।

বাবাজীমহাশয় প্যারীবাবুকে “প্যারীজী” বলিয়া ডাকিতেন। তাই বলরাম বাবুকে বলিলেন, “বলরাম! প্যারীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যদি তাহার মত হয়, তবে তাহার উপর এই সেবার ভার অর্পণ করিয়া এই বিরক্ত বাবাজীকে বৃন্দাবন পাঠাইবার যোগাড় করিয়া দাও।” আজ্ঞাকারী বলরাম তৎক্ষণাৎ প্যারীবাবুকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলে প্যারীবাবু পরমানন্দে হরিশবাবুর দেনা মিটাইয়া শ্রীশ্রীরাধারমণমঠ

লেখাপড়া করিয়া লইলেন। এ দিকে বাবাজী মহাশয় কুঞ্জদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবাজী মহারাজের আর কে আছে ?"

কুঞ্জদাস। আজ্ঞে আমার গর্ভধারিণী মা আছেন।

বাবাজী। ও! তাই মাকে ছাড়িয়া বিরক্ত হইবার ইচ্ছা! আচ্ছা চল, একবার মাকে দেখিয়া আসি।

বলিয়া কুঞ্জদাস বাবাজীর সঙ্গে যেমন মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি স্নেহের মূর্ত্তি সেই বৃদ্ধা আসিয়া বাহির হইলেন। দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় মা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মা অমনি স্নেহমাখা স্বরে "এস বাবা! প্রভু মঙ্গলে রাখুন" বলিয়া বসিতে আসন দিলেন। এই দিন হইতে মা যেন জগতেরই মা হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহাশয় ঠাকুর দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন। ঠাকুর জীউর নামেই মঠের নাম রাখিলেন **"রাধারমণকুঞ্জ।"** কেহ কেহ বা উহাকে কুঞ্জমঠও বলিত। ক্রমে ঐ স্থানে অনেক প্রকার মহোৎসবাদি হইতে লাগিল।

বালক ভোজন।

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবা সুচারুরূপেই চলিতে লাগিল। ভাস্কর মিশ্র নামক একটী পূজারী রাখা হইল। পূর্ব্বোক্ত কুঞ্জদাস, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই রহিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং পূজারী ঠাকুর মঠবাড়ীতে থাকিয়া সেবা কার্য্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রায় সর্ব্বদাই রাধারমণ কুঞ্জে থাকিতেন। স্থানটী বড়ই মনোরম। যেমন নির্জ্জন তেমনি শান্তিপূর্ণ। একদিন বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন, এই সময়ে কি মনে উদয় হইল। প্রিয় নবদ্বীপকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ নবদ্বীপ! শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর মহাপ্রসাদ

পাইবার জন্য কয়েক মূর্ত্তি আনন্দময় বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আইস'ত।” ইঁহার মুখে এ জাতীয় কথা প্রায় শুনা যায় না। ইনি বলেন, বৈষ্ণব মাত্রেই আনন্দময়, নিষ্কলঙ্ক। আর আজ এইরূপ ভাষা ব্যবহার যে কেন করিলেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। বুড়ো মাকে বলিলেন, “মা! কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণবসেবা হইবে। কিছু বেশী রান্নার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।” মাও সেইরূপ যোগাড় করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ কাছে বসিয়া আছে। বাবাজী মহাশয় বলিলেন “যাও, নবদ্বীপ! বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।”

নবদ্বীপ। নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। কি রকম? এইমাত্র তোমাকে বলা হইল! তুমি কখন নিমন্ত্রণ করিলে?

নবদ্বীপ। আপনার আনন্দময় উদারচরিত বৈষ্ণব আসিলেই ত হইল। আপনি যখনই মনে করিয়াছেন, তখনই নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। কিছু পাতা এবং মিষ্টি চাই। আচ্ছা! নিতাইএর ইচ্ছায় সব যোগাড় হইয়া যাইবে। আজ দুই ভাইএরই মনে মনে কি এক লীলা করবার বাসনা জন্মিয়াছে; তাই দুইজনেই আপন মনে বসিয়া আছেন। বেলা অনুমান দশটার সময় জনৈক ভক্ত অপর দুইটী লোকের সহিত কিছু দুধ, কন্দ,* চারখানা দধি, রসগোল্লা এবং কিছু পাতা লইয়া শ্রীশ্রীরাধারমণকুঞ্জে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিল, “বাবা! আমি আপনার অনুসন্ধানে বড় হরিশবাবুর পুরাতন ডাকঘরে গিয়াছিলাম। সেস্থানে আপনার দর্শন না পাওয়ায় এখানে আসিয়াছি। যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য আপনার ঠাকুরকে ভোগ দিবেন।”

*পুরীতে ব্যবহৃত মিষ্টান্ন বিশেষ।

বাবাজী। বাবা! তোমাকে কেহ কিছু বলিয়াছিল কি?

ভক্ত। আজ্ঞে না, আমাকে কেহ কিছুই বলেন নাই। আমি জগন্নাথ দর্শন করিয়া যেমন সিংহ দরজায় উপস্থিত হইয়াছি, অমনি মনে হইল "কিঞ্চিৎ মিষ্টি আপনার ঠাকুরের জন্য আনিব।" যেমন মিষ্টি আনিতে গিয়াছি, এই গয়লাটী বলিল "বাবু! খালি মিষ্টি দেওয়া কি ভাল? কিছু দধিও দেওয়া উচিত।" আমিও বলিলাম, "আচ্ছা, তোর কয়খানা দধি আছে? এ বলিল, 'চারিখানা।' আমি বলিলাম, 'আচ্ছা' নিয়ে চল্।' ক্রমে আসিতেছি, এই সময় হরি পাট্‌রা নামক একটী কাপড়ের দোকানী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইতেছেন?" আমি বলিলাম, "বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট।" অমনি সে বলিয়া উঠিল, "তবে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই; আপনি এই দুধ, কন্দ ও কলাপাতা কয়খানা তাঁহাকে দিবেন।" আমি বলিলাম, "যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি বলিব?" হরি বলিল, "আর কিছু বলিতে হইবে না। দাসের নামে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া বলিবেন যে নিতাইএর ইচ্ছা হইয়াছে তাই তিনি তাঁহার ভোগের যোগাড় করিয়াছেন।"

নবদ্বীপ দাদা এতক্ষণ নীরবে ছিলেন। হঠাৎ সাশ্রুনয়নে গদগদ-কণ্ঠে বোল শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়া পাগলের ন্যায় নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বেলা অনুমান বারটার সময়ে রাস্তায় খুব নামের রোল উঠিয়াছে শুনিয়া বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া দেখেন, পাগল নবদ্বীপ প্রায় একশত বালকবালিকা সঙ্গে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র ইনি দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক যজ্ঞে ঘৃতাহুতির ন্যায় হাতে তালি দিয়া ঐ নামযজ্ঞে যোগ দিলেন। বালকবালিকাগণ ইঁহার চরিদিকে ঘেরিয়া বোল শ্রীনিত্যানন্দ

বলিয়া নাচিতে লাগিল। একে বালক-কণ্ঠ, তাহাতে আবার প্রেমমাখা। আনন্দসাগর যেন উথলিয়া উঠিল। রাস্তার প্রত্যেক ধূলিকণা যেন নামানন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিল। কাহারও দেহস্মৃতি নাই! বালকবালিকাগণের মধ্যে কেহ বা রজে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ কেহ হাত তুলিয়া নাচিতেছে, কেহ কেহ বা ছুটাছুটি করিয়া নাম করিতেছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্রমে কীর্ত্তন রাধারমণকুঞ্জের সম্মুখে আসিলে, নবদ্বীপ দাদা ও বাবাজী মহাশয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক-বালিকাগণও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিতে নাচিতে গমন করিতে লাগিল। রাধারমণ জীউর অঙ্গনে আসিয়া তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় মত্ত মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে এক একটী বালককে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক যেমন ছাড়িয়া দিতেছেন, অমনি সে বিভোর ভাবে নৃত্য করিতেছে। একজন নয়, দুইজন নয়, প্রায় একশত বালকবালিকা সকলেরই এইরূপ অবস্থা। বালকবালিকাগণ এতই মতিয়া গিয়াছে যে ইঁহারা ইচ্ছা করিয়াও সংকীর্ত্তন বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। বেলা যখন একটা বাজিয়া গেল, তখন বাবাজী মহাশয় সকলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হরি হরি বলরে পিলা" (ছেলে)।

বালকগণ। হরি হরি বলরে পিলা।

বাবাজী। আসরে প্রসাদ পাইব কেসে।

বালকগণ। আসরে প্রসাদ পাইব কেসে।

এইরূপে রসময়বিগ্রহ বাবাজী মহাশয় যাহা বলিতেছেন, বালক বালিকাগণও পরমানন্দে বিভোর হইয়া তাহাই বলিতেছে। তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে সকলকে সারি সারি বসাইয়া পাতা দেওয়া হইলে জয়গোপালকে মহাপ্রসাদ আনিতে বলিলেন। সে রান্নাঘরে গিয়া

দেখে যে আন্দাজ বিশ পঁচিশজনের পরিমাণ মহাপ্রসাদ প্রস্তুত আছে। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করিতেছে, বুঝিতে পারিয়া বাবাজী মহাশয় রান্নাঘরে গমনপূর্ব্বক বলিলেন—"যাও পরিবেশন কর ভয় কি? নিতাইএর ইচ্ছায় ঐ মহাপ্রসাদেই যথেষ্ট হইবে।" এত অল্প মহাপ্রসাদে কিরূপে এত লোকের পূরণ হইবে ভাবিতে ভাবিতে জয়গোপাল একটু সঙ্কুচিতভাবে পরিবেশন করিতে লাগিল দেখিয়া বাবাজী মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন—"ও কি রকম পরিবেশন? বেশ পরিপূর্ণভাবে তাড়াতাড়ি দিয়ে যাও! তুমি আদার ব্যাপারী তোমার জাহাজের খবরে দরকার কি? জমা খরচ হিসাবের জন্য ত আর নিতাই তোমাকে পাঠান নাই? তোমাকে পরিবেশন করিতে দিয়াছেন, তুমি স্বচ্ছন্দে দিয়া যাও!" শুনিয়া জয়গোপাল একটু চঞ্চলভাবে পরিবেশন করিতে লাগিল। ক্রমে প্রায় একশত বালকবালিকা ও দশ বারজন আগন্তুক ভিখারী এবং ইঁহার সঙ্গীও প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন, সকলেই মহাপ্রসাদ পাইল। অবশেষ প্রায় চার-পাঁচজনের পরিমাণ সব রকম মহাপ্রসাদ রহিল। সকলে দেখিয়া অবাক্! তখন বাবাজী মহাশয় জয়গোপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

মহাপ্রসাদ, নাম, বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণে কোনও কার্য্য অসম্ভব মনে করিতে নাই। তোমরা এতই সন্দিগ্ধচিত্ত যে চিন্ময় বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞানে জগতে নিজেদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর। তবে কি তোমরা বলিতে চাও, ঠাকুর খান্ না? যদি বিশ্বাসই না জন্মিল, তবে আর সেবক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়া কেন? বনবাসী হইয়া নির্জ্জনে ভজন করা বরং সহজ; কিন্তু নিতাইচাঁদের সংসারে

থাকিয়া তাঁহাদের কিম্বা তদ্দাসদাসীগণের সেবা করা বড়ই কঠিন। এই সেবাকেই সেবা মনে করিতে হইবে। মানসিক বৃত্তি অনুসারেই লোকের ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।" এই আনন্দময় নিষ্কলঙ্ক সরলহৃদয় বালকবালিকাগণকেই যদি বৈষ্ণববুদ্ধি করিতে না পার—যদি সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ না হয়, তবে আর কাহাকে হইবে? ধামবাসী মনুষ্যের কা কথা—পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। ইহারা ক্ষেত্রবাসী—সকলেই চতুর্ভুজ—সকলেই নারায়ণের সদৃশ। এ বিষয়ে একটী প্রস্তাব শুন—

জনৈক সম্ভ্রান্ত বড়লোক ক্ষেত্রবাস করিতেছিলেন। উহার তিনটী পুত্র। কালক্রমে ভক্ত বড়লোকটীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। দূরদেশস্থ পুত্রগণের আসিতে বিলম্ব হইল। কাজেই ডোমেরা ভক্তটীর মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিল। তিন চারিদিন পরে পুত্রগণ আসিয়া শুনিল "তাঁহাদের পিতাকে ডোমে সৎকার করিয়াছে।" তখন অতি দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিল, "পিতা আমাদের অত বড় নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন; জীবনাবধি প্রবঞ্চনা বা পরের অনিষ্টচেষ্টা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। দয়া, ধর্ম্ম, দান তিতিক্ষা প্রভৃতি যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, সেই মহাপুরুষেরই যখন ঈদৃশী অসদ্গতি হইল, তখন অন্যে পরে কা কথা। তবে আর লোক এত কঠোর করিয়া তীর্থধামে বাস করিবে কেন? আর জগন্নাথ দেখা হইবে না" বলিয়া বিষণ্ণমনে ক্ষেত্রত্যাগ করিয়া দেশে গমন করিতেছে, এই সময় দেখে যে দুইজন ডোম একটী মৃতদেহ লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ একটী ডোমের মাথার চুল খুলিয়া গেল। দুইহাতেই মৃতদেহ ধরা রহিয়াছে; তখন সে ব্যস্তসমস্তভাবে নিজদেহ হইতে অপর দুইখানি হাত বাহির করতঃ চুল বাঁধিয়া আবার দ্বিভুজ হইল। বিষণ্ণমনা বাবুকয়টী

বিস্মিতভাবে পার্শ্বস্থ একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ইহার যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"বাবা! ক্ষেত্রবাসী মনুষ্য কেন, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ। ইহারা সকলেই জগন্নাথের নিত্যপার্ষদ। ধামবাসীদিগকে প্রাকৃতবুদ্ধিতে দেখিলে নরকগামী হইতে হয়। ধামে মৃত ব্যক্তির ভগবৎ-সারূপ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" বৃদ্ধব্রাহ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাবু কয়টীর মনের সন্দেহ দূর হইল এবং পিতার সদ্গতির কথা ভাবিয়া পরমানন্দিতহৃদয়ে পিতৃ-উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয় করিয়া ধামবাসীদিগের প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিল।

এই অভিপ্রায়েই শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ। গৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥" এইরূপ ব্রজবাসিনী গোপীগণ শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহরূপা। গোপগণ শ্রীশ্রীবলদেব জীউর কায়ব্যূহরূপ। কাশীবাসী সকলেই বাবা বিশ্বেশ্বরের সারূপ্যপ্রাপ্ত। ধামমাত্রই অপ্রাকৃত, নিত্য, চিন্ময়বস্তু। ইঁহাকে কখনই প্রপঞ্চের সমান দেখিতে নাই।" এইরূপ বহুবিধ উপদেশামৃতে উপস্থিত জনগণকে পরিসিঞ্চিত করতঃ সকলের অধরামৃত লইয়া নিজে মহামহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন। এদিকে বালক-বালিকাগণ পরমানন্দিতহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বাবাজী মহাশয় বালকবালিকাগণকে লইয়া প্রায়ই এইরূপ আনন্দ করিতেন। ইনি বলিতেন, "বালকগণ নিষ্কপট, দৃঢ়বিশ্বাসী, একনিষ্ঠ, অদোষদর্শী, পরচর্চ্চাবিহীন এবং আনন্দময়। বালকচরিত্র সাধনপথের আদর্শ। বালকের সঙ্গই উচ্চ সাধুসঙ্গ।

—:o:—

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসব।

ভাদ্র মাস—সর্ব্বদাই প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। তবে অন্যান্যদেশ অপেক্ষা শ্রীধাম পুরীতে বৃষ্টির ভাগ কিছু কম। একদিন বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকালে বলরামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বলরামটি যেন গৌরলীলার বাণীনাথ পট্টনায়ক। অফিসে যাওয়া নামমাত্র; সর্ব্বদার তরে বাবাজী মহাশয়ের এবং ইঁহার সঙ্গিগণের আদেশপালনে তৎপর। কেবল বাবাজী মহাশয় বলিয়া নয়; সময় অসময় যাহার যাহা দয়কার, বলরাম তাহার পূরণকারী। কাহারও হুকুম তামিল করিতে বা জুলুম সহ্য করিতে বলরাম প্রফুল্লচিত্ত। সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি বলরামের মুখ কখনই ম্লান নাই। যেমন বাবাজী মহাশয়ের ডাক পড়িল, বলরাম অমনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চরণে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"বলরাম! কাল শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাবতিথি। মহাপ্রভু নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব করিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা যে ভিক্ষা করিয়া উৎসব করা হয়।" বলরাম বলিল,—"যে আজ্ঞে, আপনি বাসায় থাকুন, গোবিন্দদাদা এবং নবদ্বীপদাদাকে লইয়া আমি ভিক্ষায় যাই।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"না, সেরূপ ভিক্ষা হইবে না, নাম লইয়া যাইতে হইবে। চল, এখনই বাহির হওয়া যাক।" বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে দুইখানা খোল এবং দশ বার যোড়া করতাল বাহির হইল। বাবাজী মহাশয়ের কাঁধে ঝোলা—মুখে নাম। আগে আগে নৃত্য করিতে করিতে এক এক দরজায় কিছু সময় অপেক্ষা করতঃ চলিয়া যাইতেছেন। বলরাম বুঝিয়া বুঝিয়া এক এক স্থানে এক একজনকে হরিদাস ঠাকুরের উৎসবের কথা বলিয়া দিবামাত্র কেহ পাঁচ টাকা, কেহ দুই টাকা, কেহ আট আনা,

কেহ চারি আনা, যাহার যেরূপ রুচি ভিক্ষা দিতেছে। সামান্য দূর যাইতে না যাইতেই ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইঁহার ভিক্ষার কঠোর নিয়ম। প্রখর সূর্য্যের কিরণ বা বৃষ্টিধারা অসহ্য হইলেও কোন বারান্দায় উঠিয়া আশ্রয় লইবার আদেশ নাই। খোলের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল, তথাপি বাজনা বন্ধ করিবার যো নাই। এক অদ্ভুত রহস্য! এক এক দরজায় সামান্য সময় অপেক্ষা করিয়া অন্য দরজায় যাইতেছেন, ইত্যবসরে পূর্ব্ববাড়ীর লোক শশব্যস্তে টাকা পয়সা বা চাউল প্রভৃতি লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। এইরূপে ইঁহারা যে পাড়ায় প্রবেশ করিতেছেন, সে পাড়ার লোকও ইঁহাদের সঙ্গে পড়িয়া ভিজিতেছে! ক্রমে বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর হইল, তখন বলরাম এবং অন্যান্য অনেকের অনুরোধে বাসায় ফিরিলেন। ঝোলা নামাইয়া দেখা গেল যে, পঁচাশী টাকা চারি আনা ভিক্ষা হইয়াছে। বলরাম বলিল, "আজ্ঞে আরও প্রায় ত্রিশ চাল্লিশ টাকা হইবার সম্ভব।"

বাবাজী। দেখ, জগন্নাথদেবের এবং সমাধিবাড়ীর তিন প্রভুর ভোগের কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে একটা হিসাব করা দরকার।

বলরাম একখানি কাগজ আনিয়া বলিল,—আজ্ঞে, কিরূপ করিতে হইবে বলুন।

বাবাজী। দেড় শত টাকায় জগন্নাথের ভোগ হইবে, আর পঞ্চাশ টাকায় ঠাকুরদের ভোগ এবং অন্যান্য খরচ হইবে। টাকার জন্য তোমার চিন্তা নাই নিতাইচাঁদ মিলাইবেন।

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া বলরামকে বিদায় দিলেন এবং নিজেরাও যথাসময়ে প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। শিবুদাস নামক জনৈক ভক্ত বিশেষ উদ্যোগী এবং কার্য্যক্ষম ছিল। বাবাজী মহাশয় অনেক সময় বলরামের সাহায্যের নিমিত্ত শিবুকে নিযুক্ত করিতেন। রাত্র

প্রভাত হইতে না হইতে শিবুদাসকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"দেখ শিবু! আজ হরিদাস ঠাকুরের উৎসব। বলরামের সঙ্গে থাকিয়া যাহাতে কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহা করিবে। আর যাবতীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলী নিমন্ত্রণ করিবে এবং সমাজবাড়ীর তিন প্রভুর ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়েও যাহা যাহা প্রয়োজন বোধ কর করিবে।" আজ্ঞা পাইয়া শিবু পরমানন্দে সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন লইয়া কাছারির রাস্তায় বাহির হইলেন। ক্রমে বহু লোক আসিয়া সঙ্গে জুটিতে লাগিল।

ভাদ্রমাস - শুক্লা চতুর্দ্দশী। চাঁদের আলোকে সমুদ্র উছলিয়া উঠিয়া যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এক একবার উত্তাল তরঙ্গমালায় উপকূলবর্ত্তী ভূমিসকলকে প্লাবিত করতঃ স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে। আহা মরি! তৎকালে সমুদ্র কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! তীর জনতাশূন্য—চারিদিক্ নিস্তব্ধ। এক একবার কেবল প্রাণমাতান হৃদয়গলান উচ্ছ্বাসময় তরঙ্গধ্বনিতে দিক সকলকে মুখরিত করিতেছে। এই সময় ইঁহারা প্রায় তিনশত লোক খোল করতাল নিশান খুন্তিসহ "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিয়া নাচিতে নাচিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে চাঁদের আলো, তাহাতে আবার চারিদিকে দেউটী জ্বলিতেছে; সে এক অপূর্ব্ব শোভা! বাবাজী মহাশয়ের মনে আজ যেন কেমন এক-প্রকার নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে কি যেন অতীতের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় হৃদয়খানি উচ্ছলিত করিয়া তুলিতেছে। সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণের মধ্যে বিরহ তরঙ্গ উছলিয়া উঠিয়া হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করতঃ দুইটী নয়নপ্রণালী দ্বারা শত শত ধারে বহির্গত হইতেছে। সেই আর্ত্তি, সেই ব্যাকুলতা, সেই কান্না শুনিলে

পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "বাবাজী মহাশয় নামরূপে বর্ত্তমান করতঃ লীলা আস্বাদন করিয়া থাকেন। যেথানেই গমন করেন, সপরিবারে মহাপ্রভুকে অগ্রে করিয়া যাইয়া থাকেন।" আজও তাহাই হইল। ইনি দেখিতেছেন যেন শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন এবং ইঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন। হরিদাসের বিরহে মহাপ্রভু ব্যাকুল—পরিকরগণ অধীর। তদ্দর্শনে ইঁহারও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হরিদাসের সঙ্গসুখ স্মরণে মহাপ্রভুর বদনকমল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে ইনিও কাঁদিয়া অধীর। আহা মরি কি মনোরম দৃশ্য! কি চিত্তাকর্ষক ভাব! কি প্রাণগলান ব্যাকুলতা! কি শ্রুতিমনোহর কীর্ত্তনধ্বনি! কি নয়নরঞ্জক নৃত্যভঙ্গি! কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রভাব! প্রায় তিন শত লোক সমান ভাবে ইঁহাকে দেখিতেছে ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছে। সকলেই আত্মবিস্মৃত—সকলেই যেন সেই অপ্রাকৃত নিত্যচিন্ময় রাজ্যে বাস করিতেছে।

ক্রমে ইঁহারা সমাধিবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয় বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে চরিতামৃতোক্ত হরিদাসের নির্য্যাণকথা গান করিতে লাগিলেন। বহুলোকসমাগম হইল। রাত্রি প্রায় নয়টার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলে পঙ্গত আরম্ভ হইল। অবারিতদ্বার—যে আসিতেছে, সেই মহাপ্রসাদ পাইতেছে। বালুকাময় নির্জ্জন সমুদ্রতীর আজ বহুজনসমাকীর্ণ আনন্দময় স্থান হইল। আহূত, অনাহূত, আগন্তুক দুঃখী কাঙ্গালী সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ-সঙ্গে বাবাজী মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। শিবুদাস ও বলরাম পরিবেশন করিতে লাগিল। আহা মরি! সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ!

সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ বা নিতাইগুণ, কেহ বা গৌরাঙ্গগুণ বর্ণন করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার বাবাজী মহাশয় জলদগম্ভীর নিনাদে দিক্‌সকল কম্পিত করিয়া এক একটী ধ্বনি বলিতেছেন, আর সকলে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নিতাই গৌরাঙ্গের জয় দিতেছে। এইরূপ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া বাবাজী মহাশয় অনতিদূরবর্ত্তী একটী স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে বলিলেন, "আমি এমন সুখময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর বাসায় যাইব না।" শুনিয়া গোবিন্দদাদা বাবাজী মহাশয়ের শয়নের জন্য একটী স্থানে বালুকার দ্বারা মাথার-বালিশ, পাশবালিশ ও পায়ের বালিশ প্রস্তুত করিয়া নিজের চাদরখানি তাহার উপর বিছাইয়া দিলেন। তদুপরি বাবাজী মহাশয় শয়ন করিলে চারিদিকে সকলে বসিয়া কেহ হাত কেহ চরণ কেহ কটিকক্ষ প্রভৃতি চাপিতে লাগিলেন। অপরাপর সঙ্গিগণ নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বালুকার গর্ত্ত করিয়া এক একজনকে তাহার মধ্যে বসাইয়া কণ্ঠপর্য্যন্ত বালুকায় প্রোথিত করিতেছেন। কেহ বা কাহাকে বালুকার উপর শয়ন করাইয়া বালুকা চাপা দিতেছেন। এইরূপে রাত্র প্রায় শেষ হইলে সকলেই কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রভাতে সমুদ্রস্নান করিয়া নাম করিতে করিতে বাসায় আসিলেন।

নগরকীর্ত্তনে গোপালবাবু।

একদিন বেলা আটটার সময় বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে নগর-কীর্ত্তন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতে বলিয়া পোষ্টঅফিসের হেডক্লার্ক গোপালবাবুর বাসায় চলিয়া গেলেন। সঙ্গিগণ বাসা হইতে নাম ধরিয়া গোপালবাবুর বাসায় আসিলেন। অঙ্গনে সংকীর্ত্তন হইতেছে, এদিকে

গোপালবাবু নবদ্বীপদাদাকে বলিলেন, "দাদা! আজ আমার একটু সকালেই অফিসে যাইতে হইবে; বিশেষ প্রয়োজন আছে; অতএব আমি আর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিব না।" নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "তবে তুমি কীর্ত্তনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অফিসে যাও। আমরা নগরকীর্ত্তনে বাহির হইব।" গোপালবাবু অফিসের পোষাক পরিয়া কীর্ত্তনে প্রণাম করিতে যাইবামাত্র বাবাজী মহাশয় জয়গোপালের নিকট হইতে খোলখানি লইয়া উহার গলায় দিলেন। গোপালবাবুও অবিচারে খোল বাজাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তন নগরে বাহির হইল। সঙ্গীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "গোপালবাবুর পোষ্টঅফিসের চাকুরী, না গেলে কিছুতেই চলিবেনা; কোনরূপ কৌশলে উহার নিকট হইতে খোল নিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" গোপালবাবুর খোল বাজনায় বাবাজী মহাশয় বড়ই সুখ পাইতেন; কাজেই কীর্ত্তনের সময় গোপালবাবুকে নিজের নিকটে রাখিতেন। আজও তাহাই হইল; কাজেই সঙ্গিগণের যুক্তি বিফল হইল। বেলাও যেমন বাড়িতে লাগিল, কীর্ত্তনানন্দও তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ইঁহারা শ্রীমন্দিরের বাহির পরিক্রমা করিয়া হরচণ্ডিসাই প্রবেশ করিলেন।

এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে কেবল জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাদিগের বসতি। এরূপ মাতামাতি কীর্ত্তন হইতেছে যে, পাণ্ডাগণ কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ দন্তকাষ্ঠ হাতে করিয়া, কেহ বা তৈল মাখিতে মাখিতেই আসিয়া নাচিতে লাগিলেন। সকলেই যেন আত্মহারা—সকলেই যেন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, সকলেই ভাবে বিভোর। আনন্দের অবধি নাই! কীর্ত্তনের ধ্বনি একবার যাহার কর্ণগোচর হইতেছে, সেই উধাও হইয়া আসিয়া যোগ দিতেছে। কীর্ত্তনের আগে আগে একদল বালক নানারূপ রঙ্গভঙ্গ করিয়া নৃত্য করিতেছে। ক্রমে

টোটাগোপীনাথ এবং হরিদাস ঠাকুরের সমাধিবাড়ী দর্শনপূর্ব্বক কাছারির রাস্তায় পোষ্ট অফিসের নিকট দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে একেবারে বাসায় পৌছিলেন। সঙ্গে বহুলোক, সকলেই ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। সকলেই প্রেমে বিভোর। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় সকলের শ্রম জানিয়াই যেন কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। তখন গোপালবাবু খোল রাখিয়া দণ্ডবৎ করিলে বাবাজী মহাশয় চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপাল! তোমার আজ অফিস নাই?

গোপাল। আজ্ঞে আছে বই কি!

বাবাজী। বেলা কত?

গোপাল। আজ্ঞে একটা বাজিয়া গিয়াছে।

বাবাজী। এত বেলা হইয়াছে, অফিসে যাওয়া হয় নাই! অনিষ্ট হইবে নাকি?

গোপাল। আজ্ঞে আপনি জানেন।

বাবাজী। তোমার কয়টার সময় যাইতে হয়?

গোপাল। আজ্ঞে দশটার সময়। আবার কোন কোন দিন সকাল বেলায়ও যাইতে হয়। আজ আমার নয়টার সময় যাইবার কথা ছিল।

বাবাজী মহাশয় একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা নিতাইএর ইচ্ছায় তোমার আজ আর অফিসে যাইবার প্রয়োজন নাই।" সঙ্গিগণ কেহ কেহ বলিলেন, "পোষ্ট অফিসের কাজ—চাকরিত থাকিবেই না; উপরন্তু জরিমানা না হয়।" গোপালবাবু নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলেন। সকলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। গোপালবাবুও বাসায় চলিয়া গেলেন। সে দিন এইরূপভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিবস গোপালবাবু যথাসময়ে অফিসে গিয়া নিজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসাও করিতেছে না, ইনিও কিছু

বলিতেছেন না; কেবল পোষ্টমাষ্টারবাবু বাবাজী মহাশয়কে প্রশংসা করিতেছেন। গোপালবাবুও মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। ক্রমে কার্য্য শেষ হইয়া গেল। হাজিরাখাতায় যখন নামসহি করিতে হইবে, তখন গোপালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, "কাল নিশ্চয়ই বাবাজী মহাশয় আমার জন্য কষ্ট করিয়াছেন। তাহা না হইলে কাল অফিসে না আসার দরুণ পোষ্টমাষ্টারবাবু কিম্বা অন্যান্য কেহই আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না কেন? তবেই বুঝা গেল, আমার হইয়া বাবাজী মহাশয় অফিসে আসিয়াছিলেন। যাক্ যখন কেহ কিছু জিজ্ঞাসাই করিতেছে না, তখন কালিকার হাজিরা সহি করিয়া যাই, পরে প্রভু যাহা করিবেন তাহাই হইবে।" ভাবিয়া সহি করিলেন। ছুটির পর প্রথমেই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যের সকল অভীষ্ট পূরণ হইতে পারে, তবে কি সামান্য একটু অফিসের কার্য্য চলিতে পারিবে না? আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাই আমরা ফল পাই না। যাবতীয় সাধনভজনের মূলই বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" গোপালবাবু সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাদের জন্য যে আপনাকে কতই কষ্ট পাইতে হইতেছে ও হইবে তাহার সীমা নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় পাই। আমি কোন সাধনভজন জানি না। তাহাতেই এত দয়া। দয়াময়! যদি ভজিতাম না জানি কি হইত।" বলিয়া চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে সঙ্গিগণ প্রেমানন্দে "**জয় নিত্যানন্দ রাম**" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সখী বেশ।

বাবাজী মহাশয় একদিন রাধারমণ কুঞ্জে বসিয়া আছেন। গোবিন্দদাদা, নবদ্বীপদাদা, প্যারীবাবু, জয়গোপাল, কিশোরী গোপাল, অদ্বৈতদাস, রাধাবিনোদ, কুঞ্জবাবু, গোপালবাবু প্রভৃতি দশ পনের জন ইঁহার চারিদিকে বসিয়া নানারূপ উপাসনাতত্ত্ব শ্রবণ করিতেছে। গোবিন্দদাদা, প্যারীবাবু, রাধাবিনোদ, অদ্বৈতদাস, জয়গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন প্রায় সর্ব্বদার তরে চাদর গায়ে বাঁধিয়া একভাগ মাথার উপর দিয়া থাকিত। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্পবয়স্ক। যত্তপি গোবিন্দদাদা ও প্যারীবাবু একটু পরিণতবয়স্ক, তথাপি ভাবে ঠিক বালকবৎ; ব্যবহারও তদ্রূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চৈতন্য দাসের সেবা শুশ্রূষা করার দরুণ তাঁহার কৃপাপ্রভাবে জয়গোপাল সেবাপ্রিয়। জয়গোপাল ছেলে মানুষ হইলেও তাহার উপর রান্না, পরিবেশন এবং বাবাজী মহাশয়ের সেবার ভার দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দদাদা ও নবদ্বীপদাদা এই দুই জনেই সর্ব্বদা উহাকে শক্তিসঞ্চার করতঃ সেবা শিক্ষা প্রদান এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবার আনুকুল্য করিয়া থাকেন। এমন কি নবদ্বীপদাদা নিজে সেবা গ্রহণ করিয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রাণের প্রাণ বাবাজী মহাশয় কিরূপ সেবায় সুখী হইবেন, কোন্ কোন্ সময় তাঁহার কি কি সেবা প্রয়োজন, তিনি কি কি ভাব ভালবাসেন ইত্যাদি হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জয়গোপাল তত কীর্ত্তনপ্রিয় নহে; উহার কেবল সেবার প্রতি লক্ষ্য। উহার মনের ভাব সর্ব্বদা ঘরে থাকিয়া সেবার কার্য্য করে। বাবাজী মহাশয়কে দেখা অবধি জনিনা উহার মনের মধ্যে কি ভাব; কিন্তু কখনও মুখ তুলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চোখের দিকে

তাকাইতে পারে না বা কোনও কথা বলে না। উহার সম্বলের মধ্যে কেবল চোখের জল। কথায় কথায় কান্না। কখনও বাবাজী মহাশয় হাত ধরিয়া কাছে ডাকিলে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি মৃদুস্বরে দুই একটী কথা বলিয়া দূরে চলিয়া যায়। উহার যত কিছু আব্দার গোবিন্দদাদা ও নবদ্বীপদাদার উপর।

বেলা প্রায় নয়টা, এই সময় **মাধব পশুপালক** (জগন্নাথ-দেবের শিঙ্গারী পাণ্ডা) জগন্নাথের চরণতুলসী, কণ্ঠমালা ও অবকাশজল* লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই শশব্যস্তে উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। চরণতুলসী ও কণ্ঠ-মালা বাবাজী মহাশয়কে দিলে ইনি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। জয়গোপাল বাতাস করিতেছিল। মাধব পশুপালক বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন আমি যখনই ইহাদিগকে দেখি, তখনই যেন আমার বোধ হয়, ইহারা ব্রজের সখী। বলিতে কি, একদিন জগমোহনে কীর্ত্তনের মধ্যে ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিল, আমি সকাল ধূপের পূজা করিবার সময় দেখিলাম যেন ইহাদের ঘাঘরা পরা। মনে ভাবিলাম, আজ বাবাজী মহাশয় বোধ হয় ইহাদিগকে সখী সাজাইয়া আনিয়াছেন। আহা কি সুন্দর ভাব! যেমন মনে করিয়াছি, অমনি জগন্নাথের কণ্ঠমালাগাছটী খসিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইহার ভিতর কোন অপূর্ব্ব রহস্য আছে। ভোগের পর ঐ মালাগাছটী আপনাকে আনিয়া দিলে আপনি কিছুসময় গলায় রাখিয়া এই ছেলেটিই হউক বা ঠিক এইরকম অন্য একটি ছেলের হাতে দিলেন। সে দিন আপনাকে একথা বলিতে পারিলাম না। আজ সেই কথাটি বলিব

*স্নানজল।

বলিয়াই আসিয়াছি॥” তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “আপনারা জগন্নাথদেবের অন্তরঙ্গা সখী। আপনাদের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আপনি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক।” বলিয়া জয়গোপালকে ইসারা করিলে সেও উঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করায় তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, “জগন্নাথ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।” ক্রমে সকলেই প্রণাম করিলে সকলকেই ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় একটী ছেলেকে বলিলেন, “খোল করতাল লইয়া আইস, আজ রাধারমণজীউর মধ্যাহ্ন-লীলা গান হইবে।” তখনই খোল করতাল আসিল। কুঞ্জবাবুকে বলিলেন, “কুঞ্জ! গোষ্ঠ গাণ করত।” কুঞ্জবাবু গান ধরিলেন, এদিকে শ্রীরাধারমণজীউর গোষ্ঠবেশ হইল। গোষ্ঠে গমন কীর্ত্তন হইতেছে; যেমন শ্রীমতী তুঙ্গমণি মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন, এই পদ কীর্ত্তন হইতে লাগিল, অমনি জয়গোপাল শ্রীমতীকে একখানি চৌকির উপর বসাইয়া সকলের ভাবোদ্দীপন করিতে লাগিল। কীর্ত্তনে যেমন যেমন ভাব বর্ণনা হইতে লাগিল, ঠাকুরের ঠিক তেমনি তেমনি বেশ-ভূষাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। যেন লীলা প্রকট হইয়াছে—তৎসহচর-সহচরীগণ কীর্ত্তন নর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে রাধাকুণ্ড মিলন হইল। রাধারাণী বামে বসিলেন, জয়গোপাল ও অদ্বৈতদাস দুইপার্শে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রাধাবিনোদ, কিশোরীগোপাল ও অন্যান্য চারি পাঁচ জন নৃত্য করিতেছে। বাবাজী মহাশয় রাধাকুণ্ডের বর্ণনা ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই। সকলেই আত্মহারা—সকলেই উন্মত্তভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছে। কে কোথায় পড়িতেছে, কে কোথায় ভাবে গড়াগড়ি দিতেছে ঠিক নাই। জয়গোপাল রাধারমণজীউর ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাতাস

করিতেছে আর অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছে। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিনী অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় যেমন উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি চারিদিকে উলুধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে জয়গোপাল রাধারমণজীউর নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অদ্বৈত প্রভৃতি নানারূপ সন্তর্পণে চৈতন্য করিতে না পারিয়া একটু ভাবিত হইল। এই সময় বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে রাধারমণজিউর নিকট গিয়া যেমন উহার কর্ণে কি মন্ত্র প্রদান করিলেন, অমনি চৈতন্য লাভ করতঃ শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় বাহিরে আসিয়া আবার কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব কীর্ত্তন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন লোক একখানি সাড়ী নবদ্বীপদাদার হাতে দিয়া বলিল, আপনাদের নাকি একখানি সাড়ীর দরকার? কে পরিবে, তাই আমি লইয়া আসিলাম।" শুনিয়া সকলে অবাক্। নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়কে সাড়ীখানি দেখাইলে ইনি একটু মাথায় ছোঁয়াইয়া নবদ্বীপকে ইসারা করিলেন; নবদ্বীপও সাড়ীখানি রাধারাণীর প্রসাদী করতঃ বাবাজী মহাশয়ের চাদরের উপর পরাইয়া মাথায় দিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ "জয় রাধে জয় রাধে" বলিয়া নাচিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের অঙ্গে পুলক; আরক্তিম নয়নযুগল হইতে জলধারা বহিয়া গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভাবগদগদ কণ্ঠে কত কি প্রার্থনা করিতেছেন। সঙ্গিগণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, আর বাবাজী মহাশয়ের সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইনি কীর্ত্তনে আরও অনেকবার সাড়ী পরিয়াছেন; কিন্তু এমন অপরূপ রূপ আর কখনও হয় নাই। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! যেন বাবাজী মহাশয়ের মূর্ত্তি বলিয়াই কেহ স্থির

করিতে পারিতেছেন না। বহুক্ষণ পরে বেলা আন্দাজ সাড়ে বারটার সময় কীর্ত্তন শেষ করতঃ সাড়ীখানি নবদ্বীপের হাতে দিয়া কি বলিলেন। নবদ্বীপ ঘরে গিয়া জয়গোপালকে সাড়ীখানি পরাইয়া দিলেন। কেহ কেহ উহার হাতে তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। তখন নবদ্বীপ উহার হাত ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলে ইনি ভাবগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রাধারাণীর কৃপাদত্ত বস্তু যত্নে রাখিও; আনন্দ পাইবে। আমার ভাগ্যে হইল না; প্রভু তোমাদিগকে কৃপা করিলেন সুখের বিষয়। কেবল বেশ করিলেই হইবে না। বেশোচিত কার্য্য করা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার করিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্ম-সুখ-বিবর্জ্জিত নিষ্কাম ব্রজগোপীদিগের ভাব, স্বভাব, ইচ্ছা ও অহঙ্কারের আনুগত্যে হৃদয় গঠিত করিয়া সাধন করিতে পারিলে তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সর্ব্বদা দাসীভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ-রূপে তদ্‌যোগ্য আচরণ করা প্রয়োজন। ভাবানুযায়ী স্বভাব গঠিত করিতে না পারিলে ভাব স্থায়ী হওয়া কঠিন। স্বভাব গঠন করিবার প্রধান উপায় সেবা অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তির কায়িক, বাচিক ও মানসিক রূপে, প্রাণিমাত্রে শ্রীগুরুর প্রকাশ জ্ঞানে, বৈষ্ণব কৃষ্ণ অভিন্নবোধে অবিচারে সেবা করিতে পারিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।" ইত্যাদি বহুপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি নাম রাখা হইবে?

বাবাজী। তোমাদের সকলের কি ইচ্ছা বল।

নবদ্বীপ। আমার ইচ্ছা—"**ললিতা দাসী**"।

সকলেই নবদ্বীপ দাদার কথায় সম্মতি প্রদান করিলে বাবাজী মহাশয়ও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই হইতেই ললিতা দাসীকে কেহ সখী বাবাজী, কেহ বৌ বাবাজী, কেহ দিদি, কেহ মা ইত্যাদি আপন

আপন ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়, নবদ্বীপ দাদা, গোবিন্দ দাদা প্রভৃতি যাহাতে ইহার ভাবের পুষ্টি হয়, সর্ব্বদা তদনুকুলে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

কালা কুঞ্জদাস।

একদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক পঞ্চতীর্থ স্নান করিবার মানসে সঙ্গিগণসমভিব্যাহারে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথদেবের বাহির পরিক্রমা করিয়া মার্কণ্ডেয় সরোবরে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, কোন স্থানে যাইতে হইলেই সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রে করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। আজও তাহাই হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপদামোদরের নিকট মার্কণ্ডেয় সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন, বাবাজী মহাশয় ভাবাবেশে এইরূপভাবে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর স্নান করিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক রোহিণীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া বটকৃষ্ণ এবং জগন্নাথ দর্শন করতঃ সমুদ্রে চলিলেন। ভাবাবেশে মহাপ্রভু যমুনাভ্রমে সমুদ্রে স্নান করিতে যাইতেছেন, এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্র স্নান করিয়া চক্রতীর্থ গমন করিলেন। সে স্থানেও মহাপ্রভু ভক্তগণকে চক্রতীর্থের বিবরণ বলিতেছেন, এই ভাবের পদ গান করিয়া তথায় স্নান করতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন করিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় রামানন্দ রায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, এইরূপভাবে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে তথায় স্নান করিয়া পুনরায় জগন্নাথদর্শনে রওনা হইলেন।

আজ লালাবাবুর ছত্রের ম্যানেজার প্যারীবাবু ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ

পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইঁহারা জগন্নাথ দর্শন করিয়া বেলা অনুমান দশটার সময় লালাবাবুর ছত্রে উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন শুনিবার জন্য বহুলোক অপেক্ষা করিতেছিল। কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥" এই পদ ধরিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর—সকলেই আত্মহারা ভাবে নৃত্য করিতেছে। এই সময় অনুমান ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটী ভাগলপুরী ব্রাহ্মণ আসিয়া কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণটি বড়ই রুগ্ন। উঁহার দক্ষিণহস্তে একগাছি লাঠি, বামহস্তে একটী ঘটী ও কাঁধে একখানি কম্বল। ব্রাহ্মণটী এমন বিভোরভাবে নাচিতে লাগিলেন যে, ঘটী কম্বল পড়িয়া গেল—হুঁস নাই। অবিরতধারে দুইটী চোখের ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভাবগতিকে বুঝা গেল যে, ব্রাহ্মণটীর শ্রবণশক্তি কিছু কম। কিছুক্ষণ অবিশ্রান্তভাবে নাচিতে নাচিতে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন সকলে উঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইতেছে না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "উহার কাণে নাম শুনাও।" অমনি একজন অতি উচ্চৈঃস্বরে উহার কাণে নাম শুনাইতে লাগিলেন। এই সময় প্যারীবাবু বলিলেন, "ও লোকটী আজ কয়দিন হইতে এখানে আছে। ও একেবারে বধির, এমন কি উহার কাণের কাছে ঢাক পিটিলেও শুনিতে পায় না। নাম শুনাইলে কি হইবে?" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় ব্রাহ্মণের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক উহার বুকের উপর বামহস্ত দিয়া যেমন **"জয় নিতাই"** বলিলেন, অমনি উহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন বাবাজী মহাশয় উহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। এক একটী মন্ত্রাত্মক বর্ণ ব্রাহ্মণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,

আর উঁহার দেহ কম্পিত হইতেছে। ক্রমে উঁহার চোখ মুখ প্রফুল্ল হইতে লাগিল। মন্ত্র দেওয়া শেষ হইবামাত্র ব্রাহ্মণ অতি বিস্মিতভাবে "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। উঁহার মুখে নিতাই নাম শুনিয়া সকলেই অবাক্! বাবাজী মহাশয় আলিঙ্গন করিবামাত্র ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"গুরুজী! ঔর একদফে বোল দিজীয়ে, দো এক বাত পাশর গইল বা।" শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র শুনিতে পাইয়াছেন। বাবাজী মহাশয় আর একবার উঁহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। ক্রমে কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলেই মহা-প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ব্রাহ্মণটীকে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অসম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক করযোড়ে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া অবিরতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে ব্রাহ্মণটী বাবাজী মহাশয়ের পাতায় গিয়া বসিলেন। উঁহার ভক্তিবিশ্বাস দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত! এই হইতে ব্রাহ্মণটী ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিলেন। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দি লেখাপড়া জানিতেন। উঁহার পূর্ব্বনাম কুমার পাঁড়ে। কিছু-দিন পরে বাবাজী মহাশয় উঁহাকে ভেক দিয়া নাম দিলেন **কুঞ্জদাস**। ক্রমে উঁহার অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়া উঁহাকে জগন্নাথদেবের মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিলেন। সকলে উঁহাকে "কালা কুঞ্জদাস" বলিয়া ডাকিত। কালা কুঞ্জদাস অবকাশ পাইলেই গুরুদেবের চরণসেবা, বাতাস-করা প্রভৃতি কোন না কোন সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কোন কোন দিন রাত্রি ভোর হইয়া যাইত, তবু সেবা ছাড়িয়া নিদ্রা যাইতেন না। গুরু-সেবায় ওরূপ নিষ্ঠা প্রায়ই দেখা যায় না।

রাসকীর্ত্তন।

একদিন বাবাজী মহাশয় রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় সঙ্গিগণকে বলিলেন,—"আজ সকলকেই সখীবেশ ধারণ করিয়া রাসকীর্ত্তন করিতে হইবে।" ইঁহার আদেশক্রমে গোবিন্দদাস ও ললিতাদাসী রাধাবিনোদকে রাধারাণী এবং করুণাকর দাসকে কৃষ্ণ সাজাইলেন। গোপালবাবু, কুঞ্জবাবু, বলরামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্র এবং বাবাজীগণ ললিতাদাসীর সাড়ী পরিয়া এবং কেহ কেহ বা নিজ নিজ চাদর বাঁধিয়া গোপীবেশ ধারণ করিলেন। বাবাজী মহাশয়কেও সাড়ী পরাইয়া গোপী সাজান হইল। শীতল দাস সর্ব্বদা সখ্যরসে নিমগ্ন। সে কিছুতেই স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে স্বীকৃত হইল না। বাবাজী মহাশয় শীতলের রসনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য একজনকে বলিলেন, "উহাকে জোর করিয়া সাড়ী পরাইয়া দাও; নতুবা রাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" শীতল বলিল—"আমি কখনই মেয়ে হইব না। ইহাতে কৃষ্ণ পাই আর নাই পাই," গোবিন্দদাদা যেমন বলিলেন, "জোর করিয়া সাড়ী পরাইয়া দিব," অমনি সে ভয়ে পলাইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় উহার রসনিষ্ঠা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন।

এদিকে অভিসার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় "জয় জয় জয় বিজয়ি কুঞ্জে কুঞ্জরবর গামিনী" এই পদ গানে রাধাগোবিন্দ মিলন করাইয়া রাসকীর্ত্তন ধরিলেন। রাধাগোবিন্দ এবং সখী-বেশধারী বাবাজীগণ কীর্ত্তনের ভাবানুযায়ী হাবভাব প্রকাশ করিয়া বাবাজী মহাশয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নৃত্যরাসের পদ গান আরম্ভ হইলে সকলেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। কে বলিবে নিত্যলীলা প্রকট নহে? হৃদয়ে গোপীভাব স্ফূর্ত্তি হওয়ায় সকলেই অশ্রুকম্পপুলকাদি

সাত্বিক ভূষণে বিভূষিত। আহা মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বাবাজী মহাশয় যূথেশ্বরী এবং সঙ্গিগণ ইঁহার অনুগতা গোপী হইয়াছেন। কেহ চামর, কেহ ব্যজন, কেহ বা তাম্বুল সেবা করিবার মানসে যূথেশ্বরীর মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। সময়ানুরূপ সেবার আদেশ পাইয়া সকলেই নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। সখীগণ পণবদ্ধ নৃত্যকৌশলে কৃষ্ণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার চূড়া-বাঁশী কাড়িয়া লইলে কৃষ্ণচন্দ্র আবার ছলে বলে কৌশলে নিজের দম্ভ বজায় রাখিতেছেন। তখন সখীগণ দুই দল হইয়া কীর্ত্তনে স্ব স্ব দলপুষ্টি করিতেছেন। বিশাখার যূথের গোপীগণ শ্যাম-সুন্দরের গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া রাধিকার পক্ষাবলম্বিনী ললিতার যূথের গোপীগণকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; আবার ললিতার যূথের গোপীগণ শ্রীমতীরাধিকার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণপক্ষাবলম্বিনী বিশাখার যূথের গোপীগণকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কেহই সহজে হা'র মানিবার নহেন। অবশেষে একদল "রাই জয় জয় রাধে রাধে" এবং অপর দল "শ্যাম জয় জয় রাধে রাধে" বলিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদ-আনন্দ চলিতে লাগিল। তখন বাবাজী মহাশয় পদে দুই দল একত্র করতঃ "জয় রাধা রাধারমন" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইঁহারাও সকলে সেই ভাবেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। কার সাধ্য সেই আনন্দের কথা ভাষায় বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দেয়? সেই লীলামাধুরী, সেই কীর্ত্তনানন্দ, সেই কলাকৌশলভঙ্গি, সেই ভাবপ্রেম কেবল অনুভবগম্য এবং কৃপাময় কৃপা করিয়া যাহাকে সেই লীলায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন, তাহারই প্রত্যক্ষগোচর।

এইরূপ পরমানন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে বাবাজী মহাশয় নিজ শয়নগৃহখানিকে নিভৃত নিকুঞ্জ কল্পনা করতঃ উহার মধ্যেই

রাধাগোবিন্দকে প্রবেশ করাইয়া অন্যান্য সকলে সেই রাসমণ্ডলীতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিঞ্চৎ কাল পরেই আবার কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। পাছে সূর্য্যোদয় হইলে রসভঙ্গ হয়, এই ভয়ে চারিদিকের কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কুঞ্জভঙ্গের পর কৃষ্ণকে নন্দালয়ে এবং শ্রীমতীকে যাবটে পাঠাইয়া কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। তখনও যেন সকলের সেই অপ্রাকৃত আনন্দের নেশার ঘোর ছোটে নাই। সকলেই বাহ্যস্মৃতি-রহিত। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আহা! এত অল্প সময়ের মধ্যেই রাত্রি শেষ হইয়া গেল! আশা মিটিল না—মন তৃপ্তি হইল না। ভগবান্ যদি এই রাত্রিটা আর একটু বড় করিতেন, তবে বোধ হয় আশা মিটাইয়া আনন্দ উপভোগ করা যাইত। কি আশ্চর্য্য! এক একদিন যেন রাত্রি শেষ হইতে চায় না; আর আজ যেন দেখিতে দেখিতে রাত্রি ভোর হইয়া গেল। সুখের সময় অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়।" ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব কার্য্যে রত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে লাগিলেন।

বালকগণের সখাবেশ।

একদিন সকালবেলায় বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন, এই সময় পরশুরাম নামক একজন কাপড়ওয়ালা পাঁচযোড়া কমলা রঙ্গের তসর কাপড় লইয়া আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিল। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরশু! কি আনিয়াছ?

পরশু। আজ্ঞে কয়েক যোড়া তসরের কাপড় আনিয়াছি।

বাবাজী। কত যোড়া দেখি।

তখন পরশু নিজের চাদর হইতে খুলিয়া কাপড় কয়যোড়া বাবাজী

মহাশয়ের হাতে দিল। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত করিয়া দাম?"

পরশু। আজ্ঞে আট টাকা করিয়া যোড়া।

বাবাজী। আর কত যোড়া আছে?

পরশু। বাড়ীতে আর চারি যোড়া আছে।

বাবাজী। আচ্ছা! সেই কয় যোড়াও লইয়া আইস।

পরশুরাম অতি দ্রুতগতি বাড়ী হইতে আর চারি যোড়া কাপড় আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিল। বাবাজী মহাশয় অদ্বৈত, রাধা-বিনোদ, করুণাকর, শীতল, ব্রজ, গোকুল, কিশোরীগোপাল ও বাহিরের দুইটী ছেলেকে ঐ কাপড়গুলি পরাইয়া পিঠবস্ত্র আকারে চাদর বাঁধিয়া দিলেন এবং সকলের ললাটে গোপীচন্দন দ্বারা নানারূপ ভাবে তিলক করিয়া দিয়া এক একজনের কর্ণে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, বলরাম, কৃষ্ণ, সুবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি এক একটী নাম শুনাইবামাত্র সে যেন ঠিক সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া নাচিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় গান ধরিলেন :—

আয় রে আয় জীবন কানাই যাই গোচারণে।
(আমরা) হেলে দুলে নেচে নেচে খেলুব রে ভাই তোর সনে।
(কানাই) তুই না গেলে, বেণু না বাজাইলে,
ধবলী শ্যামলী আদি কে রাখে গহন বনে॥
(ও সে) যমুনার কূলে, কেলী কদম্ব মূলে,
(তোরে) মনসাধে রাখালরাজা সাজাইব যতনে॥
(আমরা) সকলে মিলে, বনে বনফল তুলে,
খেতে খেতে মিঠ হ'লে দিবরে তোর বদনে॥
(ডাকৃছে) দাদা বলরাম, আয়রে নব ঘনশ্যাম,
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম চেয়ে আছে তোর পানে॥ ইত্যাদি

সকলেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে চরণে চরণ রাখিয়া নাচিতে নাচিতে বড়-দাণ্ড* দিয়া জগন্নাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জগমোহনে অপার আনন্দ। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে যমুনার কূলে রাখালগণের খেলা, বনভোজন, জলকেলি প্রভৃতি এরূপভাবে বর্ণনা করিতেছেন যে, শুনিয়া ঘোর পাষণ্ডের চিত্তও ব্রজের বিশুদ্ধ সখ্যরসে ডুবিয়া যাইতেছে—সখাবেশধারী বালকগণের কা কথা? বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ কীর্ত্তন শুনিয়া এবং ইঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া বাৎসল্য রসে নিমগ্না হইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক যেমন সকলে উপবেশন করিলেন, অমনি ভক্তগণ নানারকমের মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাবাজী মহাশয় সকলকে মণ্ডলী আকারে বসাইয়া বনভোজনলীলার উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রসাদ পাইবার পর সকলে জগমোহনে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করতঃ। অপরাহ্ণ সময় উত্তরগোষ্ঠ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

—:০:—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহিলভোগ।

দেখিতে দেখিতে পৌষমাস আসিয়া উপস্থিত হইলে জগন্নাথদেবের পহিলভোগ লীলা আরম্ভ হইল। এইসময় জগন্নাথের বাৎসল্যসেবা। রাত্রি চারিটার পূর্ব্বে মঙ্গল আরতি হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নানারূপ পীঠা-পানা ভোগ লাগা চাই। এই ভোগটীর নাম পহিলভোগ। এই সময়ে যাবতীয় ভোগরাগ সকাল সকাল হইয়া থাকে। বাবাজী মহাশয় গোকুলদাসকে নিয়মিতরূপে জগন্নাথের মঙ্গল আরতি দর্শন ও কীর্ত্তন করিবার আদেশ করিলেন। কোন কোন দিন বা নিজেও কীর্ত্তন

*বড় রাস্তা।

লইয়া যান। শ্রীমান্ কুঞ্জদাসকে আদেশ করিলেন, "তুমি প্রতিদিন রাধারমণকুঞ্জ হইতে নাম ধরিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিতে করিতে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের বাহির পরিক্রমা করতঃ ঠিক্ ঐরূপভাবে জগন্নাথ দর্শন করিবে।" এই সময় গোবিন্দদাদার যত্ন ও আগ্রহে অতি অল্প পরিমাণে খিচুড়ি রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইতে লাগিল। দুই চারি-দিন পরে একদিন বাবাজী মহাশয় গোবিন্দদাদাকে বলিলেন, "দেখ গোবিন্দ! যদি পৌষমাসে খিচুড়িভোগ দেওয়াই মত হয়, তবে এইরূপ ভাবে যোগাড় করা চাই, যাহাতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই কিছু কিছু প্রসাদ পাইতে পারে।" শুনিয়া গোবিন্দদাদা অতি হৃষ্টচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞানুরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন যায়, একদিন বাবাজী মহাশয় গোবিন্দদাদাকে বলিলেন,— "দেখ, আমার বড় ইচ্ছা, একদিন বাংলাদেশের পীঠা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর উড়িষ্যাবাসীদিগকে প্রসাদ দেওয়া হয়।" গোবিন্দদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি পীঠা এবং কি পরিমাণে যোগাড় করিতে হইবে ?"

বাবাজী। তোমরা কি কি পীঠা প্রস্তুত করিতে পারিবে আগে বল!

তখনকার রাঁধিবার ভার ললিতা দাসীর উপর। গোবিন্দদাদা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"আমি কিছুই জানি না; যেরূপ আদেশ করিবেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

বাবাজী। চোষী পীঠা করিতে পারিবে ?

গোবিন্দ। সে অনেক সময়সাপেক্ষ।

বাবাজী। তবে আজ ক্ষীরের পাটীযোড়া হউক। পরে দেখা যাইবে।

ভিক্ষা করিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার ভার গোবিন্দদাদা ও নবদ্বীপ দাদার উপর। উভয়েই হৃষ্টচিত্তে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। বেলা অনুমান

চারিটার সময় একমণ দুধ এবং তদনুযায়ী অন্যান্য জিনিস লইয়া উভয়ে বাসায় আসিলেন। বাবাজী মহাশয় ইঁহাদের উদ্যোগ দেখিয়া নিজে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইলেন। রাত্র অনুমান আটটার সময় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় আসিলেন। এদিকে গোবিন্দদাদার উদ্যোগে পীঠা প্রস্তুত হইল। পরদিবস অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের ভোগ লাগিল। বেলা আন্দাজ একটার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া পরমানন্দে পীঠামহোৎসব হইয়া গেল।

গোকুলদাদা প্রত্যহ রাত্রি একটার সময় নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়া নাম করিতে করিতে জগন্নাথদেবের মঙ্গল-আরতি দর্শন করিয়া বেলা দশটার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাস প্রায় শেষ হইতে চলিল। একদিন বেলা অনুমান আটটার সময় অদ্বৈতদাস আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "গোকুলদাদার ভয়ানক সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে। আজ মঙ্গল-আরতি দর্শনে যাইতে পারে নাই।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "কেন, একথা আমাকে পূর্ব্বে বলিলেই হইত। নিয়মভঙ্গ করা বড় অন্যায় হইয়াছে।" বলিয়া অপর একজনকে মন্দিরে পাঠাইলেন। গোকুলের ভয়ানক জ্বর। এই সময় ইঁহারা পুরাতন ডাকঘর ছাড়িয়া হরিশবাবুর নিজ বাড়ীতে আছেন। বাবাজী মহাশয় নীচের একটী কুঠরীতে থাকেন সঙ্গীগণ অন্যান্য কুঠরীতে এবং দোতলায় আছেন। গোকুল দাদাকে উপর তলা হইতে নীচের একটী কুঠরীতে আনা হইল। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিকার জন্মিয়াছে। বেলা দশটার সময় তুলসী পরিক্রমা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাল কথা! দুই জনে ধরিয়া উহাকে পরিক্রমা করাও" কিন্তু গোকুলদাদা সে কথা না মানিয়া বলিলেন, "আপনার আদেশ পাইলে অপরের বিনা সাহায্যে

আমি নিজেই পরিক্রমা করিতে পারিব।" বলিয়া অপরের বিনা সাহায্যে একমাত্র গুরুদেবের আদেশবলে নিজে তুলসী পরিক্রমা করতঃ সকলকে যথাযোগ্য প্রণামবন্দনা এবং বৈষ্ণব-অধরামৃত গ্রহণপূর্ব্বক আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি আটটার সময় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আমাকে একটু রাসকীর্ত্তন শুনাইতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় কুঞ্জবাবু ও গোপাল বাবুকে কীর্ত্তন করিতে বলিলে উঁহারা সকলে মিলিয়া রূপ, অভিসার এবং রাসকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোকুলদাদা কীর্ত্তনের ভাবানুযায়ী হাত, মুখ ও চোখের ভঙ্গি করিতেছেন। অপর লোকে মনে করিতেছে বিকার হইয়াছে। এক একবার বাবাজী মহাশয়ের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখুন, কি অপরূপ লীলা! কি অপ্রাকৃত শোভা আহা মরি চামরগুলিও কি অপ্রাকৃত! কি অপরূপ নৃত্যভঙ্গি! কি সুললিত স্বর-লহরী! মনোহর সৌগন্ধ্যে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে পশুপক্ষী, তরুলতা সকলেই বিভোর!" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "গোকুল! কৈ আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

গোকুল বলিল, "এখন কি আর প্রতারণার সময় আছে? ঐ যে আপনি নিজেই আমাকে এক একটী পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। উঃ কি জ্যোতিঃ! চক্ষু যেন ঝল্‌সিয়া যাইতেছে।" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ লীলাদর্শনসূচক নানারূপ কথা শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ! কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। রাত্রি বারটার সময় রাসাবসানে রাধাগোবিন্দ বিলাস-কুঞ্জে প্রবেশ করিলে সেবাপরা সখীমঞ্জরীগণ নিজ নিজ সেবায় নিযুক্ত হইলেন, এই পদ গান করিয়া যেমন ইঁহারা "জয় রাধা রাধারমণ" বলিয়া জয় দিতে লাগিলেন, অমনি গোকুল দাদা 'জয় রাধে' বলিয়া বিস্মিতভাবে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি

উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক স্থিরনেত্রে যেন কি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চোখে পলক নাই—নিশ্চল—নিস্পন্দ; কিন্তু মুখে হাসি। সর্ব্বাঙ্গ পুলক-পরিব্যাপ্ত। কি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। গোকুলদাদার তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে কাহারই মনে হইতেছে না যে, তিনি চিরদিনের মতন দৃশ্য-জগতের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় সূক্ষ্মদেহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সকলেই বিস্মিত ভাবে গোকুলের মুখপানে তাকাইয়া "জয় রাধা রাধারমণ" বলিতেছেন। গোকুল দাদা কিন্তু আর চোখ ফিরাইলেন না। মহাভাবময়ীর লীলায় প্রবেশ করিয়া মহাসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। ধন্য গুরুভক্তি! ধন্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস! ধন্য গুরুনিষ্ঠা কেহ কখন গোকুলদাদাকে মালা জপ বা আহ্নিক পূজা করিতে দেখে নাই। উঁহার যাজনের মধ্যে কেবল গুরু-আজ্ঞা পালন। বিনা সাধন-ভজনে, বিনা ধ্যান-জপ-পূজায়, বিনা স্মরণ-মননে একমাত্র গুরুভক্তিবলে গুরুদেবের কৃপায় যে অনায়াসে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া উচ্চগতি লাভ করিতে পারা যায়, গোকুলদাদা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে রাত্রি সকলে গোকুলদাদাকে বেষ্টনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন কি মৃত দেহ বলিয়া কাহারই মনে ধারণা আসিল না। পরদিবস প্রাতে বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে সকলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গোকুলদাদার দেহ সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ঝাঁজপীটা মঠপ্রাপ্তি।

একদিন স্থানীয় মুনসেফ্ বাবু কিশোরীমোহন সেন ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু জগৎচন্দ্র রায় কয়েকটী ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকটে আসিয়াছেন। নানাবিধ তত্ত্ব-আলোচনার পর কিশোরী

বাবু বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের এইরূপ নানাস্থানে থাকা আমাদের বড়ই অসুবিধা বলিয়া মনে হইতেছে। একটী মঠ হইলে ভাল হয় না কি? বিশেষতঃ অপরের বাড়িতে থাকিলে একটু পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, আর নিজেদের একটা স্থান থাকিলে স্বাধীন অবস্থা থাকে।

বাবাজী। দেখ কিশোরী! জীবমাত্রেই পরাধীন; জীবের স্বাধীনতাই ত অনিষ্টের কারণ। তথাপি নিতাইচাঁদ যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, এটিকে স্বাধীন বই পরাধীন বলিতে পারি না। কারণ ইচ্ছা হইলে এই মুহূর্ত্তেই স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া যায়; কোনও ব্যবস্থার দরকার হয় না। আর তুমি যে অবস্থা বলিতেছ, ভাবিয়া দেখিলে সেইটীই পরাধীন; কারণ একটী নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইলে স্থানান্তরে যাইবার সময় একটা বন্দোবস্ত না করিয়া যাইবার উপায় থাকে না।

কিশোরী। আজ্ঞে আপনারাই ত বলিয়া থাকেন, "সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। সেবাধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সেবাদ্বারা ভগবান্‌কে যেরূপ সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য কোনও সাধনের দ্বারা সেরূপ সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, এইস্থানে ঝাঁজপীটা মঠ নামক একটী মঠ ছিল। কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য **সেবাদাস** নামক একটী সিদ্ধ বাবাজী, ঠাকুর মহাশয়ের আদেশক্রমে **শ্রীশ্রীরাধাকান্ত** বিগ্রহসেবা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যানুক্রমে সেবা চলিয়া আসিতেছিল। মঠটীর অপর একটী নাম বিরক্ত সিদ্ধাশ্রম। কৃষ্ণদাস অধিকারীর পরলোক হইলে নাওয়ারিশ হওয়ায় বিগ্রহ এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি সম্প্রতি থানায় আছে। বোধ হয় আর

কিছুদিন কোনও চেষ্টা না করিলে গবর্ণমেণ্টের খাস হইয়া যাইবে। এবিষয়ে আপনার অনুমতি পাইলে আমরা চেষ্টা করিতে পারি।

বাবাজী। বাবা! আমি পূর্ণ আসক্ত; আমাকে ঐ বিরক্ত আশ্রমের মধ্যে লইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। তুমি যে সেবাধর্ম্ম বলিলে বাস্তবিক সেবা ভিন্ন পূর্ণরূপে প্রাপ্তির উপায়ন্তর নাই একথা সত্য; কিন্তু অধিকারী হওয়া চাই। জীবের ত্রিবিধ অবস্থা—আসক্তি, বিরক্তি ও অনাসক্তি। ধন, জন, দেহ, গেহ, মান, মর্য্যাদা, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে যে গাঢ় মমতা, তাহাকেই আসক্তি বলে। এই আসক্তির প্রভাবে জীব পাপকে পুণ্য, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, অসৎকে সৎ মনে করিয়া মোহগর্ত্তে পতিত হওত বাসনানুযায়ী দেহধারণপূর্ব্বক অনন্তকাল স্বর্গ ও নরকরূপ সংসার ভোগ করিয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এই আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"ভোগমূলং সদাসক্তিঃ।"

এই আসক্তির বস্তুসকলকে পরিহারপূর্ব্বক নির্জ্জন কান্তারে নিষ্কিঞ্চন-ভাবে বাস করার নাম বিরক্তি। এই অবস্থার যাজন জগতে শিক্ষা দিবার জন্যই 'শ্রীসনাতনকে গোস্বামী' এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস, বনের শাক অলবণে পাক্ করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া মদনমোহন সাক্ষাৎ হইয়া একটু লবণ চাহিলেও তদ্বাক্যে অবহেলা করা, দিবা রাত্রির মধ্যে ছাপ্পান্ন দণ্ড স্মরণ, চারিদণ্ড বিশ্রাম প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিলেন। এমন কি বৈরাগ্য রক্ষার জন্য মদনমোহনের

প্রসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগের ঘরে ঘরে মাধুকরী করিয়া বেড়াইতেন। গায়ের ভোট কম্বল বিনিময়ে ছেঁড়া কাঁথা বহন করিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন। ইহার পর অনাশক্তি। অর্থাৎ কার্য্য করিয়া ফলের আসক্তি পরিত্যাগ, বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের তত্তদ্‌বিষয় গ্রহণে অনিচ্ছা এবং পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় বিষয়ের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করার নামই অনাসক্তি। এই অবস্থাটী অতি কঠিন। ইহা না হইলে সেবা করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

*   *   *   *

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"

ইহাকেই বলে আত্মসমর্পণ। এইরূপ অধিকারী ব্যক্তিই বলিতে পারেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। আমরা নট, ভগবান্ সূত্রধর তিনি যেমনভাবে নাচাইতেছেন, আমরা তেমনি নাচিতেছি।" ইঁহারা পাপপুণ্যের ভাগী হন না; সুখে, দুঃখে, লাভে, অলাভে, মানে, অপমানে, জয়ে, পরাজয়ে, ইঁহাদের সমজ্ঞান। এই অবস্থার লোকের কথা শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" অনাসক্ত না হইয়া সেবা করিতে গেলে অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা নাই। আসক্তি থাকিতে আত্ম-সুখলিপ্সা ত্যাগ হয় না। আত্মসুখ থাকিতে সেবা হইতে পারে না। তোমার প্রভুকে জানাও, আমার হৃদয় সেবা করিবার যোগ্যতালাভ করুক, পরে দেখা যাইবে। এইরূপে নিজের দৈন্যভাব-সূচক নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন। কিশোরী বাবুর মনটী কিন্তু

প্রসন্ন হইল না; একটু বিষণ্নমনে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে দিনের পর দিন যায়, একদিন বেলা দশটার সময় বাবাজী মহাশয় সদলবলে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রাধাকান্ত-মঠে প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতেছেন, এই সময়ে কিশোরী বাবু ও জগৎ বাবু একখানা গাড়ীতে অফিসে যাইতেছিলেন। কীর্ত্তন শুনিবামাত্র গাড়ী হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ ত?"

কিশোরী। আজ্ঞে আপনার কৃপায় শারীরিক ভাল আছি, তবে মনে একটা বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে।

বাবাজী। কি সন্দেহ? যদি এখন বলিবার হয় তবে বল।

কিশোরী। আচ্ছা শ্রীমূর্ত্তিতে আর ভগবানেতে প্রভেদ কি?

বাবাজী। শ্রীমূর্ত্তিতে আর ভগবানেতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই; ভেদবুদ্ধি করিলেও নরকগামী হইতে হয়।

কিশোরী। রাধাগোবিন্দের সঙ্গে আপনাদের কি সম্বন্ধ?

বাবাজী। আমরা রাধারাণীর দাসী, কাজেকাজেই শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরও প্রাণবল্লভ।

কিশোরী। এইটী কি কেবল মৌখিক কথা না আন্তরিক? কারণ আপনি স্নানাদি করিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য যাইতেছেন; আর আপনার প্রাণবল্লভ আজ একমাস কাল থানায় উপবাসী রহিয়াছেন। আগামী পরশ্ব নিলাম হইয়া যে কাহার হাতে যাইবেন, তাহার ঠিক নাই। বলিতে কি, সেই দৃশ্য দেখিলে পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যায়।

এইবার বাবাজী মহাশয় আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না;

একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা! আমার কি ক্ষমতা আছে? আমি কি করিব?

কিশোরী। আজ্ঞে আমরা থাকিতে আপনার কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষা।

বাবাজী। আচ্ছা তোমাদের যাহা ভাল বোধ হয় কর।

এই কথা শুনিয়া কিশোরীবাবু প্রসন্নমনে বাবাজী মহাশয়ের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক অফিসে চলিয়া গেলেন। ইঁহারাও কীর্ত্তন করিতে করিতে রাধাকান্ত মঠে উপস্থিত হইলেন। কিশোরীবাবু অতি শীঘ্র অফিসের কার্য্য শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এইভাবে একখানি দরখাস্ত লিখিলেন যে, হিন্দুর উপাস্য দেবতা রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আজ কয়েক দিন থানায় আছেন; সেবা পূজা বন্ধ। অতএব জামিনে ঠাকুর খালাস দিতে আজ্ঞা হয় ইত্যাদি। সেদিন শনিবার। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় দরখাস্তপেস হইল না। পরদিন কাছারি বন্ধ। কাছারির চাপরাসি উপস্থিত না থাকায় অগত্যা কিশোরী বাবু নিজেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়া দেখেন যে সাহেব কটক গিয়াছেন। তাঁহার চার্জ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জগৎবাবুর উপর আছে। তখন জগৎ বাবুর বাসায় যাইয়া তথা হইতে কটক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনসহ ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া দেখেন, মঠের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ঠাকুরের মন্দির বেমেরামত। চারিদিকে এতই অপরিষ্কার যে ঠাকুরের কা কথা, মানুষের পর্য্যন্ত বাসের অনুপযুক্ত স্থান হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কীর্ত্তন লইয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই। অতি কষ্টে একটী স্থানে কিছু হরির লুট দিয়া কীর্ত্তন শেষ করতঃ বাড়ী পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বলরামের উপরেই সমস্ত কার্য্যের ভার দিলে তিনি বহুলোক লাগাইয়া শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির

প্রভৃতি মেরামত ও বাড়ী পরিষ্কার করিয়া গোময় দ্বারা বিশুদ্ধ করিলেন। ✓একটী কাল রঙ্গের বৃদ্ধ কুকুর মঠের উত্তরপার্শ্বের ভাঙ্গা প্রাচীরের উপর বসিয়া সমস্ত কার্য্য দেখিতেছিল। যেমন সমস্ত পরিষ্কার হইল, অমনি সে প্রাচীর হইতে নামিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ-প্রান্তে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। প্রতিবেশীগণ বলিতে লাগিল, "এই কুকুরটী অধিকারী কৃষ্ণদাস বাবাজীর গুরু ভগবান্ দাস মহান্তের সময় হইতে এই মঠে আছে। কৃষ্ণদাস বাবাজীর প্রাপ্তির পর লা-ওয়ারিশ হেতু ঠাকুর এবং অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া যাইবার জন্য পুলিশ আসিলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে মঠে ঢুকিতেই দিল না। পরে তাহারা অতিকষ্টে ইহাকে তাড়াইয়া দিয়া তবে ঠাকুর লইয়া গেল। সেই দিন হইতে কুকুরটী ঐ ভাঙ্গা প্রাচীরের উপর পড়িয়া আছে। অন্য কত লোক রাস্তা দিয়া যাইতেছে; কিন্তু কোনই শব্দ নাই, পুলিশের লোক দেখিলেই অস্থির; তাহাকে গলির বাহির করিয়া তবে নিশ্চিন্ত।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় কুকুরটীকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা! তুমি মহাপুরুষ; কৃপা কর, যেন সেবা করিবার শক্তি পাই। তোমার প্রাণারাম ঠাকুর অচিরাৎ তাঁহার নিজ স্থান অধিকার করিবেন সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া সঙ্গিগণসহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কুকুরটী সেই স্থানেই রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে অন্য এক নূতন উৎসবে নিমগ্ন হইলেন। সেদিন শ্রীবসন্ত-পঞ্চমী। ইঁহারা ঐ উৎসবটী জগন্নাথবল্লভে করিয়া থাকেন। গোবিন্দ দাদা ও নবদ্বীপ দাদা উৎসবের যোগাড় করিয়াছেন। বেলা এগারটার সময় কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলে চিড়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, এই সময় একটী পুলিশের লোক আসিয়া বলিল,—"দারগা বাবু বলিয়া পাঠাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টেলিগ্রাম করিয়াছেন; অতএব আপনি ঠাকুর লইয়া যান। একটার সময়

পুলিশ সাহেব আসিবেন, ইহার মধ্যে থানা হইতে ঠাকুর বাহির করিতে হইবে।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে প্রসাদী-হাতেই বারান্দায় আসিয়া এক লম্ফে রাস্তায় নামিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, করযোড়ে বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট বলিলেন,—"আপনারা সকলেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন; আমার অপরাধ লইবেন না।" বলিয়া দ্রুত-গতি থানার দিকে ধাবিত হইলেন। কিরূপে ঠাকুর লইয়া যাওয়া হইবে, মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে এইস্থানে একখানি চতুর্দ্দোলা আছে। উহাতে করিয়া ঠাকুরকে বিজয় করাইলে ভাল হয় নাকি? বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে উক্ত চতুর্দ্দোলা আনাইবার ব্যবস্থা করতঃ থানায় যাইয়া দেখেন, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউ একখানি কৌপীন পরিয়া আছেন, রাধারাণী বিবস্ত্রা এবং অন্যান্য ঠাকুরসকল একটা ঝুড়ির মধ্যে রহিয়াছেন। দেখিয়া বাবাজী মহাশয় ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। ললিতাদাসী তাহার গায়ের উড়ানীখানি দ্বারা রাধারাণীর লজ্জা নিবারণ করিলে ঠাকুরকে চতুর্দ্দোলায় বসান হইল। কোথা হইতে একদল ইংরাজী বাদ্যকর আসিয়া বলিল,—"বাবাজী মহাপ্রভু! আপনার অনুমতি হইলে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে বাসনা করি। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"কি যোগমায়ার যোগাযোগ! আচ্ছা বাবা! তোমরা ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল।" এই বলিয়া নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রওনা হইলেন। অগ্রে সংকীর্ত্তন, মধ্যে ঠাকুর, পশ্চাতে ইংরাজী বাজনা। লোকে লোকারণ্য। আনন্দময় যুগলকিশোর যেন আপামর সাধারণকে আনন্দসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া-ছেন। অভিষেকাদির দ্রব্যসকল সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ হইতে লাগিল। কেহ বা পরমান্ন-ভোগের জন্য দুগ্ধমিষ্টি কেহ বা পঞ্চামৃত কেহ বা ঠাকুরের জন্য গরদের যোড় এইরূপে সকলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে নানাবিধ

দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরজীউ মন্দিরে শুভ বিজয় করিলে অভিষেকাদির ব্যবস্থা এবং ভোগের যোগাড় হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় একশত আট কলসী সুগন্ধি শীতল জলে ঠাকুরের মহা-অভিষেক করাইয়া ভোগ দেওয়ার পর শয়ন দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।



শ্রীশ্রীরাধাকান্তের বাঁশী ও মাখনমিশ্রি

শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ দেখিলেন, ভক্তমণ্ডলী আমার সমস্তইত জোগাড় করিল, বাঁশীর কি হইবে? বোধ হয় বলিতে সাহস না পাইয়া নিজেই ভিক্ষায় বাহির হইলেন। 'মাটী মণ্ডপ সাহিতে' রামাইত সম্প্রদায়ী একটী সাধু বাস করেন। সাধুটী বড়ই প্রেমিক; একটী গোপাল সেবা করেন। গোপাল যেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ। কোন স্থানে কোন উপাদেয় দ্রব্য দেখিলে অমনি গোপালকে আনিয়া দেন। প্রায় এক বৎসর হইল, গোপালের জন্য একটী বাঁশী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সেবার সময় যেমনই বাঁশীটীর উপর নজর পড়ে, অমনি বলিয়া থাকেন, "হায়! আমি বাঁশী গড়াইলাম; কিন্তু গোপাল অঙ্গীকার করিলেন না। একদিন যদি ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁশীটী হাতে নিতেন, তবে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইত।" এতদিনে সাধুর কথা গোপালের নিকট পৌঁছিল; তাই আজ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ শেষরাত্রে সাধুর কাছে গিয়া উপস্থিত। সাধু নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বলিতে লগিলেন "ঘর্‌মে বাঁশী রাখ্‌কে মন্‌মে দুখ্‌ কর্‌নেসে ক্যা হোগা? বাঁশী ত হাম্‌কো দেই দে।" সাধুটী নিদ্রিতবস্থায়ই চমকিতভাবে বলিলেন—"আপ্ কোন্ হ্যায়? কাঁহা রহেতে হো?"

ঠাকুর। মেরে নাম রাধকান্ত। মেইত ঝাঁজপীটা মঠমে রহেনেবালে হ্যায়।

হঠাৎ সাধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন কাছে কেহ নাই—রাত্রিও শেষ হইয়াছে। তখন সাধু বাঁশীটী হাতে লইয়া প্রেমগরগরভাবে ঝাঁজপীটামঠ উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। সাধু ঝাঁজপীটা মঠ জানেন না। শেষ রাত্রি—লোকের গতাগতি না থাকায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবারও সুবিধা নাই দেখিয়া মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছেন—কোন্ দিকে যাই, এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, "আপনি কোথায় যাইবেন?"

সাধু। বাবা! আমি ঝাঁজপীটা মঠে যাইব।

আগন্তুক। এই রাস্তা দিয়া যান।

বলিয়া অন্তর্হিত হইল। আগন্তুক ব্যক্তি কে, একবার এই কথা ভাবিয়া সাধু তদাদিষ্ট পথে চলিলেন। ক্রমে দোলমণ্ডপসাহি গিয়া আবার ভ্রমে পড়িলেন। তখন আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রাণে প্রাণে বলিতে লাগিলেন, "হে রাধাকান্ত দেব! যদি তোমার বাঁশী লইবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমাকে ঠিক পথে লইয়া চল।" কি আশ্চর্য্য! কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সাধু একেবারে ঝাঁজপীটা মঠের দরজায় উপনীত হইয়া "বড় বাবাজী মহাশয়, বড় বাবাজী মহাশয়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। একজন সদর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র বাবাজী মহাশয়ের নিকটে গিয়া সাধু প্রেমগরগরভাবে আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে বাবাজী মহাশয় সাশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আপনার পরম সৌভাগ্য; কারণ ঠাকুর নিজে গিয়া আপনার নিকট বাঁশী ভিক্ষা করিয়াছেন।" এই সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মঙ্গল-আরতি বাজিয়া উঠিলে সকলেই দর্শনের জন্য

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আরতির পর সাধু বাঁশীটী ঠাকুরের হাতে দিয়া সাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমি মহাপাপী, দুরাচার, নরাধম—ভক্তি কাহাকে বলে জানি না; তথাপি তোমার এতই করুণা যে নিজে গিয়া দর্শনদানে আমাকে কৃতার্থ করিলে! এই ভক্তিহীনের মুরলীটী অঙ্গীকার করিয়া সুখী হও এই আমার প্রার্থনা। দয়াময়! দাসের প্রতি যেন চিরকাল এইরূপ দয়া থাকে।" বলিয়া দুইটী টাকা চরণের নিকট রাখিয়া প্রণাম করতঃ বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, আজ প্রভুকে একটু ক্ষীরভোগ করিয়া দিবেন।" বাবাজী মহাশয় সাধুর প্রেম এবং রাধাকান্ত দেবের খেলা দেখিয়া অতি বিস্মিতভাবে সাধুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

বাবাজী মহাশয় গঙ্গামাতামঠের শ্রীযুক্ত বিহারীদাস পূজারী মহাশয়ের শিষ্য করুণাকর দাসকে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া সেবার নিয়ম করিয়া দিলেন:—"কুঞ্জভঙ্গ হইয়া মঙ্গল আরতির পরে রাধারাণী ও রাধাকান্ত পৃথক্ থাকিবেন। উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্নান, শিঙ্গার, আরতি ও ভোগ হইবে। ভোগের পরে গোষ্ঠবেশ হইলে রাধাকান্ত গোষ্ঠে গমন করিবেন, শ্রীমতীও সূর্য্যপূজার ছলে সখীগণসঙ্গে রাধাকুণ্ডে যাইয়া কৃষ্ণসহ মিলিতা হইবেন। ঐ সময় পরমান্নভোগ লাগিয়া আরতি হইবে। আবার বেলা চারিটার সময় শীতলভোগ হইয়া উভয়ে পরস্পর পৃথক্ হইবেন। সায়ংকালে রাধাকান্তের গোধূলি আরতি এবং শ্রীমতীর আরতির পর জল আনিবার ছলে যুগলমিলন হইয়া আরতি হইবে। আরতির পর পরস্পর পৃথক্ থাকিবেন। রাত্রি দশ দণ্ডের পর অভিসার হইয়া পুনর্ব্বার মিলন ও ভোগের পর নিকুঞ্জে আরতি হইয়া শয়ন দেওয়া হইবে।" এই নিয়মে সেবা চলিতে লাগিল; সেবানু-

কুল্যের জন্য কয়েকজন ভক্ত চারি পাঁচটি গরু আনিয়া দিল। রাধাকান্ত জীউর গোষ্ঠবেশ হইলে লীলাপুষ্টিহেতু তাঁহার সম্মুখে সেই গরুগুলি আনিয়া বাঁধা হইত। গোষ্ঠগমনের সময় হইলে কৃপাসিন্ধুদাস নামক জনৈক ভক্ত ঐ গরুগুলি লইয়া মাঠে যাইত এবং উত্তরগোষ্ঠের সময় ফিরিয়া আসিত। যেরূপ নিয়মিতভাবে সেবা চলিতে লাগিল, শ্রীবিগ্রহের অবস্থারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল। একটু বিশেষভাবে দেখিলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হইত। সেবার পরিপাটী দর্শনে নিত্যলীলা প্রকট বলিয়া বোধ হইত। লীলার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মাখনচুরির কথা মনে পড়িয়া গেল। মহিমচন্দ্র দাস নামক পাবনা জেলার জনৈক ভদ্রলোক আশ্রমে থাকিতেন। তাঁহাকে রাধাকান্ত জীউ রাত্রে স্বপ্নে বলিলেন,—"দেখ, তুমি আমার কিছু মাখনমিশ্রি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দাও" সে বলিল, "আপনি দাদাকে (বড় বাবাজী মহাশয়কে) এবিষয় বলেন নাই কেন?" ঠাকুর উত্তর করিলেন, সে আমার জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিতেছে। আমার নিজেরও ত কিছু যোগাড় করা উচিত।" সকাল বেলা উঠিয়া মহিমচন্দ্র বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রেমগদগদকণ্ঠে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, দেখ মহিম! যদিও আমি ভিক্ষা করিয়া একটুকু মাখনমিশ্রি যোগাড় করিতে পারি, তথাপি যখন তিনি তোমার নিকট চাহিয়াছেন, তখন তোমরাই যোগাড় করা উচিত।" মহিম ভিখারী, পয়সা কড়ি কিছুমাত্র হাতে নাই। সে ভিক্ষা করিয়া কিছু মাখনমিশ্রি ভোগের ব্যবস্থা করিল। এই হইতেই প্রত্যহ প্রাতে মাখন মিশ্রি ভোগ লাগিবার নিয়ম হইল।

করুণাকর দাসের সখীবেশ ও আউলিয়া মঠ উদ্ধার।

"শ্রীমূর্ত্তিতে নিত্যলীলা স্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ ভাবে সেবা করিতে পারিলে যে অভীষ্ট পূরণ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই যেন শ্রীশ্রীরাধারাণী তাঁহার নিজ সেবক করুণাকর দাসের উপর কটাক্ষ করিলেন। করুণাকর দাস বালক, আকুমার ব্রহ্মচারী, ভক্তি ও নিষ্ঠা-পরায়ণ। বিশুদ্ধ হৃদয়ে অতি সহজেই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। করুণাকর দাস রাধাকান্ত জিউর যুগল আরতির সময় আপন ইচ্ছামতেই সখীবেশ ধারণপূর্ব্বক আরতি করিয়া থাকে। এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন কি শুভ মূহূর্ত্তে সখীবেশ ধারণ করিল, সেই বেশ আর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। বেশপরিবর্ত্তনের জন্য অনেক লোক নানাপ্রকার বলায় সে বাবাজী মহাশয়ের চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভো! আপনি আমায় কৃপা করুণ, আমি প্রত্যহ যুগল আরতির সময় সখীবেশ ধারণপূর্ব্বক আরতি করিয়া ঐ বেশ পরিত্যাগ করি; কিন্তু আজ আমি আর কিছুতেই এবেশ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। পূর্ব্বের কথা আমার কিছুই মনে নাই। আমি যেন ব্রজগোপী, আমার মনে সর্ব্বদার তরে এই ধারণা হইতেছে। শুনিয়া বাবাজী মহশয় প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তোমার উপরে কৃপাময়ী শ্রীমতীর পূর্ণকৃপা। শাস্ত্রে শুনা যায় "প্রভু সেবকের অপরাধ গ্রহণ করেন না; অল্প সেবা, বহু মন্তমানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ করিয়া থাকেন।" এই মহাবাক্যটী আজ তোমার দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। মহাভাব-স্বরূপিণী করুণাময়ী রাধারাণী তোমাকে গোপীভাব দান করিয়া কৃষ্ণসেবার যোগ্যা করিলেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপা দর্শনে আমরা বিমুগ্ধ হইলাম। মহারত্ন পাইয়াছ, যত্ন কর

কৃতার্থ হইবে। "রসৈকনিষ্ঠ হইয়া সেবা করিলে নিজে আনন্দ পাইবে এবং সাধারণেরও আনন্দের পাত্র হইতে পারিবে। জীবমাত্রেই প্রকৃতি; কিন্তু ভ্রমবশতঃ পুরুষাভিমানী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন প্রভৃতি দূরে বর্জ্জন করিবে। প্রকৃতি ত্রিবিধা—ভাবপ্রকৃতি, স্বভাবপ্রকৃতি এবং স্বরূপপ্রকৃতি। স্বরূপ প্রকৃতির সহিত নির্জ্জনবাস, একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন, গাত্রসংস্পর্শাদি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। রসান্তর বা ভাবান্তরের আলোচনা অনিষ্টকর। দীক্ষামন্ত্র প্রদান, উপাসনা লইয়া বিতর্ক করা এবং অসূয়াবশতঃ কাহারও উপাসনার হীনতা প্রতিপাদন করা এই পথের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজ-উপাসনা করা ভাববিরুদ্ধ। নিজেতে সংসারী বুদ্ধি রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বৈষ্ণববুদ্ধিতে সেবা করিবে। অনিবেদিত কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না।" ইত্যাদি নানাপ্রকার উপদেশামৃতসিঞ্চনে করুণাকরকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলের হৃদয় সরস ও স্নিগ্ধ করিলেন। নবদ্বীপ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার নাম কি রাখা হইবে?" বাবাজী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "**কুসুমমঞ্জরী দাসী।**" শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। কুসুমমঞ্জরী দাসীকে রাধাকান্তদেবের শ্রীঅঙ্গসেবা এবং কীর্ত্তনাদিতে নৃত্য এই দুইটী সেবা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরমানন্দে সেবাকার্য্য চলিতে লাগিল।

একদিন বাবাজী মহাশয় বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ক্রমে কুণ্ডাইবেণ্ট সাহীর অন্তর্ভুক্ত হেরাগৌরী সাহী গলির ভিতরে প্রবেশ করিলে, একজন লোক বলিল, "বাবাজী মহাশয়! এইখানে একটী মঠ আছে এবং ঐ মঠে নিতাই, গৌর, সীতানাথ বিগ্রহ আছেন, চলুন দর্শন করিবেন।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় অতি উৎসাহের সহিত গমন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা হৃদয়বিদারক। অপূর্ব্ব

অপূর্ব্ব মূর্ত্তিসকল বিরাজ করিতেছেন ; কিন্তু সেবা অভাবে মলিনবদন। কতদিন যে কবাট বন্ধ আছে, তাহা কে জানে! চারিদিকে উইপোকা ধরিয়াছে। নিতাই, গৌর, সীতানাথ, সীতাঠাকুরাণী ও অচ্যুতানন্দ এই পাঁচ মূর্ত্তি দারুবিগ্রহ ; বাকী অনেক মূর্ত্তি যুগল, শালগ্রাম এবং অন্যান্য ঠাকুর আছেন। শ্রীবিগ্রহ অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সেবার বিশৃঙ্খলতা দর্শনে বাবাজী মহাশয় বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বহুদিন পরে ঠাকুরবাড়ীতে লোকের সমাগম দেখিয়া দুই একজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই মঠ কাহার এবং ইহার সেবাইত কে?" একজন বলিল, "এইস্থানটি অতি প্রাচীন। **আউলিয়া গোঁসাই** নামক জনৈক অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামী এই সেবা স্থাপন করেন। সম্প্রতি শ্রীপদ্মচরণ গোস্বামী প্রভু এই মঠের সত্ত্বাধিকারী। ঠাকুরের অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে ; কিন্তু উপযুক্ত লোক অভাবে আদায় হয় না। প্রভু যৎকিঞ্চিৎ যাহা আদায় করিতে পারেন, তদ্দ্বারা নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি সহযোগে আত্মানন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। একটী পূজারী কিছুদিন সেবা করিতেছিল। আজ কয়েক মাস হইতে সে চলিয়া যাওয়ায় সেবা বন্ধ আছে।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "অহো! প্রভুর কি বিড়ম্বনা!! লোকে যে বলে অর্থ বা সম্পত্তি থাকিলে সেবার কোন অসুবিধা হয় না, একথা সম্পূর্ণ ভুল। সৎপাত্রে না পড়িলে কোন বস্তুই কার্য্যকারী হয় না। আচ্ছা নিতাইচাঁদের যাহা ইচ্ছা।" বলিয়া ঝাঁজপীটা মঠ হইতে চা'ল ডা'ল প্রভৃতি আনাইয়া সেদিনকার সেবার ব্যবস্থা করিলেন। পরদিবস হইতে পৃথক ভিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া রঘুনাথ দাস নামক একটি যুবককে ঐ মঠে রাখিলেন। তিনিও বেশ

যত্নপূর্ব্বক সেবা চালাইতে লাগিলেন। মঠটির নাম **আউলিয়া মঠ।** বাবাজী মহাশয়ের যত্নে রাধারমণ কুঞ্জ, ঝাঁজপীটা মঠ এবং আউলিয়া মঠ এই তিনটি স্থানের লুপ্ত সেবা উদ্ধার হইল। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে পুরীবাসী সকলেই ইঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সহিত মিলন।

একদিন বাবাজী মহাশয় নিজ গণসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গিয়াছেন। বহুক্ষণ জগমোহনে কীর্ত্তন করিয়া পরিক্রমাপূর্ব্বক লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন হইতে লাগিল। একটী খর্ব্বাকৃতি, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, ব্রহ্মচারী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন ও নৃত্যভঙ্গিদর্শনে তিনি একেবারে স্তম্ভিত ও বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে ইঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুটী চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচারীটী বাঙ্গালী, বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ; কিন্তু আকৃতি দেখিয়া কেহ তাঁহাকে মাদ্রাজী ভিন্ন বলিতে পারিবে না। বড়ই উদার প্রকৃতি। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি এ রাজ্যে নাই। কীর্ত্তনধ্বনি শুনিতেছেন, আর এক একবার বিস্ফারিতনেত্রে বাবাজী মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন। পুলকাবলীতে উঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত। বাবাজী মহাশয় এক একবার যেমন **জয় নিত্যানন্দ রাম** বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, অমনি ব্রহ্মচারী মহাশয় কম্পিতকলেবরে নৃত্য করিতেছেন। উঁহার অবস্থা দর্শনে বাবজী মহাশয় প্রেমানন্দভরে উঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বাবাজী মহাশয় অতি দীর্ঘাকার, ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি খর্ব্বাকৃতি; কাজেই ইঁহার বুকের উপর ব্রহ্মচারী মহাশয় দোদুল্যমান। আহা মরি কি অপূর্ব্ব মিলন! যেন কত

কালের সুপরিচিত পরমাত্মীয়! বাস্তবিক তাই নয় কি? আমরা হয়ত মনে করিব, ইঁহার সহিত এই প্রথম পরিচয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং বহুকালের সুপরিচিত এবং একসঙ্গী; অতি অল্পদিনই বোধ হয় কোন কার্য্যবশতঃ পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। আজ আবার সেই সমস্ত পূর্ব্বকথা মনে পড়িয়া আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় ক্রমে একটু অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কেশকলাপ বিশ্রস্ত—বস্ত্রাদি অসামাল। নৃত্য করিতে করিতে এক একবার পরিধেয় বসন খুলিয়া পড়িতেছে, আবার আস্তে আস্তে ধারণ করিতেছেন। আগন্তুক লোকসকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"এই ব্রহ্মচারী অতবড় বিদ্বান্, অত বড় গম্ভীর, আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কিনা একেবারে পাগলের মত নাচিতেছে।" ব্রহ্মচারী মহাশয় গ্রন্থাদি সঙ্গের জিনিষপত্র বিস্মৃত হইয়া নাচিতে নাচিতে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন। বাবাজী মহাশয় একজনকে উঁহার গ্রন্থ প্রভৃতি মঠে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে যেন প্রাকৃত চোখে দেখিতেছেন না; এক একবার ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া অপ্রাকৃত ভাবরাজ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। আনন্দের অবধি নাই। দেখিতে দেখিতে ঝাঁজপীটা মঠে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নাম **নিত্যস্বরূপ।** কথাবার্ত্তা, চালচলন, ভাবগতিক দেখিয়া বাবাজী মহাশয় উঁহার নাম দিলেন। "**বটুদাস**"। বটুদাস যথার্থই যেন মধুমঙ্গলের আবেশমূর্ত্তি; ললিতাদাসী, কুসুমদাসী প্রভৃতি সকলেরই যেন এক কৌতুকের সামগ্রী হইল। ইনি বাবাজী মহাশয়কে ভাই সাহেব বলিয়া সম্বোধণ করিয়া থাকেন। এইরূপে কয়েক দিন যায় বটুদাস বৈশাখী পূর্ণিমার দিন

বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্রই উঁহার ব্রজের সখ্যলীলা স্ফূর্ত্তি পাইল—দিবানিশি মধুমঙ্গলের ভাব হৃদয়ে স্থায়ী হইল। সখীদিগের সহিত সর্ব্বদাই রসকোন্দল; বিশেষতঃ ললিতার সঙ্গের ত আর কথাই নাই। 'ক্ষুধা পাইয়াছে' বলিলেই লাড্ডু, পেঁড়া, কচুরি যাহা কিছু দেওয়াই চাই। বটুদাসের অপূর্ব্ব গুরুনিষ্ঠা; নিত্য গুরুপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। গুরুপূজার সময় ইনি বাবাজী মহাশয়কে তুলসীদ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। বাবাজী মহাশয় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তাহা মানিতেন না। প্রায়ই বলিতেন, "কেন ? 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ॥' একথাগুলি কি ভগবদ্বাক্য নয় ? পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র যে বলিয়া যাইতেছেন—'ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ। সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুং নত্বা প্রণমেদ্দেবতান্তরং। সাক্ষাদ্বিষ্ণুসমং মত্বা পূজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকং॥" এই সমস্ত কি আপনি মানিতে চান না ?" ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের দ্বারা বাবাজী মহাশয়কে নিরস্ত করিয়া প্রত্যহ গুরুপূজা করিতেন। বাবাজী মহাশয় যখনই বাহিরে যাইতেন, তখনই বটু একখানি পাখা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। উঁহার এতই সেবানিষ্ঠা যে দিবারাত্র পাখা করিলেও ক্লান্তিবোধ করিতে দেখা যায় নাই।

পাদরীর সহিত মিলন।

একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্র সরোবরের নিকটবর্ত্তী চৌমাথা রাস্তার উপরে একটী বৃদ্ধ পাদরী সাহেব বক্তৃতা দিতেছিলেন। বহুলোক সমবেত হইয়াছে। পাদরী সাহেব একখানি টুলের উপর দাঁড়াইয়া নানা রূপ শ্রুতিমধুর কৌতূহলপূর্ণ বাক্য দ্বারা খৃষ্টানধর্ম্মই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিশুর উপদেশাবলীই যে মানবমাত্রের অবলম্বনীয়, যিশুই যে সকলের একমাত্র

উপাস্য এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। পাদ্রী সাহেব প্রত্যেক কথাতেই বাইবেলের প্রমাণ দেখাইতেছেন। নিজ মত স্থাপন মানসে অনেক সময় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বক্তৃতার স্রোতে বক্তার মুখে অনেক প্রতারণাবাক্য বাহির হইতে দেখা যায়। আজ পাদ্রী সাহেবেরও এই অবস্থা ঘটিল। একটী ভুল কথা যিশুর মুখের বাক্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন, এই সময় স্বচ্ছন্দগতি নবদ্বীপ দাদা ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ পাদ্রী সাহেবের ঐকথাটী শুনিয়া দুঃখিতমনে পাদ্রী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া Wrong conclusion (ভুল সিদ্ধান্ত) এই শব্দটী উচ্চারণপূর্ব্বক আপনমনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শব্দটী শুনিবামাত্র সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। টুল হইতে নামিয়া একজন সঙ্গী লোককে বলিলেন,—"দেখ, ঐ যে লোকটী যাইতেছে, উহাকে ডাকিয়া আন ত।" সে লোকটী সাহেবের আদেশে ইঁহাকে ডাকিয়া আনিলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিতেছিলে?"

নবদ্বীপ। কৈ সাহেব আমি ত বিশেষ কিছু বলি নাই! তবে তোমার কথায় তোমারই ধর্ম্মে দোষ পড়ে এবং যিশুর উদারতাপূর্ণ বাক্যে সংকীর্ণতা দোষ ঘটে, তাই বলিতেছিলাম।

সাহেব। তুমি কোথায় থাক?

নবদ্বীপ। এই পুরীর মধ্যে ঝাঁজপীটা মঠ নামক একটী স্থান আছে সেইস্থানে।

সাহেব। সেস্থানে আর কে আছে?

নবদ্বীপ। সাহেব! তুমি যেমন একজন পাদ্রী, সে স্থানেও আমাদের পাদ্রী (গুরু) এবং তাঁহার অনুগত অন্যান্য অনেক লোক আছেন।

সাহেব। তোমার পাদ্রীর সহিত আমি দেখা করিতে পারি?

নবদ্বীপ। কাহারও সহিত দেখা করিতে তাঁহার আপত্তি নাই, তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় হইলে ভাল হয়।

সাহেব। কাল বেলা চারিটার সময় আমি তোমার পাদরীর সহিত দেখা করিব।

নবদ্বীপ 'আচ্ছা তাহাই হইবে,' বলিয়া গমন করিলেন। সাহেবও পূর্ব্ববৎ নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পরদিন ঠিক বেলা চারিটার সময় চারি পাঁচজন লোক সঙ্গে লইয়া সাহেব ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। যে কেহই ইঁহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করা বাবাজী মহাশয়ের স্বাভাবিক নিয়ম। আজ সাহেবকে যেমন করযোড়ে প্রণাম করিলেন, অমনি সাহেবও একটু বিস্মিতভাবে করযোড়ে প্রতিপ্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় সাহেবকে আলিঙ্গন দিয়া আসনে বসাইলেন। ইঁহার ব্যবহারে সাহেব মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি উপবেশন করতঃ বিশেষ অনুরোধপূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়কে নিজের নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপ্ ইংরাজী জান্‌তা হ্যায় ?"

বাবাজী। সাহেব! আমি একমাত্র বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা জানি না!

সাহেব। কেন আমি ত শুনিয়াছি আপনি নাকি বহু ভাষা জানেন?

বাবাজী। জানা না জানা কি, আমি একমাত্র বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিয়া সুখী হই না।

সাহেব। আচ্ছা আপনাদের কোন ধর্ম্ম ?

বাবাজী। স্বাভাবিক কথায় বলিতে হইলে আমাদের হিন্দুধর্ম্ম; তবে এই হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে আবার উপাস্যভেদে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য,

সৌর, বৈষ্ণব এই পাঁচ প্রকার বিভাগ আছে; আমরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী।

সাহেব। আপনারা কাহার আরাধনা করেন?

বাবাজী। আমাদের উপাস্ত রাধাকৃষ্ণ—নিতাইগৌর।

শুনিয়া সাহেব কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই বস্ত্রহরণ, তৎপরে প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল ননীচুরি, জলকেলি, রাসলীলা, পুতনাবধ, বৎসাসুরবধ, দান, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলা যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কিন্তু স্থিরভাবে শুনিতেছেন। এক একবার ইঁহার দেহে এমনই কম্প হইতেছে যে দেখিয়া সাহেব স্তম্ভিত। কখনও সর্ব্বাঙ্গে এরূপ পুলক হইতেছে যে, ঠিক যেন সিমুল বৃক্ষের ন্যায় দেখা যাইতেছে। দুইটী চোখের জলে মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। সাহেব কথা বলিতেছেন এবং ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা-দর্শণে বিস্মিত হইতেছেন। ক্রমে সাহেব লীলাগত দোষ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কিন্তু আনন্দের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, আপনারা যাহার উপাসনা করেন, সে ঘোর লম্পট, মিথ্যাবাদী, চোর, প্রবঞ্চক, স্ত্রী-হত্যাকারী।

বাবাজী। ঠিক্ কথা।

সাহেব। আচ্ছা আপনারা গোহত্যাকে নিন্দনীয় কার্য্য বলেন। আপনাদের ঈশ্বর গোবধ করিয়াছেন। তবে তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন কেন? দেখুন আমাদের যিশু কখনও কোন গর্হিত আচরণ করেন নাই; এমন কি নিজে বহু বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও জীবকে দয়া করিয়াছেন—জীবের জন্ম প্রাণ দিয়াছেন।

বাবাজী। ঠিক্ কথা! আমার ধর্ম্ম যিশুকে কখনই মন্দ বলে না। যিশু একজন ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ; এমন কি যিশু একজন ঈশ্বরের অবতার একথা বলিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি।

সাহেব এ কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বাবাজী মহাশয়ের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন আমি আপনার ধর্ম্মকে এবং আপনার ঈশ্বরকে এত নিন্দা করিলাম কিন্তু আপনার ক্রোধ না হইয়া এত আনন্দ হইল কেন? এইটী আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, পরে অন্য কথা শুনিব। আপনি যদি আমার ধর্ম্মকে বা আমার যিশুকে ইহার শতাংশের একাংশও নিন্দা করিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমার চিত্ত খারাপ হইত।

বাবাজী। সাহেব! আমাদের যিনি ঈশ্বর তিনি পূর্ণ পূর্ণতম সচ্চিদানন্দময় ভগবান্; তাঁহার নিন্দা নাই। দোষ বলিয়া জিনিষটী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার চরিত্রে আপনি যে কয়টী দোষ দেখাইলেন, আমরা উহা অপেক্ষা তাঁহাকে আরও অধিক দোষে দোষী বলিয়া স্তব করিয়া থাকি। যে বস্তুর হেয় ও উপাদেয় অংশ থাকে, তাহার পূর্ণতা কোথায়? কারণ হেয়াংশ বাদ দিয়া উপাদেয়াংশ গ্রহণ করিলে পূর্ণবস্তু পাওয়া যায় কি? তিনি অংশী, জীব অংশ—তিনি পূর্ণ, জীব অণু—তিনি প্রভু, জীব দাস। জগতের জীব সকল তাঁহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে; কাজেই তাঁহার পর কেহই নাই। তবে পরস্ত্রীহরণ-দোষ তাঁহাতে সম্ভব কিরূপে হইতে পারে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তাঁহার নিত্য পরিকরগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবানের নিত্যপ্রেয়সী ব্রজগোপীগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার যত কিছু লীলাখেলা নিজ পরিকরগণের সঙ্গেই আচরিত হইয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজমুখে বলিয়াছেন—

"পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে!"

অসুরগণ নানারূপ দেহধারণপূর্ব্বক স্ত্রী, বালক, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৈষ্ণবদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচারপরায়ণ হইলে ভগবান্ তখন অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের বিনাশসাধন করতঃ তাহাদিগকে সেই পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। ভগবান্ চিরকাল গোগণকে পালন ব্যতীত বিনাশ করেন না বা কেহ করিলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। তবে বৃষ বা বৎসরূপ ধারণ করিয়া যখন অসুরগণ আগমণ করিয়াছিল, তখন তাহাদিগের প্রাণবধ করিয়া অসুর-যোনি হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিকের দ্বেষভাব, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। জগতের দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল বস্তুজাত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। তিনি মঙ্গলময়; জীবের যখন যাহা প্রয়োজন, তিনি ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি সূত্রধর, আমরা তাঁহার নাচের পুতুল। তাঁহার যেরূপ নাচাইবার ইচ্ছা হইতেছে, সেইরূপ নাচাইতেছেন। আমাদের স্বতন্ত্র চেষ্টা করার কোনও সাধ্য নাই।

সাহেব এতক্ষণ বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া নীরবে তত্ত্ব-মীমাংসা শুনিতেছিলেন, এইবার প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এতদিনে বুঝিলাম, এই বৈষ্ণবধর্ম্মই আদি এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে দ্বেষহিংসা রহিল, ততক্ষণ সে হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আসিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। এতদিনে আমার ভ্রম ঘুচিল। আচ্ছা আপনাদের ঈশ্বরের কি কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, না যে যেরূপ মনে করে তাই?

বাবাজী। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বশব্দ এবং সর্ব্ববিধ স্পর্শের আকরস্বরূপ। জগতে দৃশ্যাদৃশ্য যত কিছু রূপ আছে, সমস্তই ঈশ্বরের। তবে কেহ পূর্ণ, কেহ অংশ, কেহ অবতার,

কেহ অবতারী, কেহ কলা, কেহ বিলাসরূপে জগতে নানাবিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। এই পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপে ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। আমরা সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জীব; শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, ম্লেচ্ছ, যবন, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি মত লইয়া ভেদ কল্পনা করি। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর জগতপিতার নিকটে সকলেই সমান। তাঁহাকে কালী, কৃষ্ণ বা শিব বলিয়া ডাকিলে তিনি শুনিবেন, আর আল্লা, খোদা, যিশু বলিয়া ডাকিলে তিনি শুনিবেন না, এ ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। দেশ, কাল, পাত্র বা রুচি অনুসারে আচার, ব্যবহার, বেশ, ভূষা, আহারবিহারের পার্থক্য দেখিয়া সেই ভেদটা ঈশ্বরের উপর আরোপ করিলে, তাঁহার জগদীশ্বর, জগৎপিতা, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, ভুবনমোহন, পূর্ণপূর্ণতম, আদিপুরুষ প্রভৃতি নামের খর্ব্বতা করা হয়। এই জগন্নাথ-দেবকে বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, ব্রাহ্মেরা ওঙ্কারস্বরূপ এবং কেহ নারায়ণ, কেহ দ্বারকানাথ, কেহ ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রভৃতি ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। এস্থানে অনেক মুসলমান জগন্নাথের কৃপায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহাদের নিজহস্তের তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য জগন্নাথ গ্রহণ করিয়াছেন শাস্ত্রে দেখা যায়।

সাহেব। "জগন্নাথকে কিছু ভোগ দিতে আমার মনে অভিলাষ হইয়াছে।" এই বলিয়া পকেট হইতে দশটাকার একখানি নোট বাহির করিলেন।

বাবাজী। সাহেব আপনি যদি জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনার এই টাকা দ্বারা তাঁহার ভোগ দিতে পারি।

সাহেব। প্রসাদ আপনারা কাহাকে বলেন? যদি ভাত হয় তবেত আমার সাধ্য নাই। কারণ আমরা ভাত খাইতে পারি না।

বাবাজী। না, কেবল ভাতকেই যে আমরা প্রসাদ বলি তাহা নয়।

ভগবান্ যাহা কিছু গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকেই মহাপ্রসাদ বলা যায়।

সাহেব। ভাত ছাড়া যাহা আপনার ইচ্ছা আমি খাইতে পারি আপত্তি নাই। এই বলিয়া দশ টাকার নোটখানি বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিতে গেলে নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "সাহেব! আমার হাতে দিন, উনি টাকা স্পর্শ করেন না। সাহেব যেন আরও বিস্মিতভাবে নোট খানি নবদ্বীপের হাতে দিয়া সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! সাহেব চলিয়া গেলে একজন বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আচ্ছা সাহেব এত কৃষ্ণনিন্দা করিল, আপনার মনে কোনও কষ্ট হইল না কি?"

বাবাজী। সাহেবের মুখে কি তোমরা কৃষ্ণনিন্দা শুনিলে? তোমাদের মনে ধারণা—তোমরা যাহা বল বা ব্যবহার কর, সেইটাই ভাবরাজ্যের কথা; আর অপরের ব্যবহার নিন্দার মধ্যে পরিগণিত; তোমরা কৃষ্ণকে লম্পট, চোর, কপট, শঠ, প্রবঞ্চক, ধৃষ্ট বলিতে পারিবে; কারণ তোমাদের গোপীভাব, আর সাহেবের কি গোপীভাব হইতে নাই? ভাব কাহারও কেনা নয়। বিশুদ্ধ হৃদয় হইলেই ভাব প্রস্ফুটিত হইবে। ভাব ম্লেচ্ছযবন মানে না, কৃষ্ণ রূপগুণ বাছেন না; তিনি ভাবগ্রাহী, বিশুদ্ধ ভাব হইলেই তাহার নিকট বাঁধা।

এইরূপে সঙ্গিগণের হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করিয়া পাদ্‌রী সাহেবের সেই টাকার সঙ্গে আর পনের টাকা যোগ দিয়া মোট পঁচিশ টাকা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পর দিবস নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য জগন্নাথদেবের ভোগ হইয়া আসিল। পাদ্‌রী সাহেব কোথায় থাকেন কেহই জানে না। এ বিষয়ে পরস্পর আন্দোলন হইতেছে, তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের এত ব্যস্ত হইতে হইবে না, মহাপ্রসাদ আকর্ষণ করিলে তিনি আপনিই আসিয়া পৌঁছিবেন।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। বেলা চারিটার সময় পাদ্রী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ অভ্যর্থনাদি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। নানারূপ মিষ্টালাপ হইতে লাগিল। পাদ্রীসাহেব বলিলেন, "আমি বহু দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহুলোকের সহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্তু আপনার সহিত ব্যবহারে আমার যেরূপ হৃদয়ের অবস্থা হইয়াছে, এরূপ আর কখনই হয় নাই। আমার ইচ্ছা হয় আপনার ন্যায় সমদৃষ্টি উদারস্বভাব সাধুর সহিত জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করি।"

বাবাজী। সাহেব! জীব নিমিত্তমাত্র। যত কিছু জাগতিক ব্যাপার একমাত্র ভগবদিচ্ছা; আমরা তাঁহার নাচের পুঁতুল; তিনি যেরূপভাবে নাচাইতে ইচ্ছা করিবেন, আমাদিগকে সেইরূপে নাচিতে হইবে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"আপন-ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে। কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে॥

ইত্যাদি নানারূপ ইষ্টালাপের পর সাহেবকে জগন্নাথের মহাপ্রসাদের কথা বলায় তিনি অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া একটী সঙ্গী লোককে নিজবাসায় মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতে বলিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশ-অনুসারে একখানি রজের থালায় নানাবিধ মিষ্টি প্রসাদ সাজাইয়া সাহেবের নিকট আনিবামাত্র সাহেব মাথার টুপি খুলিয়া করযোড়ে মহাপ্রসাদের অভ্যর্থনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত লোকদ্বারা মহাপ্রসাদ বাসায় পাঠাইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে গেলেন। এই হইতে পাদ্রী সাহেব যতদিন পুরীতে ছিলেন, প্রায় প্রতিদিনই বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আন্তরিক সুখানুভব করিতেন।

ভক্তের পাদপ্রহার।

শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস মহাত্মা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অতি অল্পদিন পূর্ব্বে লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ তখনও সুদর্শনবল্লভে (নীলমণি ব্রহ্মের কোঠায়) অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নরেন্দ্র সরোবরের উপকূলবর্ত্তী প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সমাধিস্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনমানসে গমন করিতেছেন—সঙ্গে অনেক লোক. প্রভুপাদের শিষ্যও দুই তিনজন রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ অতিক্রম করিয়া প্রভুপাদের পূর্ব্ববাসস্থান সুদর্শনবল্লভের নিকট যেমন কীর্ত্তন আসিয়াছে, অমনি বাবাজী মহাশয় সেইস্থানে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক রজে গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রভুপাদের শিষ্য বরিশাল জেলার জনৈক ভক্ত নাচিতে নাচিতে সজোরে বাবাজী মহাশয়ের বুকে একটী পদাঘাত করিলেন। ক্রমে বাবাজী মহাশয় যেমন গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, অমনি উক্ত মহাত্মা তাঁহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে পূর্ব্ববৎ পাদপ্রহার করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ বা কাঁদিয়া অধীর, কেহ কেহ বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় উঠিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং এক একবার আনন্দে বিভোর হইয়া প্রহারকারী মহাত্মাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকায় কাহার সাধ্য? দেহ হইতে যেন অপূর্ব্ব একটী তেজ বাহির হইতেছে। সঙ্গিগণের তাৎকালিক অবস্থাদর্শনে বাবাজী

মহাশয় কি বুঝিলেন, জানি না; কিন্তু উক্ত প্রহারকারী মহাত্মাকে নিজ সম্মুখে রাখিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। সিংহদ্বারে আসিবামাত্র উক্ত মহাত্মার মনে কি ভাবের উদয় হইল অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন। দুইহাতে করিয়া রজ বাবাজী মহাশয়ের নাকে মুখে মারিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনে বিভোর। সঙ্গিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এই জুগুপ্সিত ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কি করেন? পাছে বাবাজী মহাশয়ের প্রাণে আঘাত লাগে, এই ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ক্রমে মহাত্মার ভাবের মাত্রাটা যখন সীমা-অতিক্রম করিল, তখন বটু (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী) একটু কুপিতভাবে উক্ত মহাত্মার হাত ধরিয়া নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অদোষদর্শী উদারপ্রকৃতি ক্ষমার মুর্ত্তি বাবাজী মহাশয় বটুকে নানারূপ কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করতঃ সেস্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া উক্ত মহাত্মাকে সুমিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করতঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে বাসায় পাঠাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অক্রোধ-পরমানন্দ সরলস্বভাব মহাপুরুষগণ কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না একথা সুসত্য; কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবানের প্রাণে উহা সহ্য হয় না। ভগবান্ ভক্তহৃদয়ের ব্যথা সহ্য করিতে পারেন না। চিরকালই সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের বিনাশের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ। প্রহারকারী মহাত্মার রাত্রে ভয়ানক জ্বর হইল এবং বাবাজী মহাশয়ের যে যে স্থানে প্রহার করিয়াছিলেন, নিজের সেই সেই স্থানে ভয়ানক বেদনা হইল। এমন কি, যন্ত্রণায় রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, চিত্তে বড়ই অনুতাপ হইয়াছে। কাহাকে বলিবেন? নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ মনে করিয়া অতিকষ্টে সে রাত্রি যাপন করতঃ যেমন প্রভাত হইল,

অমনি অপর একটী গুরুভাইকে সঙ্গে লইয়া একেবারে ঝাঁজপীটা মঠে উপস্থিত হইলেন। সেদিন আবার বাবাজী মহাশয়ের কি মনে হইয়াছে, রাত্রে ঝাঁজপীটা মঠে না থাকিয়া বড় হরিশ বাবুর বাড়ী গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বসিয়া আছেন, এই সময় পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা আসিয়া ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। মুখে আর অন্য কোনই বুলি নাই—গদগদকণ্ঠে কেবল বলিতেছেন—"আমি ঘোর পাষণ্ড, নরাধম, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়া গত রাত্রি কাটাইয়াছি। কেবল উঠিবার শক্তি ছিল না বলিয়াই আপনার নিকট আসিতে পারি নাই। আমার বাহিরে যতটা তাপ দেখিতেছেন, অন্তরে ইহা অপেক্ষা শতগুণ তাপ জ্বলিতেছে। আমার বিশ্বাস, আপনি আমায় কৃপা না করিলে—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন না হইলে আমার এ যন্ত্রণার উপশম হইবে না। আমি আপনার উপর যেরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই গুরুদেব আমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন। গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হইলে তাহার ত নরকেও স্থান নাই। তবে আমার কি গতি হইবে?" বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এমন কি বাবাজী মহাশয় শপথ করিয়া বলিতেছেন, "বাবা! আমার মনে কোনওরূপ কষ্ট হয় নাই; আপনি স্থির হইয়া নাম করুন, হৃদয়ের তাপ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে—পরম শান্তিলাভ হইবে।" বলিলে কি হইবে? বাবাজী মহাশয় যতই বলিতেছেন "আমার নিকটে অপরাধ নাই", ততই উক্ত মহাত্মার হৃদয়ের তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া বাবাজী

মহাশয়ের হৃদয় গলিল—করুণা জন্মিল। বলিলেন, "দেখ বাবা! যদি তুমি কোনও অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক, তবে তোমার গুরুদেবের নিকট যাও; তিনি প্রসন্ন হইলেই তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। একমাত্র শ্রীগুরুদেব ভিন্ন অপর কেহই তোমার অপরাধ গ্রহণ করে নাই বা করিতে পারেও না। মানব যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া গুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ না করে, ততদিন তাহার উপর সাধারণের অধিকার থাকে এবং নিগ্রহানুগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যেমন শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করে বা অসমর্থ হেতু গুরুদেব কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন হইতে আর তাহার উপর কাহারও অধিকার রহিল না। এমন কি গুরু-সমর্পিত দেহের উপর সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রেরও কোনরূপ অধিকার থাকে না। তাই সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ রুষ্ট হইলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হইলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥"

শ্রীগুরুপদাশ্রিত ব্যক্তি যদি কাহারও প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে বা কাহারও প্রাণে ব্যথা দেয়, তবে সেই সমস্ত ঘটনা অন্তর্য্যামী গুরুদেবের নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা জন্মে; কাজে কাজেই গুরুদেবের নিকট অপরাধ হয়। লোক বুঝিতে না পারিয়া যথা তথা অপরাধ শান্তির চেষ্টা করে। তুমি যাও—প্রভুর সমাধির নিকট গমন-পূর্ব্বক প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে জানাও, শান্তি পাইবে। এ ত পরমার্থ-রাজ্য, ইহার ত কথাই নাই; সাধারণ প্রাকৃতরাজ্যেও যদি কাহারও স্ত্রীপুত্র বা অন্য কোন অধীনস্থ অপর ব্যক্তি কাহারও প্রতি কোনও অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহার শাস্তির জন্য সেই ব্যক্তিকে না জানাইয়া যদি কেহ বিচার করিতে যায় আইনতঃ সেই বিচারক দোষী

হইবে না কি? নিজক্ষমতা থাকিলেও মর্য্যাদালঙ্ঘনভয়ে কেহ কখন কাহারও অধিকারস্থ ব্যক্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। তুমি আমার এই কথা অনুসারে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি নিজ মহত্ত্বগুণে তোমাকে ধূলা ঝাড়িয়া কোলে লইবেন।” শুনিয়া উক্ত প্রহারকারী মহাত্মা বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক দ্রুতগতি প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপাদের সমাধিস্থানে গমন করিয়া অতিশয় ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই দিন হইতে উঁহার এমনই হৃদয়ের গতি হইল যে, অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সমুদ্রস্নানে যাইবার সময় প্রতিদিন বাবাজী মহাশয়ের চরণদর্শন করিয়া নানারূপ কাতরতা-পূর্ণ বাক্যে নিজদোষ ক্ষমাপ্রার্থনা না করিয়া যাইতেন না। এমন কি বাবাজী মহাশয়ের গণের মধ্যে ছোট বড় কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে বিনীতভাবে নিজ অপরাধ জন্য দণ্ড প্রার্থনা করিতেন। এইরূপভাবে উক্ত মহাত্মা প্রায় দুই বৎসরকাল প্রকট থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

বাঞ্ছানিধির স্বপ্নে মন্ত্রপ্রাপ্তি।

একদিন বেলা অনুমান নয়টার সময় বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপীটা মঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সম্মুখে বসিয়া আছেন এবং চারিদিকে অনেক ভক্তগণ বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই সময় আন্দাজ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বর্ষীয় একটী লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই “এহিত সেহি” বলিতে বলিতে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইয়া শশব্যস্তে আগন্তুকের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না দেখিয়া বাবাজী মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বামহস্তে উঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

ইঁহার স্পর্শ পাইবামাত্র আগন্তুকের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং অবিরতধারে দুটি চোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু মুখখানি আনন্দময়। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পুলকাবলী শোভা পাইতে লাগিল। উহার অবস্থাদর্শনে সকলেরই মনে হইতে লাগিল, এই ভাগ্যবান্ কোনও পরমানন্দময় বস্তু হৃদয়ে লইয়া আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। কিছুতেই বাহ্যজ্ঞান হইতেছে না দেখিয়া অনেকের অনুরোধে বাবাজী মহাশয় উহার বক্ষঃস্থলে নিজচরণ অর্পণ করিলেন। স্পর্শ পাইবামাত্র ভক্ত নয়ন উন্মীলন করতঃ দুই হাতে শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া উহার অস্থিরতার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আগন্তুক ভক্ত বলিতে লাগিল, "বাবা! দশবারদিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রে আমাদের গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন হইতেছিল। আমি সেই সংকীর্ত্তনের সময় অতি ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে জানাইতেছিলাম, —'হা প্রভু! আমি অদীক্ষিত রহিলাম? আমার ভাগ্যে কি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ঘটিবে না? আমি ঘোর অবিশ্বাসী; আমার মনের মত গুরু মিলাইতে একমাত্র তুমিই সমর্থ;' ইত্যাদি।" ক্রমে কীর্ত্তন শেষ হইলে আমি বাড়ীতে আসিয়া শয়ন করিলাম। শেষরাত্রে স্বপ্নে দেখি যে দীর্ঘাকার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটী লোক হাসিতে হাসিতে আমার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, "তোর ভয় কিরে? তোর প্রতি নিতাইচাঁদের কৃপা হইয়াছে। আগামী কল্য রাত্রে অতি পবিত্রভাবে একাকী একটী পবিত্র স্থানে শয়ন করিয়া থাকিস্, সদ্‌গুরু লাভ হইবে।" আমি অনিমেষনয়নে সেই হাসিমাখা মুখখানির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন। ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখি, কেহ

কোথাও নাই—রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ভাবিলাম, এ কি আমার মনের কল্পনা, না কোন মহাপুরুষের কৃপা! যাহা হউক মহাপুরুষের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করা যাক্‌, ফলেন পরিচীয়তে। ক্রমে রাত্রি হইল। সে রাত্রে কিছু আহার করিলাম না। বাহির বাড়ীতে একখানি ছোট ঘরে পরিষ্কার কাপড় পরিয়া একটী সপের উপর শয়ন করতঃ স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম। কোথা দিয়া রাত্রি চলিয়া গেল জানি না। শেষরাত্রিতে আপনি আমার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন.—'বাপ বাঞ্ছানিধি! তোর জন্মজন্মান্তরের অশেষ পাপতাপ সকল আমি গ্রহণ করিলাম। তোর ভয় নাই; এই পরমার্থধন প্রদান করিতেছি,—সযত্নে রক্ষা কর, শান্তি পাইবি।' এই বলিয়া এই নরাধমকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক * * * বলিতে বলিতে ভক্তটীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, "বল বাবা! পতিত-পাবন নিতাইচাঁদের কৃপার কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াই।" ভক্তটী তখন গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"দক্ষিণ-কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আমি শ্রীচরণ ধরিয়া যেমন দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, আপনি হাসিতে হাসিতে "প্রাপ্ত বস্তু যত্নে রক্ষা কর; আমি পুরী চলিলাম, সময়ে দেখা হইবে।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে জাগ্রত হইলাম। অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া এক একবার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না; আবার 'অমূল্য নিধি পাইয়া কোনই যত্ন করিতে পারিলাম না—দুইটী প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে পারিলাম না—কৃপা করিয়া যাহা প্রদান করিলেন, তাহারও সকল মনে রহিল না' ভাবিয়া হতাশপ্রাণে চিন্তা করিতে করিতে অধির হইয়া পড়িলাম। প্রাণে বড়ই আক্ষেপ হইল,—"হা

প্রভো। কৃপাপরবশ হইয়া অভাগার উদ্ধারের জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করিলেন; কিন্তু কর্ম্মদোষে কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। প্রভু! পুরী চলিয়া গেলে! পুরীতে কত সাধুমহাত্মা আছেন। আমি কি পাপনয়নে তোমাকে চিনিয়া লইতে পারিব?” কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সময় কাটাইতে লাগিলাম। প্রায় সর্ব্বদার তরেই আমি বাহির বাড়ীর সেই ঘরখানিতে থাকি। দেখিতে দেখিতে তিন দিন গত হইল। রাত্রিতে সেই প্রথমদৃষ্ট মহাপুরুষটী আসিয়া আমায় বলিলেন, “কি রে তোর ত অভীষ্ট বস্তু লাভ হইয়াছে, আবার অত ব্যাকুল কেন?” আমি তখন কাতরভাবে বলিলাম,—“প্রভো! আপনার দয়াতেই আমি পাইয়াছি; কিন্তু তিনি যাহা দিলেন, সে সব আমার কিছুই মনে নাই এবং কৃপাময় শ্রীগুরুদেবের কোন পরিচয়ও পাইলাম না। আপনাকে আমার উপায় বিধান করিতেই হইবে।” এই বলিয়া যেমন কাঁদিতে লাগিলাম, অমনি তিনি কৃপা করিয়া আমাকে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন,—“দেখ্, এই তোর গুরুদেবের নিজহস্তের লেখা মন্ত্রের কাগজ। অভ্যাস করিয়া জপ কর্। তোর গুরুদেবের নামধাম আমি কিছুই বলিব না। পুরী ঝাঁজপীটা মঠে যাইয়া তোর অভিষ্টদেব খুঁজিয়া লইবি।” এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তাই আমি অনুসন্ধান করিতে করিতে দুই দিন পরে আজ আপনাকে পাইয়াছি। ঠিক আপনিই আমাকে কৃপা করিয়াছেন।

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদ তোমায় কৃপা করিয়াছেন, আমায় নিমিত্তের ভাগী কর কেন?

ভক্ত। প্রভো! আমি জানি আপনিই সাক্ষাৎ নিতাই; তাহা না হইলে আমা হেন পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন আর কে আছে?

বাবাজী। ছি! ওকথা বলিতে নাই! আমি নিতাইচাঁদের দাসানুদাসেরও যোগ্য নই; তবে তিনি কাঠের পুতুলের দ্বারা কৃপা করিতে পারেন। তোমার সেই লেখা কাগজখানা আছে কি?

ভক্ত। এই যে প্রভু! আমি সঙ্গে আনিয়াছি।

বলিয়া নিজ ওড়নী হইতে একখানি কাগজ খুলিয়া বাবাজী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। বাবাজী মহাশয় কাগজখানি পাইয়া বিস্মিতভাবে পড়িতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই বাবাজী মহাশয়ের হাতের লেখা দেখিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যইত এ আপনার হাতের লেখা। ধন্য ভাগ্যবান্ ভক্ত! তোমার বহুজন্মের সুকৃতির ফলে এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে কৃপালাভ করিলে। অহো করুণাময়! তুমি যাহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা কর, তাহার যে কোনই অভাব থাকে না, তাহা আমরা এই মহাভাগ্যবান্ ভক্তদ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। ভাই! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর, যেন তোমার মত সম্পূর্ণ না হউক, অন্ততঃ কণামাত্র শ্রীগুরুকৃপা লাভ করিতে পারি।" বলিয়া সকলেই ভক্তটীকে প্রণাম করিলেন। ভক্তটীও শশব্যস্তে সকলের চরণ বন্দনা করিল। ইত্যবসরে নবদ্বীপ দাদা হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আগন্তুক ভক্তটী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায় পরম দয়াল সেই মহাপুরুষ। ইনিই ত আমাকে এই কাগজ দিয়াছিলেন? ইনিই ত আমাকে প্রথমদিন দর্শনদানে অভয়বাণী প্রদান করিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। আমাহেন পতিত জীবের জন্য ইঁহারই ত প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আহা! এত দয়া কি মানুষে সম্ভবে? ইনি কখনই মানুষ নন।" এইরূপ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপদাদার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া নবদ্বীপদাদা বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"কি ভাই!

কি হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন একজন উপস্থিত ভক্তটীর কথিত আমূল বৃত্তান্ত নবদ্বীপদাদার নিকট বর্ণনা করিল। শুনিয়া নবদ্বীপ দাদা সজল-নয়নে ভক্তটীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অহৈতুকী কৃপার জয় দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিলেন; 'নিতাইচাঁদ জীব উদ্ধারের জন্য কত যে কৌশল করিতেছেন—কত প্রকারে যে জীবকে উন্মুখ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। মানুষ কেবল নিমিত্তমাত্র।"

"স্বতন্ত্র পুরুষ স্বেচ্ছাময় নিজগুণে।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে॥
পরম করুণাময় গৌর নিত্যানন্দ।
না ভজিনু হেন প্রভু মুঞি ছার মন্দ॥
পতিতেরে কোল দিয়া করেন আত্মসাৎ।
শাস্ত্রবাক্য নহে সুধু দেখহে সাক্ষাৎ॥"

বলিতে বলিতে সাশ্রুনয়নে দুটী বাহু প্রসারণপূর্ব্বক বাঞ্ছানিধিকে বলিলেন, "এস বাবা! পরমদয়াল করুণাময় নিতাইচাঁদের প্রত্যক্ষ কৃপার পাত্র তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমার এই অবিশ্বাসী হৃদয় ধন্য করি।" বলিয়া প্রেমে গরগরভাবে ভক্তটীকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলে চারিদিকে **"নিতাই গৌর হরিবোল"** বলিয়া জয় দিয়া উঠিলেন। বাঞ্ছানিধি কয়েক দিন মঠে থাকিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশে দেশে চলিয়া গেলেন।

বালকদিগের সহিত হোরিখেলা।

দেখিতে দেখিতে ফাল্গুনমাস আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বাবাজী মহাশয়ের বুকে ও পার্শ্বে বেদনা হইয়াছে।

রাজবৈদ্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক **শ্রীমাগুনী মিশ্রকে** ডাকা হইল। তিনি ইঁহার হাত দেখিয়া নানারূপ ঔষধের ব্যবস্থা করতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। এমন কি, সঙ্গিগণকে বিশেষ ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন,—"দেখ, যদি কোনরূপে ঠাণ্ডা বাতাস বা জল ইঁহার শরীরে স্পর্শ হয়, তবে কিন্তু জীবনসংশয় হইবে। সাবধান! যেন কোনরূপ অত্যাচার না হয়।" সঙ্গিগণ কবিরাজ মহাশয়ের কথানুসারে বিশেষ সাবধানে ইঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া ঘরটী গরম রাখিবার জন্য এক কোনে আগুন রাখা হইল। বুকে ফ্ল্যানেল বাঁধিয়া দেওয়া হইলে ইনি নানারূপ গরম বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা নাই। এই অবস্থাদর্শনে সঙ্গিগণ সকলেই বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইলেন। বেলা অনুমান তিনটার সময় বড় হরিশ বাবুর ছোট ছেলে, উকীলবাবু হরিশচন্দ্র ঘোষের দুই ছেলে এবং অন্যান্য দশ বারটী ছেলে একত্রিত হইয়া ঝাঁজপীটা মঠে উপস্থিত হইল। সকলের হাতে এক একটী পিচকারী। বাবাজী মহাশয় যে ঘরে শুইয়াছিলেন, সেই ঘরের দরজার নিকট গিয়া বড় হরিশ বাবুর ছেলে বলিল, জ্যেঠা মহাশয়! আমরা আপনার সঙ্গে পীচকারী খেলিতে আসিয়াছি। আপনি উঠুন, খেলিবেন।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কে রে?" ছেলেরা বলিল, "আমরা পিচকারী খেলিতে আসিয়াছি।"বাবাজী মহাশয় ব্যস্তসমস্তভাবে বুকের ফ্ল্যানেল প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে বাহিরে আসিলেন। সঙ্গিগণ নানাপ্রকারে বাধা দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না! বাবাজী মহাশয় ইঁহার স্নানবেদীর নিকট পাথরের কুণ্ডে জল ভরিতে আদেশ করিয়া একজনকে রঙ্ আনিতে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় বড় একটী পিচকারী নিলেন

এবং সঙ্গিগণ ছোট ছোট আট দশটা পীচকারী লইলেন। ক্রমে কুণ্ডে জল ভরা হইয়া রঙ্ গোলা হইল। ললিতাদাসী, কুসুমমঞ্জরীদাসী, রসমঞ্জরী দাসী * ও অন্যান্য সঙ্গিগণ এবং আগন্তুক বালকগণ সকলে একদিকে, বাবাজী মহাশয় একা একদিকে।

খেলা আরম্ভ হইল। সকলেই আত্মবিস্মৃত—কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই; বাইশ তেইশটা পীচকারী বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া অবিরতধারে বর্ষণ করা হইতেছে। এক এক সময় বাবাজী মহাশয় সকলকে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে হটাইয়া দিতেছেন। সকলেই খেলারসে মাতোয়ারা। সকলেরই চেষ্টা বাবাজী মহাশয়কে পরাস্ত করা; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। বাবাজী মহাশয় উঁহাদের উপরে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অজস্রধারে পীচকারী মারিতেছেন। খেলায় হারিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "এক কুণ্ড হইতে রঙ্জল লওয়া আমাদের পক্ষে অসুবিধা হইতেছে; অতএব আমরা দুই দুই জনে এক এক পাত্রে করিয়া রঙ্ লই, আপনি একা কুণ্ডের জলে খেলুন, দেখি কেমন করিয়া হারাইতে পারেন।" বাবাজী মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলে দুই দুই জনে এক এক পাত্র রঙ্জল লইয়া বাবাজী মহাশয়ের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক খেলা আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের বিকাশ! চারিদিক্ হইতে সকলে অবিশ্রান্তভাবে বাবাজী মহাশয়ের উপরে পিচকারী মারিতেছে; ইনি একা একটী পিচকারী লইয়া সকলের সহিত সমভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। সকলেই দেখিতেছেন, যেন সকলকে ছাড়িয়া বাবাজী মহাশয় কেবল আমার সঙ্গেই পীচকারী খেলিতেছেন।

---

* ইঁহার পূর্ব্বনাম রঘুনাথ দাস। অউলিয়া মঠে ঠাকুরসেবার ভার প্রথমে ইঁহার উপরেই ছিল। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও ভগবৎ-সেবাপ্রভাবে ইঁহার হৃদয়ে গোপীভাবের সঞ্চার হয়! তদানুকূল্য হেতু কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি সখীবেশ অবলম্বন করেন।

সকলেই সমকালীন বাবাজী মহাশয়ের মুখ দেখিতে পাইতেছে। সব লালে লাল! দুইজন লোক সমানভাবে জল আনিয়া কুণ্ডে ঢালিতেছে। তথাপি কুলাইতে পারিতেছে না। অবশেষে বাবাজী মহাশয় ঘটী ভরিয়া এক এক জনের উপর রঙ্ ঢালিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলেই নিজ নিজ রঙ্‌পাত্র ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত এইরূপভাবে মধুর হোরিখেলা খেলিয়া বালকদিগের সহিত নানাবিধ মিষ্টান্ন পক্কান্ন মহাপ্রসাদভোজন-কৌতুকরঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাইয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

এতক্ষণে সঙ্গিগণের চৈতন্য হইল—সকলেই ভাবিয়া অস্থির! পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ অসুস্থ ব্যক্তির উপর আমরা অবিরতধারে ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করিয়াছি! না জানি কি বিপদই হইবে!" বলিয়া শশব্যস্তে ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া শুক্না বহির্ব্বাস পরিতে দিলে বাবাজী মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া বাহিরে বসিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই নিজ নিজ ব্যবহারে লজ্জিত—কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। সায়ংকাল উপস্থিত, ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইলে বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিশ্রাম করিলেন। কি পথ্য হইবে কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছেন না, এই সময় বাবাজী মহাশয় নিজেই বলিলেন, জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আছে কি?

ললিতা দাসী বলিল—"আজ্ঞে কবিরাজ মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

বাবাজী। আচ্ছা, সেকথা যাহার বুঝিবার, তিনি বুঝিবেন। মহাপ্রসাদ আছে কিনা তাই বল।

ললিতা। মহাপ্রসাদ আছে বটে ; কিন্তু ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। আচ্ছা লইয়া আইস।

তখন ললিতাদাসী একখানি পাথরের থালায় পারস করিয়া আনিলে বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সেবা করতঃ বিশ্রাম করিলেন। সকলেই চিন্তিত যে রাত্রে হয়ত খুবই অসুস্থ হইবেন। পরদিবস প্রাতে পূর্ব্বোক্ত রাজবৈদ্য মাগুণী মিশ্র মহাশয় আসিয়া দেখেন, বাবাজী মহাশয় অনাবৃত-গাত্রে বসিয়া আছেন। তখন তিনি ললিতা দাসীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কেন, আমি তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া গেলাম যে ইঁহার বুকে গরম কাপড় বাঁধিয়া গরম জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পনে রাখিবে! কৈ সে সব ত কিছুই করা হয় নাই!" তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আজ্ঞে কাল অতি সন্তর্পণেই ছিলাম ; আজ অনেকটা সুস্থ আছি বলিয়াই এইরূপ ভাবে রহিয়াছি।

কবিরাজ। আজ্ঞে তা বটে! তথাপিও একদিনের মধ্যে ত আর সম্পূর্ণ রসের ভার যায় নাই? আবার ঠাণ্ডা লাগিলে বেশীও হইতে পারে।

বাবাজী। আমার বোধ হয় অত্যন্ত গরমই হইয়াছে ; কারণ কাল অনেকটা গরম জিনিষ ব্যবহার করা হইয়াছে।

কবিরাজ। আজ্ঞে হাতটা একবার দেখি?

বাবাজীমহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের হাতে হাত দিলেন। সকলেই জানেন মিশ্রমহাশয়ের নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ নিপুণতা। এমন কি নাড়ী দেখিয়া রোগনির্ণয় বা মৃত্যুকাল স্থির করিবার জন্য মিশ্রমহাশয়কে নানা দেশ দেশান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। আজ মিশ্র মহাশয় হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি ত আপনাকে এমন

কোনও বিশেষ গরম ঔষধ প্রয়োগ করি নাই! কাল দিবারাত্রে তিনটী মাত্র বড়ী দিয়াছি। ইহাতে এত গরম কি করিয়া হইল, আমি ত অনুসন্ধান করিতে পারিতেছি না! কাল কি পথ্য হইয়াছিল?

বাবাজী। কাল রাত্রে মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলাম। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার দুইটী বড়ি সেবন করিতে পারি নাই, তবে খুবসাবধানে ছিলাম।

নবদ্বীপ দাদা তখন একটু হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "মিশ্র মহাশয়! কালকার সাবধানের কথা কি বলিব? একবার উঁহার শরীরের দিকে এবং আশ্রমের চারিদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বেলা তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ কলসী ঠাণ্ডা জলে পিচকারী খেলা হইয়াছে। পরে সাড়ে ছয়টা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাত্রি দশটার সময় জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবা করতঃ ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এখনও উঁহার সর্ব্বশরীরে রঙ্গের চিহ্ন রহিয়াছে।" কবিরাজ মহাশয় এতক্ষণ অবাক্ হইয়া নবদ্বীপ দাদার কথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইতে না হইতে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—

মহাত্মানাং কার্য্যমচিন্তনীয়ং দেবোঽপি জ্ঞাতুং নহি যৎ সমর্থঃ।
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রোঽ পরিপক্কবুদ্ধিঃ কুতোঽহমজ্ঞঃ পরিচিন্তয়ামি॥

মহাপ্রভুর নিত্যপরিকর আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষের বিষয় লইয়া সমালোচনা বা কোনরূপ ব্যবস্থা করা আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায়। আমার কোনও অপরাধ লইবেন না। আমরা ত ব্রাহ্মণজাতি—স্বভাবতঃই অভিমানী। তাহাতে আবার চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষা করিয়া অভিমানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাবাজী। আজ্ঞে আপনি আমার পিতৃতুল্য, তাহাতে ব্রাহ্মণ; সকল বিষয়েই গুরু। বিশেষতঃ আমাদের উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব মিশ্রবংশোদ্ভব।

দেশগত বিভেদ থাকিলেও জাতিগত এবং উপাধিগত সাদৃশ্য হেতু আপনাকে দেখিলেই আমার সেই মিশ্র পুরন্দরের কথা স্মরণ হয়। আমি আপনাদের দাসানুদাস। কৃপা করুন, লীলাময়ের লীলাখেলা দেখিয়া যেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাকৃত দেহে অভিমান না জন্মে। আপনি আদেশ করুন আজ স্নান করিব ত?

কবিরাজ। আজ্ঞে মিছামিছি আমাকে নিমিত্তের ভাগী করিবার প্রয়োজন কি? আমার বিশ্বাস আপনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। আপনার ইচ্ছাই ভগবদিচ্ছা, আপনি যাহা মনে করিবেন তাহাই করিতে পারেন।

বাবাজী মহাশয় ললিতা দাসীকে বলিলেন, "এই যে মিশ্র মহাশয়ের আদেশ হইল, অতি শীঘ্র স্নানের যোগাড় করিয়া দাও।" এইরূপে স্নান করিয়া সুস্থশরীরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন ও সংকীর্ত্তনানন্দে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ন্যায়রত্নের মহাপ্রসাদ সেবা।

একদিন বালেশ্বর জেলা নিবাসী কয়েকটি ভদ্রলোক শ্রীধাম পুরী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছেন। বাবু কয়টী বেশ ভক্তিমান্; সঙ্গে বেশী আড়ম্বর নাই, মাত্র একটী চাকর এবং উঁহাদের পুরোহিত ঠাকুর। পুরোহিত ঠাকুরের নাম "শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন।" ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ম্মনিষ্ঠ নিরামিষভোজী সদাচারী ব্রাহ্মণ। ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং একবেলা আহার করিয়া থাকেন; বরং একদিন না খাইয়া থাকিবেন, তথাপি যে সে জায়গায় বা যাহার তাহার হাতে কখনই খাইবেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন; কিন্তু আনন্দ বাজারের ব্যাপারটা তাঁহার বড়ই অপ্রীতিকর হইল। এমন কি হৃদয়ের

ভাব গোপন করিতে না পারিয়া একটী পুরীবাসী ভদ্রলোকের নিকট বলিয়া ফেলিলেন, "এ কিরূপ ব্যাপার মহাশয়! একে ত বাজারে অন্ন বিক্রী, তাহাতে আবার যে আসিতেছে সেই উচ্ছিষ্ট করিতেছে। এই রকমই কি এ স্থানের ব্যবহার?" ভদ্রলোকটী বলিলেন "মহাশয়! এ আর কি দেখিলেন? পাণ্ডাগণ না চাখিয়া মহাপ্রসাদ মন্দির হইতে বাহিরই করে না, এমন কি কুক্কুরে খাইয়া গেলেও সেই হাঁড়িতে আবার মহাপ্রসাদ দেবদেবীকে সমর্পণ হইতেছে। এইটীই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য।"

ন্যায়রত্ন। বাবা! এ মাহাত্ম্য মাথায় থাক! ঠাকুর দর্শন করিতে আসিয়া শেষে কি জাতিপাত করিব? জগদীশ্বর যে কুলে জন্ম দিয়াছেন, সে কুলের কর্ত্তব্য ভুলিয়া লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপে কার্য্য করিলে পিণ্ডপ্রয়াসী পূর্ব্বপুরুষগণ নিরাশ হইয়া তাহার প্রতি অভিশাপ করেন।

ভদ্র। মহাশয়! আমরা দেখিতে পাই বহু বহু উচ্চ কুলোদ্ভব পণ্ডিতগণ এই মহাপ্রসাদের পিণ্ডদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন। ভক্তিশাস্ত্রের কোন কোন স্থানে কাহারও কাহারও মতে বিষ্ণুনিবেদিত অন্নদ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদির বিধান আছে; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ কখনই এইরূপভাবে আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদির বিধান করিতে পারেন না।

ভদ্র। প্রভু! জগন্নাথক্ষেত্রের মাহাত্ম্যসূচক কোনও গ্রন্থ বোধ হয় আপনার সমালোচনা করা হয় নাই। আমরা ত শাস্ত্রাদি কিছুই জানি না, তবে লোকমুখে শুনিতে পাই—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কাল বিচারণা॥

মহাপ্রসাদ পাইবামাত্র যখন শুচি-অশুচি বা কাল-অকাল বিচার না করিয়া গ্রহণের ব্যবস্থা হইল, তখন আর তাহাতে বাকি রহিল কি ?

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া একটু কুপিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যাক্ মহাশয়, আমি আপনার ও সব সিদ্ধান্ত শুনিতে আসি নাই। ও সিদ্ধান্ত অন্ন প্রসাদের উপর নহে ; ও বচনটী চরণতুলসী ও চরণামৃতপর। ঘোর কলিকালে এই ভাবে স্বস্ব মত স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের একদেশ গ্রহণ করিয়াই ধর্ম্ম লোপ হইয়া গেল। এই জন্যই লোকের এত দুরবস্থা।" এই বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় দ্রুতপদে বাসায় গমনপূর্ব্বক নিজ যজমানদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা কি মন্দিরের ঐ সাধারণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদই আনাইবে, না ঘরে কোনরূপ ব্যবস্থা করিবে ? আমি কিন্তু যেরূপ দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে আমার ও প্রসাদ পাওয়া হইবে না।" বাবু কয়টী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সদাচারিতা জানেন। তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার জন্য না হয় পাণ্ডাকে ডাকাইয়া পৃথক্ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেই।"

ন্যায়রত্ন। না, ও সব পাণ্ডাপূজারীদিগের প্রতি বিশ্বাস নাই। আমি উহাদের মত যতটা বুঝিলাম, তাহাতে একাকার হইতে বাকি থাকিবে না। আমি কিছু ফল ও দুধ খাইয়া থাকিব।

বাবু কয়টী অনেক বলাবলি করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় অগত্যা কিছু ফল, মিষ্টি ও দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইরূপে তিন দিন গত হইল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অন্নের সঙ্গে দেখাশুনা নাই। চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে ভদ্রলোক কয়টী দেশে যাওয়া মনস্থ করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে জগন্নাথদর্শনে গিয়া দেখেন, জগমোহনে সংকীর্ত্তন হইতেছে। সংকীর্ত্তনের নেতা বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠধ্বনিটী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্তাকর্ষণ করিল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের

ন্যায় দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন কি সদাচারী বিধিনিষ্ঠ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হৃদয়ের বিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলও পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে পার্শ্বস্থ কোনও ভদ্র লোককে সংকীর্ত্তন-দলের নেতা দীর্ঘাকার পুরুষটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, উঁহাকে সকলে "**বড় বাবাজী**" বলিয়া থাকে। উনি ঝাঁজপীটা মঠে থাকেন।

ন্যায়রত্ন। আমার কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। উনি তাহার উত্তর প্রদান করিবেন ত?

ভদ্রলোক। স্বচ্ছন্দে! উনি বড়ই নিরভিমানী। উঁহাকে একটী বালকও যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে যতক্ষণ সে না বুঝিবে, ততক্ষণ নানারকমে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ন্যায়রত্ন। কখন্ উঁহার সঙ্গে আলাপ করা যায়?

ভদ্রলোক। এই ত! কিছু সময় অপেক্ষা করুন। কীর্ত্তন শেষ হইলেই এই স্থানে বসিবেন। তখন যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বিশেষ আশ্বস্তমনে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। বেলা আন্দাজ দেড় প্রহর প্রর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনের পর বড় বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া উপবেশন করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় উঁহাদের কাছে গিয়া বসিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবা! মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে? কেবল কি অন্নকেই মহাপ্রসাদ বলা যায়, না অন্যান্য বস্তুও হয়?"

বাবাজী। আজ্ঞে আপনি নানা শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। আমরা সিদ্ধান্তের কি জানি? তবে দুই একটী বাঙ্গালা কথায় যাহা শ্রীগুরুদেব

বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে কি আপনার প্রীতি হইবে? "শ্রীকৃষ্ণে-নিবেদিত যে কিছু হইবে। মহাপ্রসাদজ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে॥ স্পর্শদোষে কৃষ্ণ প্রসাদ নষ্ট নাহি হয়। নষ্টদোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয়।"

কুক্কুরাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।

* * *

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ॥
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

ইত্যাদি বহুবহু প্রমাণ রহিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী প্রস্তাব আছে, শ্রবণ করুন। একদিন দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া দেখেন, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ভোজনে বসিয়াছেন; শ্রীলক্ষ্মীদেবী বাতাস করিতেছেন। নারদ মনে মনে বিচার করিলেন আজ অতি সুসময়ে আসিয়াছি। যদি দেবী প্রসন্না হইয়া আমাকে এককণা অধরামৃত প্রদান করেন, তবে আমি ধন্য হইব। ভগবানের সেবা শেষ হইয়া গেলে, নারদ লক্ষ্মীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্টা হইয়া লক্ষ্মীদেবী নারদকে বর প্রার্থনা করিতে বলায় নারদ বলিলেন, "মা! আমি আর অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। আমাকে ভগবানের এক কনিকা অধরামৃত প্রদান করিলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী হৃষ্টচিত্তে দেবর্ষিকে কিঞ্চিৎ অধরামৃত প্রদান করিলেন। নারদ ঐ অধরামৃত পাইবামাত্র প্রেমভরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগণ তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইল। অব্যাহতগতি নারদ বৈকুণ্ঠ হইতে নৃত্য করিতে করিতে কৈলাসে গমন করিলেন। নারদের পরমপ্রেমময় অবস্থাদর্শনে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় নারদ! তোমার এতাদৃশ প্রেমময়ভাব কোথায় লাভ হইল?"

নারদ। গুরো! আজ আপনার কৃপায় আমি পরম পদার্থ লাভ করিয়াছি। আজ আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিয়া দেখিলাম, বৈকুণ্ঠনাথ ভোগে বসিয়াছেন; শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী মৃদু মৃদু ব্যজন করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভগবানের আচমন হইল। কিঞ্চিৎ ভগবৎ-অধরামৃত পাইবার মানসে শ্রীলক্ষ্মী-দেবীকে নানারূপ স্তব করায় তিনি সন্তুষ্টা হইয়া আমার ঈপ্সিত বস্তু প্রদানে বহুদিনের সাধ পূরণ করিয়াছেন। প্রভো! কি আর বলিব? যদি জগতে কিছু প্রাপ্তির বস্তু থাকে বা অমৃত বলিয়া কোন বস্তু থাকে, সেটী **ভগবদধরামৃত**। আহা! আমি এতাদৃশ অপূর্ব্ব পদার্থ কখনও আস্বাদন করি নাই।

তখন ভোলানাথ নারদের প্রতি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, "নারদ! এই কি তোমার গুরুভক্তি? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? ঐরূপ অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্তমাত্রে আমাকে বঞ্চনা করিয়া নিজে উপভোগ করিলে?" তখন নারদ ভীত ভীত চিত্তে বলিলেন, "গুরো! আমি প্রকৃতই অকৃতজ্ঞ; কারণ শ্রীগুরুসমর্পিত জীবের যে কিছু পদার্থ লাভ হইবে, উহা শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ না করিলে সে ঘোর প্রবঞ্চক এবং মহা অপরাধী হয়। প্রভু! আমি প্রাপ্ত মাত্রেই লোভপরবশতা হেতু হিতাহিত জ্ঞানরহিত হইয়াছিলাম। এখন কি উপায় হইবে? আদেশ করুন।" মহাদেব নারদের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, নখসন্ধিতে এক কণা রহিয়াছে। ঐ কণিকা মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া গুরু-শিষ্য উভয়ে প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভোলানাথের পদভরে কৈলাসপুরী টলমলায়িত। পার্ব্বতী দেবী অন্তঃপুর হইতে ত্রস্তভাবে আসিয়া উভয়ের অবস্থা দর্শনে বিস্মিতা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাদেবের ভাবসম্বরণ হইলে দেবী তাঁহার এতাদৃশ আকস্মিক প্রেমোন্মত্ত-

তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্করদেব বলিলেন, "দেবী! নারদের কৃপায় আজ আমি দেবদুর্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। আহা মরি! অমৃত বিনিন্দিত কি মধুর আস্বাদন! পার্ব্বতি! আমি বহুদিন ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশী কৃপা আর কখনও লাভ করি নাই।" শঙ্করের কথায় শঙ্করীর অভিমান হইল। হাসিমুখ মলিন হইল—গণ্ডস্থল কম্পিত ও রক্তিমাকার ধারণ করিল। বিকম্পিতাধরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! এই কি আমার প্রতি আপনার ভালবাসা? এই কি নির্হেতুক প্রেমের লক্ষণ? প্রায় সর্ব্বদাই আপনি আমাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকেন, এই কি তাহার পরিচয়? আচ্ছা, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম—আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়া যে মহাপ্রসাদ পাইলেন, সেই মহাপ্রসাদ আমি আপনি ব্যতীত, আচণ্ডাল সকলকে সমভাবে বিতরণ করিব।" বলিয়া দেবী তপস্যায় প্রবৃত্তা হইলেন। সেই তপস্যার ফলে বিমলাক্ষেত্র এই ধামে অবিচারে মহাপ্রসাদ বিতরণ হইতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব খাইলে প্রসাদ নাম হইল। ঐ প্রসাদ বিমলাদেবীকে সমর্পণ হইলে উহার মহাপ্রসাদ সংজ্ঞা হইল। ঐ মহাপ্রসাদ যতই নীচগামী হইবে, ততই এক একটী মহৎ শব্দ যোগ হইবে। উহা কিছুতেই অপবিত্র হইতে পারে না। আপনি যদি দুঃখিত না হন, তবে আপনাকে কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

ন্যায়রত্ন। বাবা! আমি আজ তিন দিন এস্থানে আসিয়াছি; কিন্তু প্রাণে শান্তি পাই নাই। জানি না ঈশ্বরের কি ভঙ্গি। আজ আপনাকে দেখা অবধি আমার মনে ধারণা হইয়াছে যে, আপনার দ্বারা আমার প্রাণে শান্তি লাভ হইবে। বলিতে কি, আপনার মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া আমার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আজ যেন আমার প্রাণে কি একটা অভাব বোধ হইতেছে। আপনি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

বাবাজী। আচ্ছা, শ্রীবিগ্রহকে আপনি কি মনে করেন?

ন্যায়রত্ন। শ্রীবিগ্রহ এবং তৎস্বরূপ অভিন্ন। সচ্চিদানন্দতনু ভগবৎস্বরূপের অঙ্গাঙ্গীভেদ নাই। শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকারে ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার উপলব্ধি না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। শ্রীমূর্ত্তি দ্বিবিধ—লেখ্য ও লেপ্য। তন্মধ্যে বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে লেখ্য দুই প্রকার। লেপ্য চতুর্ব্বিধ,—মনোময়ী, মণিময়ী, দারুময়ী এবং মৃণ্ময়ী। এই প্রত্যেক মূর্ত্তিকে তত্তৎস্বরূপ মনে করিতে হইবে।

বাবাজী। এই জগন্নাথদেবকে অপনি কোন্ স্বরূপ বলিয়া জানেন?

ন্যায়রত্ন। জগন্নাথদেব সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ এ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

বাবাজী। আচ্ছা যদি কেহ সাক্ষাৎ নারায়ণের ভুক্তাবশেষ স্পর্শ করে, তবে তাহা কি অপবিত্র হইবে? কিম্বা উক্তমহাপ্রসাদ অপরের ভোজনের পর তদবশেষ পাইলে সেই ব্যক্তিগত অধরের গুণ তাহাতে সঞ্চারিত হইবে, না ভগবদধরের গুণই থাকিবে?

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনটা এবার যেন কেমন কেমন হইয়া পড়িল। বলিলেন, "আপনার অনেক কষ্ট হইতেছে, চলুন আপনার বাসায় যাওয়া যাক।" বাবাজী মহাশয় অতিশয় আগ্রহসহকারে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে আসিলেন। মঠস্থ শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব এবং অন্যান্য শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে ন্যায়রত্ন মহাশয় বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। যে স্থানে বৈষ্ণবগণের মহাপ্রসাদ সেবা হয়, সেই পঙ্গতঘরে সকলে বসিলেন। আবার ঐ মহাপ্রসাদসম্বন্ধে কথা আরম্ভ হইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয়। বাবা! আপনি যে "শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি" প্রমাণ দেখাইলেন, উক্ত প্রমাণটী কি অন্ন মহাপ্রসাদগত? আমার যেন ধারণা ছিল চরণামৃত ও চরণ তুলসী বিষয়ক।

বাবাজী। অচ্ছা এটাই না হয় চরণামৃত চরণতুলসীগত হইল। কুক্কুরাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ। ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ইত্যাদি প্রমাণে অন্নশব্দ যখন উল্লেখ করাই রহিয়াছে, তখন আর মনে সন্দেহ করিবার কারণ কি? আরও দেখুন, ভগবানের অধরামৃতেই যদি স্পর্শদোষ থাকিল, তবে তাঁহার ভগবত্তা রহিল কোথায়? আমি যাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া পূজা করিলাম বা ভোগ লাগাইলাম, তাঁহাতে যদি আমারই বিশ্বাস না হইল, তবে অপরের কি করিয়া বিশ্বাস জন্মিবে? "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥" ভক্তগণ জোর করিয়া বলিয়াছেন— "হে ভগবন্! যদ্যপি তোমার মায়া দুরত্যয়া, তথাপি "উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।" ইত্যাদি। ভগবদধরামৃতের যখন এতই মহিমা, তখন সেই বস্তু কি সামান্য স্পর্শদোষে দুষ্ট হইতে পারে? আপনি সুপণ্ডিত। আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব? আপনি নিজেই বেশ বিচার করিয়া দেখুন, কোন্‌টী সঙ্গত। তবে আমি সাদা কথায় বুঝি, যতক্ষণ অধরামৃত চরণামৃতে বিশ্বাস না জন্মিবে, ততক্ষণ ভগবানে কিছুতেই বিশ্বাস জন্মিতে পারে না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় নীরবে বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার হৃদয় দ্রবিল—নয়নে জল আসিল—প্রাণে অনুতাপানল ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একেবারে বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! আমার কি গতি হইবে? আমি ঘোর অবিশ্বাসী পাষণ্ড। আমি যে এই তিন দিন জগন্নাথধামে বাস করিয়া তাঁহার দর্শন করিয়াছি। ইহাতে তো আমার কোনই ফল হয় নাই; কারণ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ এবং সেবকগণের প্রতি বিশেষরূপ

বিদ্বেষভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি। এ ঘোর অপরাধ হইতে মুক্তির উপায় কি? আমার হৃদয়ে হু হু করিয়া অনুতাপানল জ্বলিতেছে। ধিক্ আমার জাত্যভিমানে! ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে! ধিক্ আমার নৈষ্ঠিকতায়! হায় রে! এতদিন আমি কি ভীষণ অবিদ্যার করাল কবলে গ্রসিত ছিলাম। আপনি আমার জ্ঞানদাতা পরম হিতৈষী গুরু। আপণি আমায় কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, এই অপরাধ হইতে আমার উদ্ধারের উপায় কি?

বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন, "আপনি সুবিজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। আপনিই আমাদের গুরুস্থানীয়, আপনি স্থির চিত্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জানান। তিনি পরম দয়াল; তাঁহার সেবকের উপর কটাক্ষ বা অবজ্ঞাজনিত অপরাধ তিনি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। মহাপ্রসাদের অবজ্ঞাজন্য শ্রীবিমলাদেবীর নিকটে প্রাণে প্রাণে ক্ষমা ভিক্ষা করুন, তিনি জগদম্বা; সন্তানের প্রতি কখনও বিরূপা হইবেন না।

ন্যায়রত্ন। আমি আর কি জানাইব? তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অন্তর্য্যামিণী। আমার অন্তরের ভাব সকলই অবগত আছেন। তিনি আপামর জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমা হইতে যদি তাঁহার নিজপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের অভিলাষ হইয়া থাকে, করুন। আমি যেরূপ ঘোর পাষণ্ড, আমাকে যদি তিনি নিজে মহাপ্রসাদ না দেন, তবে আর আমার অপরাধ মোচন হইল বলিয়া ধারণা হইবে না।

এই সময় গুরুদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক পূর্ব্বদেশীয় ভক্ত একটী গুলী হাতে করিয়া অতি ত্রস্তভাবে বাবাজী মহাশয়েব কাছে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! একটী স্ত্রীলোক আমার হাতে এই মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি অতি শীঘ্র মঠে গিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাতে

এই মহাপ্রসাদটী দিবে।' বলিয়া আমাকে মন্দির হইতে পাঠাইয়া দিলেন।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় পুলকাশ্রুকম্পান্বিত কলেবরে মহাপ্রসাদ হাতে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে এক গ্রাস দিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাপ্রসাদ পাইয়া প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে বলিয়া উঠিলেন,—

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
সাধুসঙ্গপ্রভাবেণ সদ্যঃ প্রক্ষীণকল্মষঃ॥

হা দয়াময়! করুণানিদান! আমি কর্ম্মচণ্ডাল, তোমার সেবক এবং অধরামৃতের বিদ্বেষী। তথাপি তোমার এত দয়া! মা করুণাময়ি বিমলে! তোমার ক্ষেত্রে আসিয়া আমি ঘোর অপরাধী হইয়াছিলাম; কিন্তু তোমার অহৈতুকী করুণাবলে উদ্ধার পাইলাম। মা! সন্তানের প্রতি যেন চিরকাল এইরূপ দয়া থাকে। বলিতে বলিতে একেবারে উন্মত্তবৎ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে পুলক—চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরে সাষ্টাঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইলেন। এমন দৃঢ়ভাবে দুইখানি চরণ ধারণ করিয়াছেন যে, বাবাজী মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও ছাড়াইতে পারিতেছেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে কেবল এই বুলি—"গুরুদেব! আপনার কৃপাই একমাত্র সম্বল—আপনার কৃপায়ই আমি অমূল্য রত্নলাভ করিলাম। আমি চিরদিনের মত আপনার চরণে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।" বাবাজী মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দুই হাতে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আহা মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! উভয়ের চোখের জলে উভয়ে সিক্ত—উভয়ের কম্পে উভয়ে কম্পিত। কি অপূর্ব্ব মিলন! কি অপরূপ পরিবর্ত্তন! যে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ নিজ জ্ঞাতিবর্গের হাতেও খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন, আজ সৎসঙ্গ-

প্রভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ হাতে লইয়া এক একবার এক একজনের মুখে দিতেছেন, আর অবশেষ নিজে গ্রহণ করিতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যজ্মানগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ঝাঁজপীটা মঠে আসিয়া উঁহার অবস্থাদর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যজ্মানগণকে দেখিবামাত্র আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া তাহাদের মুখে দিলেন এবং অবশেষ নিজে গ্রহণ করিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! এই মহাপুরুষের কৃপায় আজ আমার কুসংস্কার দূর হইয়াছে। আমি মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজ আমি বুঝিয়াছি যে ভগবৎকৃপা অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত-কৃপা অতিশয় বলবতী। বাবা! তোমরা দেশে যাও, আমি কয়েকদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া মনুষ্যজীবনের যথার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করতঃ দেশে যাইব।" যজ্মান বাবু কয়েকটী পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের কথায় অতি হৃষ্টচিত্তে বাবাজী মহাশয় ও অন্যান্য সকলকে বিশেষ ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক দেশে গমন করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও মধ্যাহ্নস্নান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন। অনতিদূরে বাবাজী মহাশয়ও বসিয়াছেন। মহাপ্রসাদ সেবা করিতে করিতে ন্যায়রত্ন মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ এবং শ্রীশ্রীরাধাকান্ত দেবের মহাপ্রসাদে কিছু পার্থক্য আছে কি?"

বাবাজী। আচ্ছা এই বিচারের ভারটী আপনার উপরেই দিলাম। আপনার কিরূপ ধারণা?

ন্যায়রত্ন। কৃষ্ণে নিবেদিত বস্তুই যখন মহাপ্রসাদ হয় শাস্ত্রে বলিলেন, তখন ইহার মধ্যে কোনও তারতম্য আছে বলিয়া ত আমার ধারণায় আসে না। বিশেষতঃ যাঁহারা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের

কাছে একথা উত্থাপনই হইতে পারে না। কারণ নিজ নিজ ইষ্টে শ্রেষ্ঠত্ববুদ্ধি না থাকিলে নিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

বলিয়াই পূর্ব্ববৎ একগ্রাস মহাপ্রসাদ লইয়া পার্শ্বস্থ একজনের মুখে দিলেন এবং তদবশেষ নিজে পাইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অপূর্ব্ব ভক্তিভাব দর্শনে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী **গৌরহরিবোল** বলিয়া উঠিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় ভক্তগণকে বলিলেন— "কৃষ্ণকৃপায় কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি সেই কৃষ্ণকে ভজয়॥" আহা মরি কি অপূর্ব্ব করুণা! এমন বিশুদ্ধ হৃদয়ে বিশুদ্ধ তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হইবে না ত কোথায় হইবে? আজ ইঁহার সিদ্ধান্ত শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা আমার মনে পড়িল। মহাপ্রভুর ভগবত্তাসম্বন্ধে যখন উভয়ে বাদানুবাদ হইতে লাগিল, তখন আচার্য্য বলিয়াছিলেন—"ভট্টাচার্য্য! তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হইবে। এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥" যে ন্যায়রত্ন মহাশয় আপামর সাধারণের বিশ্বাসগোচর বস্তুশক্তিমৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদসম্বন্ধে দ্বিধাবুদ্ধি করতঃ তিন দিন উপবাসী ছিলেন, সেই নৈষ্ঠিক সদাচারী ব্রাহ্মণ আজ ভক্তিশক্তিমৎ যাবতীয় শ্রীবিগ্রহার্পিত অন্নকে মহাপ্রসাদ বোধে নিত্যচিন্ময়ত্ব স্থাপন এবং তদ্‌যোগ্য আচরণ করিতেছেন। এমন বিশুদ্ধ মহৎসঙ্গ পাইয়া আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।" এইরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছুদিন ঝাঁজপীটা মঠে অবস্থানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিয়া নিজ পরিবারবর্গের বিশেষ আগ্রহে দেশে গমন করিলেন।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।

